সোমনাথ

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

শঙ্কর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

নীল সমুদ্রের ঢেউগুলো এসে ভেঙ্গে পড়ে মন্দিরের পাষাণ ভিত্তিমূলে। একটার পর একটা ঢেউ আসে আর ভেঙ্গে আছড়ে পড়ে। বালিয়াড়ির উপর সাদা ফেনাগুলো এঁকেবেঁকে ছুটে যায়, রোদের আভায় ঝকমক করে।

আবার মিলিয়ে যায়।

কোন মহাজীবনের কাব্য তারা রচনা করে চলেছে। মহাকাল এখানে যেন স্তব্ধ দর্শকের মত সেই যুগযুগান্তের কাব্য রচনা দেখে চলেছে। এ খেলার শেষ নেই।

আকাশে মাথাতুলে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ মন্দিরের স্ফটিক চূড়া। তার শীর্ষে পতাকা উড়ছে।

বিশাল বিরাট সেই মন্দির আরবসমুদ্রের তীরে কালের প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে অনাদি অনন্তকাল থেকে।

সারা ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের আদর্শ বিশ্বাস ধ্যান আর ধারণা একটি পরম সত্যমূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে সেই দেবাদিদেব সোমনাথের মন্দিরকে কেন্দ্র করে।

একদিকে এর সমুদ্র। আকাশ বাতাস সেখানে ওই কলগর্জনে মুখর। অন্যদিকে এর শ্যামসবুজ গ্রামসীমা।

নারিকেল কলাগাছের প্রহরাঘেরা গ্রামবসত, বিশাল প্রাকার বেষ্টিত নগরীর পরেই গ্রাম। দুটি পুণ্যতোয়া নদী কপিলা আর

সরস্বতী এসে মিশেছে এখানে ওই সাগরে। হারিয়ে গেছে তাদের গতিপথ।

ওরা দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর লক্ষ্যে পৌঁচেছে।

তেমনি সারা ভারতের কোটি কোটি নরনারী আসে ভক্তি বিনম্র-চিত্তে। মহাদেব সোমনাথের এই তীর্থ ভূমিতে অন্তরেব প্রণতি-জানাতে।

আদিকাল থেকে ঋষিরা বলেছেন।

—সমুদ্রং পশ্চিমং গত্বা

সরস্বতাব্ধি সঙ্গমম্

আরাধ্য সোমং দেবেশং ততঃ

কান্তিম বাপশ্যসি।

কথাগুলো শুনে চলেছে শুভা।

কোন এক বিচিত্র কাহিনী। রাজা ভোজের সভানর্তকী আজ রাজ্যসম্পদভোগ পরিত্যাগ করে এগিয়ে আসছে সোমনাথ তীর্থের দিকে।

দীর্ঘপথ।

একটা রথ, অতিসাধারণ তার আভবণ, ঘোড়াগুলোও পথশ্রমে ক্লান্ত। মরুভূমি শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য বহুপথ পার হয়ে কোনরকমে আসছে তারা সমুদ্রতীর্থের পানে।

কথাটা শুভা প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি নিজেই।

এত ভোগ প্রাচুর্য ছেড়ে সে কেনই বা এপথে বের হল তা জানে না।

রাজা ভোজের মত গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাকে সম্মান দিয়েছিলেন, কিছু প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছিল সে রাজসভায়। কিন্তু তবু সে সব পরিত্যাগ করে নর্তকী শুভা চলে এল।

নিজের কাছেই এটা আশ্চর্য ঠেকে।

কিন্তু না এসে তার উপায় ছিল না। শুভা নিজের জন্মইতিহাস জানে না। বোধহয় হয় কোন রহস্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে রহস্য ভেদ করতে সে চায়নি।

বৃদ্ধ ওই সামন্তদেবের আশ্রয়ে মানুষ।

নিজের মেয়ের মতই সামন্তদেব তাকে মানুষ করেছিল। রূপ গুণ লাস্য কোনদিক থেকেই ভগবানও তাকে বঞ্চিত করেন নি।

তাই সামান্য চেষ্টাতেই শুভা রাজধানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নর্তকী হয়ে উঠেছিল। সে দিন রাজা ভোজদেবের রাজধানী ধার নগরীতে কুশলী নটী তার মত আর কেউ ছিল না।

তাই তার যোগ্য সমাদরই সে পেয়েছিল।

কিন্তু ভুল করেছিল শুভা। নারীজীবনের কি নীরব ব্যাকুলতা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল তরুণ সৈন্যাধ্যক্ষ দেবশর্মার দিকে।

শুভা প্রথমে ঠিক বোঝেনি নিজেকে।

প্রথম যেদিন সে ওই তরুণ দেবশর্মাকে দেখে সেইদিনই তার মনের একটা শূন্যতার কথা গোচরে এসেছিল।

এতদিন শুভা চেষ্টা করেছে, সাধনা করেছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তার জীবনের সব সময়টুকুই কেটে যেতো নাচএর সাধনায়। বিভিন্ন আচার্যের কাছে সে পাঠ নিয়েছে বিভিন্ন নৃত্য কলায়। অতীতের সেই সাধনা তাকে সার্থক শিল্পী করে তুলেছে। তার খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠা নিয়েই মগ্ন ছিল শুভা।

কিন্তু সেই রাত্রে রাজধানীর বাইরে কোন কুঞ্জ থেকে ফিরছে। পাহাড়ী পথ, দুদিকে গাছের ছায়া নেমে অন্ধকার রচনা করেছে। স্তব্ধ প্রকৃতি।

দূরে পর্বতশীর্ষে রাজধানী প্রাসাদ আলোকমালা কি স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুভা ফিরছে রাজ্যের অন্যতম ধনী শ্রেষ্ঠী সুদত্তের উদ্যান থেকে।

সঙ্গে তার বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা, সর্বাঙ্গে অলঙ্কার। এমন সময় রাতের অন্ধকারে তার শিবিকা আক্রান্ত হল। মশালের অলোয় দেখা যায় নিষ্ঠুর আকৃতির কয়েকজন দৈত্য আক্রমণ করেছে তার শিবিকা বাহকদের।

তার আর্ত অসহায় চীৎকারে হঠাৎ পার্বত্য পথে অশ্বখুরের শব্দ ওঠে। দুজন সৈন্যের সঙ্গে তরুণ সৈন্যাধক্ষ দেবশর্মা মুক্ত কৃপাণ হাতে এসে পড়ে।

দুচোখে তার ভীত চকিত দৃষ্টি।

ক্রমশ তাতে আশ্বাস আর আনন্দ ফুটে ওঠে। দেবশর্মার দিকে চেয়ে থাকে।

দেবশর্মা রাজনর্তকী শুভাকে চেনে।

রূপবতী নারীকে অভয় দেয়।

—কোন ভয় নেই। আমার সৈন্যরা বাহকদের ফিরিয়ে আনছে। আপনাকে নগরে পৌঁছে দেবে।

একটু মাত্র সময়।

স্তব্ধ রাত্রি। আঁধার ঢাকা আকাশে তারা ফুলগুলো কে যেন ছিটিয়ে দিয়েছে। বাতাসে কুরুবকের উদগ্র কামনামদির সুবাস। নর্তকী শুভা সেই তারার আলোয় দেবশর্মার পানে চেয়ে আছে। মনে হয় আজ নিজের জীবনের অতলস্পর্শী শূন্যতার কথা। এত যা পেয়েছে অর্থ সম্পদ খ্যাতি তার সত্যিকার কোন মূল্য নেই।

জীবনে তার সঞ্চয় কিছুই নেই।

দেবশর্মা ওর নারীমনের সেই ঝড়ের সংবাদ জানে না। সে যোদ্ধা, তার মনে অন্য চিন্তা।

রাজসভায় যায়, কিন্তু তার দপ্তর আলাদা।

দূর পশ্চিম থেকে সংবাদ আসছে গজনীর সুলতান মাহমুদ আবার ভারত আক্রমণ করবার চক্রান্ত করছে।

কয়েকবারই সেই নিষ্ঠুর দৈত্য ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে পালবংশের রাজ্য রাজধানী পর্যন্ত আক্রমণ করে ধনসম্পদ এমন কি গরু ভেড়া অবধি লুঠ করে নিয়ে গেছে।

ভারতবর্ষ তার যেন শিকারের ক্ষেত্র।

মাঝে মাঝে সৈন্যসামন্ত নিয়ে লুণ্ঠনকারীর দল এখানে আসে তাদের কাজ শেষ করে আবার ফিরে যায়।

কোন যোগ্য প্রতিরোধও করা সম্ভব হয় নি।

এবার তার প্রস্তুতি আরও বিরাট ভারতবর্ষের বুকে সে এগিয়ে আসে। ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করে নিঃশেষ করে নিয়ে যাবে।

দেবশর্মার সারামনে একটা চিন্তা। ভারতের বিক্ষিপ্ত রাজ্য প্রধানদের সে যদি একত্রিত করতে পারে মহান ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতে পারে তবেই তারা নিজেদের মধ্যকার তুচ্ছ মতভেদ ভুলে একত্রিত হয়ে দাঁড়াবে।

সেই বিরাট একত্রিত শক্তির কাছে সুলতান মামুদ বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাবে।

নটী শুভার মনে এ সব প্রশ্ন ভবিষ্যৎ চিন্তা কোনদিনই জাগেনি।

এতদিন সে ছিল তার নৃত্যকলা নিয়ে, আজ তার সদ্যজাগ্রত মন আরও কিছু পেতে চায়।

তাই বোধহয় ব্যাকুল হয়েই সেদিন দেবশর্মার নিজের বাড়ীতেই গিয়েছিল শুভা।

সুন্দর প্রাসাদোপম বাড়ী, সামনে বাগান।

কয়েকটা মর্মরমূর্তি আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে, তারই পাশ থেকে বর্ম পরিহিত সৈনিক প্রহরী এগিয়ে আসে।

আকাশে এককালি চাঁদের আলো জেগে আছে, উতলা বাতাসে কি নীরব ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে ওই পত্র মর্মরে।

তারই মাঝ দিয়ে মনের তীব্র একটা কামনার আভাস জেগে চলেছিল। নটী শুভাবতী দেবশর্মার প্রাসাদ উপবনে বাধা পেয়েই থমকে দাঁড়াল।

—কে?

প্রহরী এগিয়ে এল, দেখে একটি নারীমূর্তি।

নটী শুভার দেখা পাবার সৌভাগ্য তার হয়নি কোনদিন। তাই জানে না তার পরিচয়। তবু ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

শুভা জিজ্ঞাসা করে।

—দেবশর্মা আছেন? তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। সৈনিক কি ভেবে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল উদ্যান বাটিকা পার হয়ে বিরাট প্রাসাদের মধ্যে।

দেবশর্মা একাই তার পাঠকক্ষে ছিল। দেওয়ালে স্তরে স্তরে সাজানো পুথি শিলালিপি—তাম্র পট্টোলি—তালপাতার পুঁথির এলোমেলো পাতা।

দেওয়ালের অনেকখানি ঠাই জুড়ে ভারতের একটা দেওয়াল-চিত্র। এদিক ওদিকে সাজানো কয়েকটা তরবারি বল্লম ইত্যাদি।

দেবশর্মা ভাবছে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথা। মূলতান থানেশ্বর কনৌজ আজমীরের রাজা মহারাজাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করছে।

সীমান্ত থেকে সংবাদ এসে পড়ে।

রাজা ভোজদেবও নিজে অর্বুদপর্বতে পরমার রাজাদের কাছে দূত পাঠিয়েছেন।

তার নিজের চিন্তাতেই সে ব্যস্ত, এমন সময় নটী শুভাবতীকে আসতে দেখে অবাক হয়। প্রথমে ঠিক স্মরণ করতে পারে না। পরক্ষণেই মনে পড়ে সেই রাত্রির কথা।

নটী শুভা তার পরও তার সঙ্গে দেখা করেছে রাজ প্রাসাদে। দেবশর্মা ওর চটুল লাস্য আর হাসির ধারালো অস্ত্রকে এড়িয়ে গেছে বার বার।

রাজা ভোজদেবের সভায় ওই নর্তকীর আবির্ভাব রাজসভায় তার প্রতিপত্তিকে ভালোচোখে দেখেনি দেবশর্মা।

জানে নারী, বিশেষ করে নটীই রাজ্যের এবং রাজার বিপদ আর অকল্যাণ ডেকে আনে। রাজকার্যে বিঘ্ন ঘটায়।

তাই সেই কথা দেবশর্মা স্বয়ং ভোজরাজকেও জানিয়ে ছিল। কিন্তু রাজা ওর কথার জবাব দেননি। শুধু হেসেছিলেন মাত্র। দেবশর্মার কাছে সেই হাসিটুকু ও বিশ্রী মনে হয়েছিল।

রাজনটী শুভাবতীর কাছে দেবশর্মার এই বাধা দেবার চেষ্টার কথাও উঠেছিল। ধূর্ত নারী কথাটা শুনেও রাগ করে নি।

ভেবেছিল দেবশর্মা হয়তো চায় না—প্রকাশ্য রাজ সভায় সে নটীবৃত্তি অবলম্বন করুক। শুভার মনের অতলে নীরব কামনার একটি সুর জাগে।

সে বাইরের এই খ্যাতি প্রতিষ্ঠার জীবন থেকে বিদায় নিতে চায়। নিভৃতে একটি মানুষকে নিঃশেষে ভালবেসে সে ঘরের বাঁধন মেনে নিয়ে ধন্য হতে চায়।

দেবশর্মাকে দেখে অবধি তার মনে হয়েছে ও সেই তেমনি একটি মানুষ যার জন্য সে সব পরিত্যাগ করতে পারে। অনেক ভেবেছে সে।

ভেবেচিন্তে মনস্থির করেই আজ সে এইখানে এসেছে তার অন্তরের কথাটা নিভৃতে সঙ্গোপনে জানাতে।

দেবশর্মা ওকে দেখে খুশী হয় নি। তবু সাধারণ ভদ্রতার খাতিরেই বলে।

—বসুন। কি প্রয়োজনে এসেছেন জানতে পারলে খুশী হতাম।

শুভা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

সুন্দর মার্বেল পাথরের সাদা কালো স্পর্শ মাখানো ঘরখানা। ওদিকের বারান্দায় একটা যুঁই লতা সবুজ আবেশ জাগিয়েছে। দু একটা সাদা ফুল তার মাঝে এনেছে নরম স্পর্শ, বাতাস তাদেরই সৌরভে আমন্থর।

শুভা বলে ওঠে।

—আমি আপনার কাছেই এসেছি।

একটু বিস্মিত হয় দেবশর্মা যৌবন বিগত প্রায়—সারাটা জীবনের অধিকাংশ সময় তাব কেটেছে যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে। জীবনে ভালোবাসার স্বপ্ন তার নেই।

সে স্বাদও সে পায় নি। হঠাৎ ওমনি একটি বহু কামনার স্বপ্ন নিয়ে বিচিত্র একটি নারীকে আহ্বান জানাতে দেখে বিস্মিত হয় দেবশর্মা।

সে জানে নারী ছলনাময়ী মাত্র।

জীবনে শুধু বিপদ আব বিপর্যযই আনে তারা। তাই তাদের সে এড়িয়ে চলে। সেই মেয়েকে তার বাড়ীতে এসে প্রেম নিবেদন করতে দেখে সে বিস্মিত হয়েছে।

মনে মনে ঘৃণাও বোধ করে।

শুভা বলে চলেছে।

—জীবনে অনেক পেয়েছি। যতই পেয়েছি ততই মনে হয়েছে যা চেয়েছি সারা মন দিয়ে, তা পাইনি। বারবার ঠকেই গেছি। এতদিন খুঁজেছি। মনে হয়েছে একজনকে কেন্দ্র করেই আমি বাঁচতে পারি নোতুন করে। সে আপনিই।

শুভা নারী হয়ে আজ তার মনের নীরব কামনাকে মুখর করে তুলেছে। সে ঘর বাঁধতে চায়।

একজনকে নিঃশেষে ভালোবাসতে চায়।

দেবশর্মার কাছে এ আবেদনের কোন ফলই নেই।

তার সারা মন অন্য চিন্তায় মগ্ন। ওর কথায় জবাব দেয় দেবশর্মা।

—তুমি ভুল করেছো। একজন নটীকে নিয়ে ঘর বাঁধার ইচ্ছা আমার নেই। আর তা সম্ভব ও নয়। জীবনে ওই কাজের চেয়ে অনেক মূল্যবান কাজ করার আছে।

শুভা ওর কথাগুলো শুনছে।

অবজ্ঞা আর ঘৃণায় দেবশর্মার কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গের মত তীক্ষ্ণ আর তীব্র হয়ে উঠেছে।

শুভার সারা মনের স্বপ্ন কামনাকে পায়ের নীচে দলে পিষে দিয়েছে ওই কঠিন মানুষটা! তাকে ঘৃণা করে সারা অন্তর দিয়ে। শুভা বলে।

—নটী! নটী কি মানুষ নয়—নারী নয় সৈন্যাধক্ষ? সে কি ভালবাসতে জানে না?

হাসছে দেবশর্মা, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি। হাসি থামিয়ে জবাব দেয়।

—না। তারা চেনে শুধু কাঞ্চন আর কামনাকে। লোভ তাদের অত্যন্ত বেশী! ত্যাগ করার সাধনা তাদের নেই। তাদের নিয়ে দুদিনের জন্য আমোদ উৎসব করা চলে—ঘর বাঁধা যায় না। তাদের ভালবাসা তো দূরের কথা।

শুভা তার মুখের মত জবাব পেয়েছে। সে জানে তার প্রতিষ্ঠার কথা। ইচ্ছে করলে মহারাজ ভোজদেবকেই দিয়ে ওই উদ্ধত দেবশর্মাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা ও করতে পারে।

কিন্তু সে ইচ্ছা তার নেই। নিজেব মনের কাছে আজ সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। তার মনের জোরটুকু পর্যন্ত যেন নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেছে।

তবু প্রশ্ন করে।

—কাকে ভালবাসেন তাহলে? সৈন্যাধ্যক্ষের জীবনে কি কাউকে কোনদিন ভালোবেসেছেন ?

দেবশর্মা জবাব দেয়।

—দেশকে।

হাসছে শুভা। বেদনা ভরা সে হাসি। বলে।

— একজন মানুষকে ও ভালবাসতে যে পারে না, সে হৃদয় বৃত্তি যার নেই। সে এত বড় দেশ তার এত মানুষকে ভালবাসবে কি করে? ভালবাসার ভাণ কবে নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে যে চায় সে আরও লোভা আরও স্বার্থপর।

দেবশর্মা ওর দিকে চেয়ে থাকে। কোষ বদ্ধ অসিটায় তার অজানতেই হাতেব মুষ্টি গিয়ে পড়ে। মৃদু শব্দ ওঠে।

পরক্ষণেই থেমে গেল। তার সামনে একজন নারী এ অভিযোগ করে চলেছে। অর্থহীন অভিযোগ।

তাই চুপ করেই থাকল দেবশর্মা।

শুভা বলে।

—জীবনে মস্ত একটা ভুলের বোঝা তোমাকে বইতে হবে। তুমি যে আমায় ভুল বুঝেছো এই কথাটাই তোমার সারা মনে কাঁটার মত বিঁধবে, অবশ্য কোন বিবেক চেতনা যদি থাকে।

শুভা আর দাঁড়াল না।

বের হয়ে চলে এল। বাইরে তখন রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকার নেমেছে। কোথায় প্রাসাদে আগত মধ্য রাত্রির সানাই এর সুর বেজে ওঠে।

তাও থেমে গেল।

বাতাস তখন ও সেই নীরব ক্রন্দনের সুরে ব্যাথাতুর। একটি অসহায় নারীর মনে কি নিবিড় গ্লানি আর বেদনা জমে উঠেছে।

শুভা তার আবাসের দিকে ফিরছে।

সারা মনে এসেছে পুঞ্জীভূত ঝড়ের বেদনা। দেবশর্মার কথাগুলো মনে পড়ে। নারীর প্রেমের কোন মূল্য নেই।

তারা স্বার্থপর, কাঞ্চন আর কামনা এরই প্রাধান্য দেয় তারা।

রথটা চলেছে।

দীর্ঘপথ। বন মরুভূমি পার হয়ে অর্বুদ পর্বতের সবুজ গিরিশীর্ষ পিছনে ফেলে তারা এগিয়ে এসেছে; কচ্ছের রান্ অঞ্চলের কিছুটা নমুনা দেখেছে পথে পড়ে তারই একটু।

বালি আর কাঁটা গুল্মে ঢাকা মাটি। কোথাও দিগন্ত জোড়া স্তব্ধতা; সূর্যের তেজ সেখানে প্রচণ্ড। বন্ধ্যা মৃত্তিকা—আশেপাশে কোথাও কোন লোকালয় নেই।

শুভা উদাস শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

—এ কোথায় এলাম? পথ ভুল হয়নি তো?

হাসে সামন্তদেব।

—না। আমরা ঠিক পথেই চলেছি। এর পরই আমরা মহাসেনা হয়ে গিরণার পর্বতের নীচে দিয়ে সোমনাথের দিকে এগিয়ে যাবো।

শুভা দেবাদিদেব সোমনাথের উদ্দেশ্যে হাততুলে প্রণাম জানায়।

মনে হয় তার জীবনের মতই এই পথটা। তার জীবনে সব প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠা আজ বুদবুদের মত বিলীন হয়ে গেছে। সব কিছু

সম্পদ পিছনে ফেলে সে আজ কোন্ সম্পদের সন্ধানে বের হয়েছে।

মানুষকে ভালবেসে বেদনাই পেয়েছে রাজনটী তাই আজ তার তনুমন সে দেবতাব উদ্দেশ্যই উৎসর্গীকৃত করেছে।

রাজা ভোজ ও অবাক হয়ে ছিলেন।

—তুমি চলে যাবে ?

শুভা জবাব দিয়েছিল।

– হ্যাঁ মহারাজ। আমাকে যেতেই হবে। দেখলাম কামনার শেষ নেই। মুক্তি নেই—তৃপ্তি নেই। তাই তৃপ্তির সন্ধানেই চলেছি আমি। আশীর্বাদ করুণ—দেবতার পদপ্রান্তে গিয়ে আমি যেন সেই তৃপ্তিব সন্ধান পাই।

এবপব মহারাজ আব কথা বলেন নি।

তিনি জ্ঞানী গুণী। মানুষেব মনের অতলে যখন এই মুক্তিব ডাক পৌঁছায় তখন তাকে ঘবের সীমানা আর বাঁধতে পারেনা, নটী শুভাবতী তাই আজ পথেব অসীমে হারিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ সামন্তদেব ও দেখেছে মেয়েটিকে।

ইস্পাতের মত কঠিন একটি নারী। জীবনে এত চাওয়া এত সম্পদ এত প্রতিষ্ঠা সব পায়ে ঠেলে পথে বের হয়ে এল।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ।

ক'দিনে এ যাত্রার শেষ হবে জানেনা শুভা। পথের ধারে আকাশছোঁয়া নীল পর্বতটা দেখা যায়। একদিকে একটা ছোট চূড়া তারপরেই আবার আর একটা শীর্ষ মাথা তুলেছে আকাশের দিকে। ওদিকে গহন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য।

রাতের অন্ধকারে একটী সরাইএ আশ্রয় নিয়েছে তারা। দিনে দিনে পথ চলা, রাতের অন্ধকার নামবার আগেই কোথাও সরাইখানা নাহয় লোকালয়ে আশ্রয় নিতে হয়।

পথ ফুরিয়ে আসছে। গিরণার পর্বতের নীচে গিরিশহরের একটা সরাইএ আশ্রয় নিয়েছে তারা। সরাইখানার চারিদিকে বড় বড় গাছগুলোয় রাতের আঁধার জমাট বেঁধেছে। আকাশে কে যেন মুঠো মুঠো জোনাকার ফুল ছিটিয়ে রেখেছে।

ওদিকে সুরু হয়েছে শ্বাপদ সঙ্কুল গির অরণ্য। সিংহের গর্জন শোনা যায়। রাতের অন্ধকারে সেই গর্জনধ্বনি মাটি বনতল কাঁপিয়ে তোলে।

সরাইখানার প্রধান ফটক বন্ধ।

চারিদিকে উঁচু উঁচু পাথরের তৈরী ঘরগুলো মাঝখানে বেশ খানিকটা প্রশস্থ চত্তর সেই খানে রাখা হয়েছে রথ অশ্ব ইত্যাদি।

ঘরের দেওয়ালে কতকালের জমাট ধুলো ময়লা জমে আছে কে জানে। জানলা বলতে ওই চত্বরের দিকে একটু ঘুলঘুলি মত করা।

ঘোড়াগুলো পাথরে পা ঠুকছে।

মাঝে মাঝে উঁচু প্রাচীরের ওখানে বরোজ থেকে পাহারাদারদের সাবধানী হাঁক শোনা যায়। দস্যু দলের আক্রমণের ভয় আছে তাই এই সাবধানতা।

শুভা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

হঠাৎ অন্ধকারে ওপাশের অলিন্দ্যে কাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। কি বিজাতীয় ভাষায় তারা কথা বলছে, তার একবর্ণও বোঝে না সে।

তবু কান পেতে শোনে। ওরা নিজেদের মধ্যে কি গোপনে পরামর্শ করে চলেছে। একজনের পোষাক দেখে মনে হয় সে যোদ্ধাই হবে।

আবছা অন্ধকারে সঠিক দেখাযায় না।

চাঁদের আলো একটু উঠেছে আকাশে। কৃষ্ণপক্ষের তিথি, তাই মধ্যরাত্রির পরই আলোর আভাস জেগেছে কিন্তু সেই আলোটুকুও প্রাঙ্গণের একটা পিপুল গাছের পাতায় এসে আটকে গেছে।

তারই ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো আঁধারির আভাস জেগেছে তাতেই দেখা যায় একজনের পোষাক যোদ্ধার মতই। মাথায় শিরস্ত্রাণ, কোমরে কোষবদ্ধ তরবারি। মুখে বেশ খানিকটা ঘন দাড়িও রয়েছে। মনে হয় কোন ভিনদেশীই হবে অপর একজন তার তুলনায় অনেক শীর্ণ। পরনে লম্বা একটা আলখাল্লা গোছের।

রংটা ঠিক বোঝা যায়না।

কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে সে যোদ্ধাবেশী সঙ্গীকে।

শুভা সরে এল। কোন পথচারী না হয় ভিনদেশী সওদাগর রাতের অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছে এইখানে।

এর বেশী আর কৌতূহল তার নেই।

অনেক কিছুই অন্ধকারে ঢাকা থাকে। রাতের অন্ধকার তাই রহস্যময়। দিনের আলোয় তার রূপ প্রকাশিত হয় না।

তার রূপবদল হয় মাত্র।

ভারতের উত্তর পূর্ব দিকের পাহাড় শ্রেণী তুষারাচ্ছন্ন সেই পর্বতসীমা পার হয়ে ভারতে এসেছিল কয়েক বৎসর আগে একটি নির্বাসিত মানুষ।

তিনি খিবার রাজবংশের একটি রাজকুমার আবু সইদ রাইয়ান আলবেরুণী। গজনীর সুলতান মামুদের লুব্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল উর্বর সবুজ শস্যশ্যামল খিবার উপত্যকার দিকে।

একদিন খিবা আক্রমণ করে বসল গজনীর সুলতান। হাজারো মানুষের রক্তে খিবার প্রান্তর আরক্তিম হয়ে উঠলো। শান্তিপ্রিয় খিবাবাসীরা হারালো তাদের স্বাধীনতা তাদের সবকিছু। তরুণ আবু রাইয়ান আলবেরুণীকেও রাজবংশের অনান্য অনেকের সঙ্গে বন্দী করে নিয়ে আসা হ'ল গজনীতে।

সুলতান মামুদের দরবারে দাঁড়িয়ে আলবেরুণী আবেদন করেছিলেন।

—আমাকে হত্যা কর।

সুলতান মাহমুদ জানে আলবেরুণীর পরিচয়। তার নাম পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে তখনই সুপরিচিত। আলবেরুণী সারা অন্তর দিয়ে অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী ওই মাহমুদকে ঘৃণা করে।

সুলতান তাই ওকে জবাব দেয়।

—তোমার দেহকে নয় ও তোমার বিবেক বুদ্ধি জ্ঞানকে ধীরে ধীরে আমি হত্যা করবো আলবেরুণী, তুমি পণ্ডিত জ্ঞানী। তাই তোমার এই গর্বকে আমি ধূলিসাৎ করে দেব। আপাততঃ গজনীতে নয় তোমাকে রাখা হবে মূলতান কেল্লায়। খিবা-গজনীর ত্রিসীমানায় তুমি আসতে পারবে না।

জন্মভূমি খিবা-থেকে নির্বাসিত হ'ল আলবেরুণী।

দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ তুষারাচ্ছন্ন আকাশস্পর্শী পাহাড়শ্রেণী পার হয়ে একটি নির্বাসিত মানুষ এগিয়ে এসেছিল ভারতের দিকে।

হিন্দুস্থানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী তখন মূলতান।

নদীর তীরে সূর্য মন্দির। ভোরের আকাশে আলো ফোটবার আগেই তার আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হয় সূর্যদেবের স্তবগান।

মন্দিরে ওঠে মঙ্গল আরতির ঘণ্টাধ্বনির সুর।

দেশ দেশান্তর থেকে আসে হাজারো ভক্ত। মূলতানের পণ্ডিতদের খ্যাতি তখন দেশজোড়া।

সংস্কৃত সাহিত্য উপনিষদ বিভিন্ন শাস্ত্র জ্যোতিষ বিজ্ঞান সব কিছুরই চর্চা হয় সেখানে। মহাপণ্ডিত শ্রীপালদেব সর্বজনপূজ্য।

তরুণ আলবেরুণী এগিয়ে আসছেন মুলতানের দিকে। ভারতবর্ষ তাকে যদি আশ্রয় দেয় সেই আশায়।

নিজেও সে গ্রাস-আরব ইরাণ ঘুরে এসেছে। সেখানে পাঠ গ্রহণ করেছেন আলবেরুণী। সেখান থেকেই ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ভারতের পণ্ডিতদের কথা শুনেছেন।

বিরাট ঐতিহ্যময় এই দেশ। পথে পথে এর ধর্মের পীঠস্থান, জ্ঞানের যজ্ঞশালা। তাই অনেক আশা নিয়েই এসেছেন তিনি এই ভারতভূমিতে।

তার নির্বাসিত ব্যর্থ জীবনকে সে সার্থক করে গড়ে তুলবে।

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা।

আলবেরুণী সেই ভাঙ্গা মন নিয়ে এসেছিল হিন্দুস্থানে। তাকে আশ্রয় দিয়েছে ভারতভূমি। মহাপণ্ডিত শ্রীপালদেব তাকে শিষ্যত্বে বরণ করে নেন।

আলবেরুণী সেই থেকে ভারতবর্ষেই রয়ে গেছেন।

কনৌজ মথুরা হয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন দেখেছেন চিনেছেন ভারতবর্ষকে।

বিভিন্ন শাস্ত্র ও পাঠ করেছেন।

অনেকেই প্রথম প্রথম আপত্তি করেন। বিধর্মীকে হিন্দুশাস্ত্র বেদ উপনিষদ পড়ার অধিকার তারা দিতে চায়নি।

কিন্তু মহাপণ্ডিত শ্রীপালদেবই তাঁকে এই অধিকার দিয়ে তার দাবী মেনে নেন।

ধর্মের তুচ্ছ বিধি নিষেধ তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করেনি। মুগ্ধ হয়েছিলেন তরুণ পণ্ডিত।

নীরব শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠেছে। বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ ধর্ম রাজনীতি আর মানবিকতার ত্রিধাসঙ্গমে এর নীতি গড়ে উঠেছিল। তিনটি ভিন্নমুখী সত্বাকে একত্রিত করে ভারত তার জীবনদর্শন গড়ে তুলেছে।

বৌদ্ধ-জৈন পারসিক ধর্মমত এখানে নিজেদের একই প্রবাহে প্রবাহিত করেছে। হিন্দুদের মধ্যে ও কেউ শৈব কেউ শাক্ত।

থানেশ্বব মূলতানের অধিপতিরা ও শিবের উপাসক!

কেউ সূর্যের পূজারী কিন্তু তবু একই মহান সুরে তারা বিধৃত।

আলবেরুণী এই বিচিত্র ভারতবর্ষকে জানতে বেব হয়েছেন।

রাজস্থানের অজপালের রাজধাণী আজমীর জয়পুর আলোয়ার হয়ে পরমার রাজ্যে অবুর্দ পর্বতে জৈন জিন তীর্থঙ্করদের মন্দিরের শ্বেত মর্মর শিল্পকলা দেখে তিনি এগিয়ে চলেছেন সৌরাষ্ট্রনগুলের শৈবতীর্থ সোমনাথের দিকে ।

সোমনাথ মন্দিরের কথা তিনি শুনেছেন। ভারতের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ সেই মন্দির। যেমনি তার সম্পদ তেমনি তার বৈভব।

একা পরিব্রাজক আলবেকনী বের হয়েছেন ভারতের এই তীর্থ পরিক্রমায়।

এতদিনে ভুলে গেছেন তিনি তাঁর জন্মভূমির কথা। তবু মাঝে মাঝে গিরিশ্রেণী সবুজ উপত্যকার বুকচিরে ছোট নদী গ্রামবসত দেখে মনে হয় তাঁর ফেলে আসা সেই জন্মভূমি খিবার কথা।

সেখান থেকে তাঁকে বন্দী করে এনেছিল সুলতান মামুদ, তাঁকেও তিনি ভুলতে পারেন নি।

নিষ্ঠুর একটা মানুষ। জীবনে সে কেবল লুণ্ঠন আর অর্থ সংগ্রহই করেছে। আর মানুষের রক্তধারার প্লাবন এনেছে মৃত্তিকার বুকে।

ভারতবর্ষে এসে তবু তাকে কিছুটা ভুলতে পেরেছিলেন তিনি। ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্য সাংস্কৃতিক চেতনা আর এর প্রাচুর্য মানুষের মনকে উদার, দার্শনিক করে তোলে।

তাই বোধ হয় আলবেরুনীও তার ব্যর্থজীবনে বাঁচার একটা আশ্বাস এখানে পেয়েছেন।

দীর্ঘ পথ পার হয়ে তিনি চলেছেন সোমনাথ প্রভাসপত্তনের পানে। পথ শেষ হয়ে আসছে।

রাতের বেলায় সরাইখানায় এসে উঠেছেন ওপাশে গিরি-শহরের বসতিগুলো সুপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন।

তারার মৃদু আলোয় একাই সুপ্তিমগ্ন সরাই-এর মাঝখানের চত্বরে পায়চারী করছিলেন এমনি সময় ওই যোদ্ধার পোষাক পরা লোকটিকে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হন আলবেরুনী।

পরনে তাঁর হিন্দু সন্ন্যাসীর মতই গেরুয়া একটা আলখাল্লা আর রোদ থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য পরেছেন একটা পাগড়ী।

সৈনিক এগিয়ে আসতেই অনুমান করেন আলবেরুনী সে পরদেশী। মুখে দাড়ির আড়ালে জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ, ও জেব্বার পকেট থেকে একটা ছোট পাঞ্জা বের করে দেখাতেই শিউরে ওঠেন আলবেরুনী।

—সুলতান মাহমুদ শাহের তাঁবেদার এ বান্দা। আপনার কাছে তার হুকুমৎ নামা পাঠিয়েছেন খুদার বান্দা সুলতান মাহমুদ। খৎটা এগিয়ে দেয়। এদিক ওদিক চেয়ে আলবেরুনীকে বলছে চাপা স্বরে।

—ভিতরে চলুন। কথাবার্তা আছে।

আলবেরুনীকে যেন কঠিন কণ্ঠে আদেশ করছে লোকটা।

এতদিনের পরও সুলতান তার পিছু ছাড়ে নি। বন্দীর এই শাস্তি যে কি বেদনাদায়ক তা এইবার মনে হয়।

সৈনিকের কণ্ঠস্বর আরও কঠিন হয়ে ওঠে।

—ভিতরে চলুন। কেউ দেখে ফেলবে।

আলবেরুনী যেন সেই বন্দী। ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে স্বয়ং নিষ্ঠুর সেই দৈত্য সুলতান মামুদ। তাকে ফরমাইস করছে।

ঘরের ভিতর ঢুকে সৈনিক সেই একটি মাত্র দরজাও বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে গেল। দীপাধারে একটা শিখা গন্ধকের কাঠি দিয়ে জ্বেলে দেয় সেই-ই।

ম্লান এই আলোতে আলবেরুনী সেই চিঠিখানা পড়ে চলেছেন। কঠিন একটা কায। যেমন কঠিন তার চেয়েও নীচ। সুলতান মাহমুদ তার পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়েছে। বারবার জানিয়েছে আলবেরুনী পণ্ডিত লোক, এই সব খুঁটিনাটি খবর—তার জানা আছে সেগুলোকে সুলতান মামুদ কাযে লাগাতে চান।

আলবেরুনী বিপদে পড়েছেন। ঘৃণ্য এই কাযের নাম শুনেই সারা দেহমন জ্বলে উঠেছে। আপন মনেই বলে চলেছেন।

—এ হতে পারে না। কক্খনো হতে পারে না, সম্ভব নয়।

সৈনিক কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

আলবেরুনী এই ঘরের ম্লান লালাভ আলোয় ওকে এইবার চিনতে পারে। সাধারণ সৈনিক এ নয়। নইলে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কাযের ভার মাহমুদ তাকে দিত না।

মাহমুদের অশ্বারোহী বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি হাসান খান্। মধ্য এশিয়ার লোক। ওদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই মাটির সংস্পর্শে নয় ঘোড়ার পিঠেই কাটে। ঘোড়াই ওদের একমাত্র সঙ্গী সহচর।

তাই পশুত্ব ওদেরও সহজাত ধর্ম।

আলবেরুনী জানে ওর নিষ্ঠুরতার কথা। হাসান খান্ ওর কথায় একটু কঠিন স্বরে জানায়।

—খোদার বান্দার হুকুম আমাকে তামিল করতে হবে জনাব। আপাততঃ এ বান্দা আপনার পুঁথি রোকড় পথনিশানার জাবেদা নিশানা পত্রগুলোই হস্তগত করে সুলতানের কাছে পেশ করবে।

চমকে ওঠে আলবেরুনী।

—এত দিনের রোজনামচা রাহানিশানী আমার লেখা পত্র এতে সুলতানের কি কায হবে?

হাসান খান্ মাথা নাড়ে।

—তা মালুম নেই আমার। এই হুকুম—আমি তামিলদার। ব্যস। তা সোজা কথায় না দেন—

হাসানখান পরের কাযের ইঙ্গিতটাও জানিয়ে দেয়। স্তব্ধ আলবেরুনী অবাক হয়ে ওই দৈত্যটার পানে চেয়ে থাকেন।

ওরা সব পারে।

নিষ্ঠুর সুলতান মাহমুদের কথাটা মনে পড়ে।

—তোমাকে হত্যা করবো না, তোমার বিবেক চিন্তা মনের উপর তিলেতিলে আমি দখল কায়েম করবো। মানুষ থেকে তোমাকে অন্য কিছুতে বদলে দোব। এই হবে তোমার শাস্তি।

হাসাম খান্ বাইরে কার পায়ের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। নিমেষের মধ্যে এক ফুৎকারে ওই প্রদীপটা নিভিয়ে দেয়, অন্ধকারে ওর দুটো চোখ শ্বাপদ লালসায় জ্বলছে।

বাইরের আকাশ বাতাসে গির অরণ্যভূমির থেকে সিংহের গর্জন কানে আসে। কোথাও মানুষ নেই।

আলবেরুনীর সামনে আজ চারিদিকে ওই শ্বাপদ হিংসার করাল ছায়া, প্রাণঘাতী গর্জনে শান্ত আকাশতল কাঁপিয়ে দিয়েছে।

হাসামখান্ অন্ধকারেই তার কার্য্যসিদ্ধি করে ওর চোখের সামনে দিয়ে বের হয়ে গেল।

রাতের অন্ধকারেই তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

অন্তরালের এই বেদনাময় নাটকের কথা শুভা জানে না।

সকালের আলো ফুটে উঠতেই সে পথে নামে! আবার সেই যাত্রা শুরু হয়। এবার পথের শেষ হতে আর দেরী নেই।

সামন্তদেবকে একজন পরিব্রাজকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে শুভা একটু অপেক্ষা করছে।

ওদিকে অশ্ব তৈয়ারী।

সারারাত্রির বিশ্রামের পর ঘোড়া দুটো আবার সতেজ হয়ে উঠেছে। পথের ও শেষ হতে দেরী নেই।

সোমনাথের রাজ্যে তারা এসে পড়েছে।

পথে দেখা যায় লোকজন চলেছে সোমনাথের দিকে। ভারিরা বহু দূর গঙ্গা থেকে জল নিয়ে দলবেঁধে চলেছে। সোমনাথের মন্দিরে সেই গঙ্গাজল পূজোয় লাগবে। দেবতাকে স্নান করানো হবে।

চমকে ওঠে শুভা।

—গঙ্গা থেকে এই জল আসছে? সে তো বহুদূর। সারা রাজস্থান পার হয়ে আসছে সেই জল?

ক্লান্ত বাহকরা হাসি মুখে জানায়।

—এই রীতি মা! সোমনাথের কৃপায় সে পথও সহজ হয়ে ওঠে।

শুভা চুপ করে।

সারা মন দিয়ে এ কথা বিশ্বাস করে আজ। সে ও তো দূর থেকে আসছে নানা কষ্ট সহ্য করে। এসব কষ্টের কথা কোন দিনই কল্পনাও করেনি সে।

তাও সয়ে গেছে।

ভক্ত পূজারীর দল চলেছে।

সামন্তদেব বলে।

—একজন পরিব্রাজক তীর্থযাত্রীর সবকিছু কাল চুরি হয়ে গেছে। এতটা পথ যাবেন।

শুভাই বলে।

—ওকে এই রথেই আসতে বলো।

আলবেরুনী শুভার কথায় একটু বিস্ময় বোধ করেন। জবাব দেন তিনিই।

—অপরিচিত একজন তীর্থযাত্রীকে তোমার রথে ঠাঁই দিচ্ছ মা?

শুভা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

শান্ত সৌম্যদর্শন একটি পুরুষ। দুচোখের দৃষ্টিতে ওর প্রচ্ছন্ন একটা আভা।

শুভা বলে।

—তীর্থযাত্রায় বের হয়ে মানুষ মনের সব কালিমা মুছে ফেলে, তাই ও পাপ চিন্তা আর নেই। আপনি উঠে আসুন।

আলবেরুনী রথে উঠলেন।

মনে মনে এই বিচিত্র নারীর কথা ভাবছে। তীর্থযাত্রায় এসে মনের সব পাপ কালিমা ধুয়ে ফেলে মানুষ।

কিন্তু তাঁর রোজনামচায় অনেক পথের নির্দেশ রাজাদের সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য এ দেশের সম্বন্ধে নানা কথাই রয়ে গেছে।

সে সব আজ নিয়ে চলে গেল সেই সুলতান মামুদের চর। কেউ তার উদ্দেশ্য জানে না।

তবু মনে হয় সে ওকে এ দেশ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়ে ফেলেছে।

এ দেশের অনেক দুর্বলতার সংবাদও জেনে যাবে ধূর্ত সেই মাহমুদ। বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের কাযই সে করে বসেছে এই তীর্থযাত্রায় বের হয়ে।

ধূলিধূসর রুক্ষ পথ। পিছনে, গির্ণার পর্বতটা তখনও দেখা যায়। রথ চলেছে সোমনাথ পত্তনের দিকে।

আলবেরুনী চেয়ে থাকেন ওই রুক্ষ বন্ধ্যা প্রান্তরের দিকে। মাঝে মাঝে লাল মাটির রুক্ষ টিলার বুকে পাথরগুলো বৃষ্টির জলে বের হয়ে পড়েছে। তবু যেখানে মাটি পেয়েছে সেইখানেই মাথা তুলেছে কিছু গাছ পালা সবুজের নিশানা।

তার আশ্রয়দাত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। শুভা প্রশ্ন করে।

—কোথা থেকে আসছেন আপনি?

আলবেরুণী আনমনে জবাব দেন - মূলতান থেকে

মূলতান! এই নামটাই যেন আলবেরুণীকে কেমন বেদনা দেয়। ওই সমৃদ্ধ নগরী মূলতান একদিন পথহারা নির্বাসিত আলবেরুণীকে আশ্রয় দিয়েছিল।

সেদিন ক্লান্ত হতাশ এই আলবেরুণীকে পথ দেখিয়েছিল একটি নারী। তার দীর্ঘ আয়ত দুটো চোখ—আজও ভোলেনি আলবেরুণী।

সহরের কোন ধনীর দুলালী মন্দিরে আসছিল—পথে ওই ক্লান্ত আশ্রয়হীন আলবেরুণীকে দেখে দাঁড়াল। তাকে সেও এমনি প্রশ্ন করেছিল। সেদিন জবাব দিয়েছিল আলবেরুণী।

—সুদূর খিবা থেকে আসছি। বিতাড়িত আমি—

—অপরাধ!

—জোর করে আমার দেশ অধিকার করেছিল এক দস্যু। তারই প্রতিবাদে আমি দেশ ছাড়া আশ্রয়হীন সর্বহারা।

সেদিন সেই নারীই তাকে প্রথম জানিয়েছিল সান্ত্বনা, আশ্বাস দিয়েছিল।

—ভারতবর্ষে তুমি আশ্রয় পাবে।

বিদেশীকে সেদিন মুলতান আশ্রয় দিয়েছিল। সেই বিচিত্র

নারীকেও দেখেছিলেন আলবেরুণী। তার অন্তরে কি মধুর একটি স্মৃতিস্বপ্ন জাগে। কিন্তু মুসাফির আলবেরুণী সেই নারীর প্রেমের মর্য্যাদা দিতে পারেননি।

ক'বৎসরে তারা আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিল দুজনে দুজনকে চিনেছিল। কিন্তু আলবেরুণীর কাছে সেই ভালবাসার কোন সার্থকতা আসেনি।

পথের মানুষ আবার পথেই হারিয়ে গেছে। আলবেরুণী তবু সেই বিচিত্র নারীকে ভুলতে পারেননি। জীবনের ভিড়ে সেই নারী হারিয়ে গেছে।

চুপ করে বসে থাকেন। একবার জীবনে নারীর সান্নিধ্যে এসে বেদনাই পেয়েছেন তিনি, বিচ্ছেদের বেদনা।

আর সেই ব্যথা বাড়াতে চান না!

রুক্ষ মাটির রূপ বদলাচ্ছে।

ক্রমশঃ সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে মৃত্তিকা। কোথায় গ্রাম প্রান্তে গমের ক্ষেতে সোনালী আভা এসে লেগেছে।

বাতাসে মাথা নাড়ছে সেই পুরুষ্টু শিষগুলো কি এক পূর্ণতার আবেশ নিয়ে। দুচারটে ময়ুর দল বেঁধে ঘুরছে।

সুন্দর লেজে আর পাখনায় রং বাহার ফুটেছে। ক্রমশঃ কলা গাছ—নারকেল গাছ—সবুজ আখ ক্ষেতের সীমানা ঘেরা গ্রাম দেখা যায়।

নদীটা এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

সরস্বতীর তীর ধরে রাস্তাটা চলেছে।

দিগন্ত সীমায় দেখা যায় সোমনাথ মন্দিরের আকাশ স্পর্শী চূড়া। শুভা দুহাত তুলে ভক্তিভরে নমস্কার জানায়। তার যাত্রা পথের প্রান্তে এসেছে সে।

হঠাৎ সেই পরিব্রাজকের দিকে চেয়ে অবাক হয় শুভা।

তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, দুচোখ মেলে দেখছেন ওই দিগন্ত সীমায় আকাশ ছোঁয়া ওই মন্দির চূড়ার দিকে।

—প্রণাম জানাচ্ছেন না ?

শুভার কথায় পরিব্রাজক চমকে ওঠেন॥ আলবেরুণীর পরিচয় সে জানে না।

নামও হয়তো শোনেনি।

তাই পরিব্রাজককে ভেবেছিল কোন হিন্দু সন্ন্যাসীই।

আলবেরুণী তার পরিচয় গোপনই রাখতে চান। ওর কথায় তাই জবাব দেন।

—প্রণাম তো অন্তর থেকেই জানিয়েছি মা। দিনরাত তো তাঁকেই প্রণাম জানাচ্ছি।

পথের ভিড় বেড়েছে।

ছোট জলধারা যতই এগোয় সাগরের দিকে ততই তার কলেবর বেড়ে যায়—গভীরতা বাড়ে। বাড়ে তার দুর্বার তেজ।

সেই শান্ত পথটা এখন কলরব মুখর। হাজারো যাত্রী চলেছে। পিছনে হঠাৎ তুরীধ্বনি শোনা যায়। সকলেই পথ থেকে সরে দাঁড়াল।

একদল অশ্বারোহী চলেছে দ্রুতবেগে, ওদের পোষাকে দিনের আলো পড়ে ঝলসে উঠছে। শিরস্ত্রাণের উপর ঝক ঝক করে রোদ। ওদের তুরিধ্বনির শব্দ মিলিয়ে না যেতেই এগিয়ে এল একটা মূল্যবান রথ। তেজী চারটে ঘোড়া কেশর ফুলিয়ে ছুটছে।

রাজা ভীমদেব চালুক্য চলেছেন সোমনাথ মন্দিরে অর্ঘ দিতে। হাজারো জনতার ভিড়ে মিশেছে বিদেশী তীর্থ যাত্রীর দল। কেউ

আসছে মথুরা—কেউ কনৌজ কেউ রাজস্থান—কেউ পাটলীপুত্র কেউবা সুদূর গৌড় থেকে।

তারা সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি দেয়।

—দেবাদিদেব সোমনাথ কি জয়।

শুভার মনে অপূর্ব একটি সাড়া জাগে। রাজা—প্রজা—ধনী দরিদ্র কোন ভেদ নেই। সকলেই এখানে একটি মাত্র চেতনায় উদ্বুদ্ধ, প্রণত!

শুভার সারা জ্বালা ভরা মন আজ সেই সমুদ্রতীরে শান্তিনীরের সন্ধানে এসেছে।

ওদিকে দেখা যায় বন্দরের সামা রেখা, পিছনে নীল সমুদ্র।

এদিক ওদিকে দু-একটা বড় জাহাজ সম্পূপ—নৌকা—দেখা যায়। একদিকে সমুদ্র অন্য দিকে সরস্বতী আর কপিলা—দুই দিকেই এই জলধারার সঙ্গে যোগ করে বিরাট খাত; তাতে নীলজল বয়ে চলেছে।

চারিদিকে জলধারা বেষ্টিত বিশাল প্রাকার ঘেরা নগরীর প্রবেশ দ্বারে এসে ওদের রথ থামলো।

অপরাহ্ণের আলো পড়েছে ঝাউ আর আম বনে। পাখীর কলকাকলি শোনা যায়। ওপাশের বিশাল দ্বারে প্রহরীরা ওদের পরীক্ষা করে নগর প্রবেশের অনুমতি দেয়।

মন্দির এখনও দূরে।

এটা সহরের সীমানা। বিপনী—হট্টিকা আর ধর্ম্ম অধিষ্ঠান গৃহ এই দিকেই। দেশ বিদেশের পশরা নিয়ে আসে সওদাগরের দল। যাত্রীর ভিড়ে রাস্তায় চলার উপায় নেই। মাঝে মাঝে প্রহরীরা ঘোড়ায় চড়ে—না হয় মুক্ত কৃপাণ হাতে চলেছে।

দূরে কোন প্রাকার থেকে টিকারার গুরুগম্ভীর শব্দ ভেসে আসে।

প্রহরার পালা বদলের সঙ্কেত ধ্বনি।

প্রহরে প্রহরে ধ্বনিত হয় কাল সঙ্কেত। সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজপথে আলোগুলো জ্বলছে।

আলোর মালা জ্বলছে বিপনিতে।

শুভা বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এই দেবনগরেব সম্পদের দিকে। স্থানীয় অধিবাসীরাও এখানে ধনবান।

—আপনি কোথায় থাকবেন ?

শুভার প্রশ্নে পরিব্রাজক জবাব দেয়

—কোন যাত্রীশালায উঠব। মহাদেবেব কৃপায় এখানে আশ্রয়েব অভাব হবে না! আপনার সাহায্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

শুভা কযেকটা স্বর্ণমুদ্রা ওকে দিতে যায।

পরিব্রাজক পিছিযে যায। বিস্মিত হযেছে সে। শুভাকে প্রথমে দেখেই বুঝেছিল কোন অর্থবান গৃহেরই রমণী। তাই তার পক্ষে এই স্বর্ণমুদ্রা অনায়াসে দান করা স্বাভাবিক।

পবিব্রাজক বিনীত কণ্ঠে জানায।

—তীর্থযাত্রীর দান গ্রহণ করা নিষেধ। তবু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। দেবাদিদেব তোমার কল্যাণ করুন। তোমাব মনষ্কামনা পূর্ণ হোক।

পরিব্রাজক আর দাঁড়াল না।

পরিব্রাজককে আর দেখা যায় না। হট্টিকার জনস্রোতেব মধ্যে সেই রাতের আলোয় সে কোথায় মিলিয়ে গেল।

সামন্তদেব বলে।

—এইবার রাতের একটা আশ্রয় তো খুঁজে নিতে হবে ?

শুভা হাসল। মলিন বিষণ্ণ হাসি।

—এতদিন ধরে দুর্গম পথ বনতল—পর্বতশ্রেণী মরুভূমি পার

হয়ে এসেছে, রাতে কোথাও আশ্রয়ই পায়নি। সেখানেই এই সোমনাথদেবই রক্ষা করেছেন। আজ তাঁর আশ্রয়ে এসে সে ভাবনা আর করি না সামন্তদেব। ধুলোপায়েই দেবদর্শন করে তবে অন্য কথা। তোমার সঙ্গে এরপর আর হয়তো দেখা হবে না সামন্তদেব।

এতদিন—এতবৎসর ধরে ওকে লালন পালন করেছে সামন্তদেব ছেলেবেলা থেকে। দেখেছে চিনেছে ওকে।

ওই মেয়েটিই তার আপনজন। এতদিন পর তাকে হারাতে হবে এই কথাটা ভেবে বৃদ্ধ সামন্তদেবের দুচোখে জল ভরে আসে।

শুভা তাকে তার সব সম্পদ—মায় অবন্তীনগরের সেই প্রাসাদ অবধি দান করে এসেছে।

সারা জীবন সামন্তদেবের আর কোন ভাবনা চিন্তা নেই। বলে সামন্তদেব।

—সত্যই তুমি দেবদাসী হয়ে যাবে শুভা? আর ফিরবে না অবন্তী নগরে?

হাসে শুভা।

—দেবাদিদেব যদি চরণে স্থান দেন এইখানেই থেকে যাবো সামন্তদেব। মানুষের সেবা করার চেয়ে দেবতার চরণে স্থান পাওয়া অনেক বড় অনেক পুণ্যের। সেই মনস্থ করেই এই দীর্ঘ পথ পার হয়ে শান্তির সন্ধানে এসেছি। চল, মন্দিরে আরতি সুরু হবে এইবার।

শুভা জোর করে তাকে নিয়ে চলেছে মূল দেবায়তনের দিকে।

এ পথেরও যেন আর শেষ নেই।

বিরাট প্রাসাদ নগরী পার হয়ে আবার মূল প্রাকার। উঁচু পাথরঘেরা আকাশছোঁয়া প্রাচীর। চারিদিকে গভীর পরিখায় জলধারা বয়ে চলেছে।

বিরাট সিংদরজায় অস্ত্রধারী প্রহরীর দল। দরজার চাতালের উপর থেকে বাতিটা ঝুলছে। সেই আলোয় ওরা যাত্রীদের দিকে চেয়ে থাকে। পরীক্ষা করছে ওই চাহনির মধ্য দিয়েই।

স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে ওই প্রাকারশ্রেণী কালো জমাট আঁধারের মত দাঁড়িয়ে আছে। প্রাকারের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে অশ্বখুরের শব্দতুলে প্রহরীদের অধ্যক্ষরা যাতায়ত করছে। এই ছায়ামূর্তি গুলোকে দেখে মনে হয় অশরিরী দেবঅনুচরের দল মন্দিরের দেবতাকে অনুক্ষণ প্রহরা দিয়ে চলেছে।

দ্বারিকাদ্বার পার হয়ে তারপর মূল দেবায়তের সীমানা সুরু। ওদিকে বিশাল পাথরের তৈরী ত্রিতল সৌধ; কয়েকশো দেবদাসীদের থাকার স্থান। ও মহলটা আবার আলাদা সীমা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

একদিকে পুরোহিতদের বাসস্থান, দীর্ঘ সীমাপ্রাচীরের একদিক অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রচিত। কয়েক হাজাব পুরোহিতেব ওই বাসস্থান দেখে বিস্মিত হয় শুভা।

যে কোন রাজার প্রাসাদ রাজ আড়ম্বর ও এই মন্দিরের জাকজমক আর আয়তনের তুলনায় অনেক সামান্য।

আকাশ বাতাশে একটা স্তব্ধতা জাগে। দেবদাসীদের চত্তরের সামনে কয়েকটা পিপুল বট গাছ ছায়ান্ধকারে ঠাঁইটাকে ভরে রেখেছে। সোজা পথটা চলে গেছে মূল দেবায়তনের দিকে।

এর পর আবার সেই সীমাপ্রাচীর।

মূলমন্দির চত্বরে প্রবেশের এই একমাত্র প্রবেশ দ্বার।

সুরক্ষিত সুকঠিন এর গঠন। সতর্ক প্রহরা দিয়ে চলেছে হাজার হাজার প্রহরী।

আলোর আভা পড়েছে এই পাথর নির্মিত প্রাকারের উপর

যেন রহস্যময় এক পুরী। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা আর ময়দানব যেন এই পুরী নির্মাণ করেছেন অতি কৌশলে।

বাইরে দর্শনার্থী জনতা ভিড় করেছে।

মন্দির দ্বারে নকীব আসাসোটা হাতে তারস্বরে সোমনাথের মহিমা ঘোষণা করছে। প্রাকারে নাকড়া বেজে ওঠে।

পুরিয়া রাগে বাজে সানাই এর সুর। পতাকা দণ্ডে উঠল শৈব পতাকা, সমুদ্রের হাওয়ায় সেই বিজয় নিশান উড়ছে সগৌরবে।

যাত্রীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি ভিড় কলরব সুরু হয়। মন্দির চত্তরের দ্বার খুলেছে।

উন্মাদ জনতা প্রবেশ করছে।

শুভা সামন্তদেবও চলেছে এই জনস্রোতে মিশে।

সামনে তাদের সেই সোমনাথ মন্দির।

শ্বেতপাথরের তৈরী এর চাতাল, সামনে স্ফটিকের অপূর্ব কারুকার্য সমন্বিত একটি ফটকের মাথায় মহাকালের ঘণ্টা টাঙ্গানো।

তীর্থযাত্রীদের সকলেই সেই ঘণ্টাধ্বনি করে চলেছে, সামনেই বিরাট বেদী। শ্বেতপাথরের তৈরী অপূর্ব একটি বৃষ, মহাদেবের বাহন। ভক্তিভরে দর্শকরা সেই বেদীকে স্পর্শ করে মন্দিরে এগিয়ে যায়।

বিশাল সেই হর্মের চারিদিকে অপূর্ব শিল্পসৌকর্য, ভিতরের নাটমন্দিরের শিল্পশৈলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সব শিল্পকলাই এখানে যেন দেবতার বন্দনা মুখর। চারিদিকে এর সৌম্য শান্ত সুন্দর একটি আত্মনিবেদনের তন্ময়তা।

মেজেতে শ্বেতপাথরের আচ্ছাদন, মসৃণ হিমশীতল একটি অনুভূতি সারা মন ভরিয়ে তোলে, পূতপবিত্র করে সারা অন্তরকে সব কামনার নিঃশেষ বিলুপ্তিতে।

বাতাস এখানে সৌরভমুখর। নাকড়া তুরী ভেরী বাজছে।

বিশাল জ্যোতির্লিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে মূলপূজারী গঙ্গাসর্বজ্ঞ আরতি করে চলেছেন। বিশেষ পূজার তিথিতে তিনিই দেবতার পূজা করেন এখনও। নইলে কয়েক হাজার পুরোহিতই সেই পূজা কর্ম সমাধা করেন।

শুভা সামনে এই সর্বজ্ঞকে দেখে মনে মনে আশ্বস্ত হয়। হয়তো এও মহাদেবেরই করুণা। তাই তাকে ওর কাছে অযাচিত ভাবেই এনেছে।

দুন্দুভির শব্দ ওই মন্দিরের সীমানা পার হয়ে অন্তহীন সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে দিক দিগন্তে বিস্তার লাভ করে।

পঞ্চ প্রদীপের শিখা জ্বলছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের জমাট অন্ধকার বিরাট ঘৃতপ্রদীপের শিখায় উদ্ভাসিত।

শুভা স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে ওই দেবাদিদেবের মূর্তির পানে চেয়ে থাকে। নিঃশেষ প্রণামে লুটিয়ে দেয় নিজেকে।

মন্দিরের দর্শকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও আজ এসেছেন। সারাভারতের বিভিন্ন রাজন্য বর্গও আসেন, তাদের অযাচিত দানে মন্দিরের কোষাগার পরিপূর্ণ। সোনা হীরা মণি মাণিক্য জহরতের শেষ নেই। রৌপ্য কত জমে আছে তার ইয়ত্তা করা যায়নি।

তাছাড়া লক্ষলক্ষ দর্শকের দান তো আছেই।

আজ মন্দিরে দেবদর্শন করতে এসেছেন ভীমদেব চালুক্য। গুর্জর সীমান্তের অন্যতম প্রখ্যাত নরপতি। তাঁর মুখে চিন্তার গভীর ছায়া।

শুভা রাস্তায় আসবার সময় ওর সৈন্যসামন্ত আর সুসজ্জিত রথটিকেই দেখেছিল।

ভীমদেব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘ সৌম্য চেহারা। দুচোখের দৃষ্টিতে একটা উচ্ছলতা। এতলোকের মধ্যে ওর দিকেই দৃষ্টি যায়।

শুভার মনে হয় ওকে যেন কোথায় দেখেছে।

বোধহয় অবন্তীরাজ ভোজদেবের রাজসভাতেই দেখে থাকবে। ঠিক স্মরণ করতে পারে না।

একবার ভীমদেব ও হঠাৎ তার দিকে চাইলেন।

সেই উজ্জ্বল বলিষ্ঠ একটি চাহনি। তিনিও বিস্মিত হন ওকে দেখে।

পথশ্রমে শুভার চেহারা ঈষৎ মলিন। পোষাকও তেমন চমকদার নয়, প্রসাধন পর্ব সে অবন্তী পরিত্যাগ কবার পর থেকেই চুকিয়ে ফেলেছে। শুধু যেটুকু না করলে নয় তাই করে মাত্র।

তবু সেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে চিনেছেন ভীমদেব চালুক্য। ওই চাহনি ওই মুখ চোখের নীরব লাস্য ভোলার নয়।

কিন্তু এত বৈভব সম্পদ পরিত্যাগ করে যে আসা সম্ভব নয়। ভীমদেব তাই এ নিয়ে ভাবতে চান না।

ও বোধহয় অন্য কোন সাধারণ গৃহস্থ নারীই হবে।

রাত্রি হয়েছে।

মন্দিরের দর্শনার্থীরা চলে গেছে।

হঠাৎ গঙ্গা সবজ্ঞের পায়ের কাছে এসে প্রণিপাত করে শুভা।

গঙ্গা সর্বজ্ঞের মন আজ চিন্তায় পূর্ণ। জরুরী মন্ত্রণার জন্য এসেছেন। নানা খবর আসছে নানা দিক থেকে। গঙ্গা সর্বজ্ঞের উপর এই মন্দিরের সব ভার ন্যস্ত, তাই তিনিও ভাবনায় পড়েছেন।

এমন সময় ওই নারীকে দেখে দাঁড়ালেন।

—সোমনাথদেব তোমার কল্যাণ করুন মা।

শুভার দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। কম্পিতস্বরে সে প্রার্থনা জানায়।

—ভগবানের আশ্রয়ের আশাতেই আমি দীর্ঘপথ পার হয়ে এসেছি।

—তুমি কে মা, তোমার পরিচয় ?

গঙ্গাসর্বজ্ঞের কণ্ঠে মাধুর্যের সুর। প্রদীপের আলোয় তিনি ওই নারীর দিকে চেয়ে আছেন।

শুভা জবাব দেয়।

—আমার নাম শুভাবতী। অবন্তীর ভোজরাজের সভানর্তকী ছিলাম। দেখলাম, মানুষের সেবার চেয়ে দেবতার সেবাই জীবনের চরম সার্থকতা। তাই সব পরিত্যাগ করে চলে এলাম। পরম অভাগিনীর কি দেবাদিদেবের চরণে ঠাঁই হবে না ?

ভীমদেবের মুখে চকিতের জন্য এক ঝলক রক্ত উলসে ওঠে। তার অনুমান সত্যই।

ওই রাজনটী তার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। তার মনের এই দুর্বলতার সংবাদ তিনি জানতে দিতে চান না। সরে গেলেন ভীমদেব একটা থামের ওপাশে।

সারা মনে তাঁর একটা ঝড় বয়ে চলেছে

রাজনটী শুভা আজ সব ভোগ পরিত্যাগ করে এসেছে দেবতার পদপ্রান্তে।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ শুভাকে দেখছেন। তিনিও বিস্মিত হয়েছেন।

—মনের এই বেদনা দুদিনেই ঘুচে যাবে, তারপর মনে হবে সারাজীবনকে তুমি ব্যর্থ করে দিয়েছো। তাই বলছিলাম মনকে প্রশ্ন করো মা।

শুভার দুচোখে জলধারা।

অশ্রুভরা কণ্ঠে সে আকুতি জানায়।

—অনেক ভেবেই আমি আমার পথ ঠিক করে নিয়েছি। আশীর্বাদ করুন আমি যেন শান্তি পাই। দেবতার করুণা লাভ করি।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ ওর কণ্ঠস্বরে শোনেন নিঃশেষে আত্মনিবেদনের সুর। মনে হয় ওর অন্তর আজ কোন ফাঁকি নেই।

নাহলে রাজনটী সব বৈভব ত্যাগকরে, এতদূরে ছুটে আসবে কেন? তাই তিনি বলেন।

—দেবতার কাছে সেই প্রার্থনা জানাও মা। তিনিই সর্বময় শান্তিময়।

একজন প্রতিহারীকে দেখে বলেন।

—একে দেবদাসী আলয়ের কর্ত্রীর কাছে নিয়ে যাও, ইনি ওখানে থাকবেন। যাও মা, কাল তোমার সঙ্গে কথা হবে। আমি এখন ব্যস্ত।

শুভা প্রণাম জানিয়ে বের হয়ে এল মন্দির থেকে ওই প্রতিহারীর সঙ্গে।

সামন্তদেব এতক্ষণ চুপকরে ওদের কথাগুলো শুনছিল। শুভার কামনা আজ পূর্ণ হয়েছে। স্থান পেয়েছে এই মন্দির সেবাশ্রমে।

শুভার চোখে মুখে এতদিনের দুশ্চিন্তা ভাবনা মুছে গেছে।

দেবতারই করুণা, নাহলে সোমনাথের সেবার অধিকার এত সহজে কেউ পায় না।

সামন্তদেব বলে।

—শেষ পর্য্যন্ত এই মনস্থির করলে শুভা?

শুভা ওর দিকে চাইল।

বিচিত্র এই জগৎ। চারিদিকে এর আকাশছোঁয়া অন্ধকার প্রাকারসীমা, আকাশে বাতাসে সমুদ্রের স্বনন। স্তব্ধ মন্দিরে আলোর আভা ওঠে।

মানুষের সব কামনা এখানে স্তব্ধ।

শুভাও অন্তহীন এই মহিমার স্তব্ধ গভীরে আজ হারিয়ে গেছে। সামন্তদেবের কথায় জবাব দেয়।

—এই আশা নিয়েই তো এসেছিলাম সামন্তদেব। আজ থেকে

আমি রাজনটী নই, দেবদাসী শুভা। সোমনাথের সেবিকা! আর পিছনে ডেকোনা সামন্তদেব।

তুমি কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে অবন্তীতে ফিরে যাও। আজ থেকে পথ আমাদের দুদিকে চলে গেছে। ভগবান সোমনাথ তোমার মঙ্গল করুন।

শুভা আর দাঁড়াল না।

অন্ধকারে সে হারিয়ে গেল।

একাই দাঁড়িয়ে আছে সামন্তদেব। তার দুচোখ বয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা।

জীবন বড় নিষ্ঠুর। মানুষ তাই হারায়, বেদনা পায়। সবই তার হারিয়ে যায়। কালের এই বিধান।

রাত্রির অন্ধকার নেমেছে।

আকাশ বাতাসে ভেসে আসে আরব সমুদ্রের গর্জনধ্বনি। ঢেউগুলো নিষ্ফল আক্রোশে মন্দিরের ভিত্তিমূলে এসে আঘাত হেনে আবার ফিরে যায়

গঙ্গা সর্বজ্ঞ আজ মন্দিরের কয়েকজন কর্মকর্তাকে ও তার পরামর্শ সভায় আহ্বান করে এনেছেন। সুন্দর প্রশস্থ ঘরখানার সামনেই অলিন্দ। অলিন্দ থেকে বহুনীচে দেখা যায় সফেন সমুদ্র, ঢেউএর মাথায় ঝকঝকে মাণিকের আভা জাগে। সমুদ্রের ফস্ফরাস জ্বলছে ঢেউএর মাথায় মাথায়।

গঙ্গাসর্বজ্ঞের চোখমুখে চিন্তার ছায়া।

ওদিকে বসে আছেন ভীমদেব ওপাশে মন্দিরের পরিচালক মণ্ডলীর কয়েকজন।

একটা কালো ছায়া আকাশকোলে ঘনিয়ে আসছে।

ভীমদেবের কাছে সেই দুঃসংবাদ এসে পৌঁচেছে। গজনীর সুলতান মামুদের নাম সবাই শুনেছেন।

সেই নিষ্ঠুর দৈত্য বহুবার সৈন্য সামন্ত নিয়ে পুণ্যভূমি ভারত-বর্য লুণ্ঠন করেছে। এবারও আসছে।

এবার প্রস্তুতি তার আরও অনেক বেশী। ভারতের গৌরব সে চূর্ণ করবে। ধনসম্পদ লুণ্ঠন করাই তার একমাত্র লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্যস্থল এবার এই সোমনাথ মন্দির।

এর সম্পদ বৈভবের কথা সে শুনেছে। তাই প্রস্তুত হয়ে আসছে, এবাব ভারতের এই পূণ্য মন্দিরকেই সে ধ্বংস করবে।

গঙ্গাসর্বজ্ঞের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

—ভারতবর্ষ কি বীরশূন্য? এখানের রাজন্যবর্গ কি বিদেশী একজন শত্রুকে বাধা দিতে পারেন না? তাঁরা কি মাতৃভূমির এই গৌরবটুকু রক্ষায় অসমর্থ?

ভীমদেব ওঁর কথাগুলো শুনছেন।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ ভারতের অনেক সংবাদই রাখেন। এখানকার মৃত্তিকার সাথে তিনি পরিচিত।

তার তেজস্বী কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—ভা৭তের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে এসে সে যদি এই মন্দির আক্রমণ করতে পারে তাহলে এই রাজাদের রাজ্য ত্যাগ করা উচিত। বিশাল এই ভারতবর্ষ।

উত্তরে, প্রথমেই আনন্দ পালের বিস্তৃত রাজ্য তারপর আছে মরুস্থলীর ঘোঘাবাবা সজ্জন সিং—আজমীরের মহারাজা ধর্মগজদেব ঝালোর, সপাদলগ্ন, অবন্তীর ভোজরাজ, নাডোল গুর্জররাজ এরা স৲লেই কি অক্ষম?

ভীমদেব স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ আজ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

—শুধু রাজা মহারাজারাই নন। এদেশের মরুভূমি দুর্গম,

একবিন্দু পানীয় জল নেই, আশ্রয় নেই। মানুষ সেখানে রোদের তাপে শেষ হয়ে যায়। দুর্গম অরণ্য, সেখানে পথ চেনা দায়। দুস্তর পর্বতমালা নদী এসব বাধা বিপত্তি ভেদ করে একজন ভিনদেশী এতদূর এগিয়ে এসে আক্রমণ করে সোমনাথ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে একথা ভাবতেও বিস্মিত হতে হয়।

এসব কি সম্ভব ভীমদেব ?

ভীমদেব জবাব দেন।

—এসব বাধা উত্তীর্ণ হওয়া সত্যই অসম্ভব। কিন্তু শুনেছি সেই সুলতান মামুদ নাকি অতি কৌশলী বীর। এ অঞ্চলের পথ বনপথ পার্বত্য গিরিসংকট তার চেনা। তার চর অনুচর গুপ্তচররা এসব তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত রয়েছে।

সারা মন্ত্রণালয়ে একটা স্তব্ধতা জাগে। সকলেই চিন্তিত। গঙ্গাসর্বজ্ঞ তবু আশা প্রকাশ করেন।

—এদেশের সাধারণ মানুষও কি এই অভিযানে বাধা দেবেনা ?

ভীমদেব এই কথাটাও ভেবেছেন। তিনি বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে দেখেছেন। সর্বত্রই প্রায় একই ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর চোখে।

জবাব দেন তিনি।

—কারা বাধা দেবে সর্বজ্ঞ ? দেশের সাধারণ মানুষ আজ রাজতন্ত্রের কঠিন চাপে নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। তাদের বাধা দেবার শক্তিও নেই, সামর্থও সীমিত।

তারা বিরক্ত বিব্রত বোধ করছে। যে রাজতন্ত্র সাধারণ মানুষের সামান্যতম প্রয়োজনের দিকেও দৃষ্টি দেয় না সেই রাজতন্ত্রের উপর এমন কি নিজেদের কোন আদর্শের উপরও তাদের বিন্দুমাত্র আস্থা থাকার কথা নয়।

প্রতিটি রাজ্য আজ নিজেদের মধ্যে হানহানি নিয়ে ব্যস্ত।

ভারতবর্ষ যে এক মহান দেশ, একই আদর্শে তারা একসূত্রে বাঁধা একথা তাঁরা চিন্তাও করেন না কোনদিন।

ভাবেন একজনের বিপদ আসে আসুক, সে ধ্বংস হয়ে যাক, আমি তো বাঁচলাম।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ রাজনীতির এই সাধারণ কথাটা বুঝতে চান না।

তিনি বলেন।

—একটা ঘরে যখন আগুন লাগে তখন অন্য গৃহস্থদের উচিত একত্রে সেই আগুন নিভানো। নইলে সেই বেড়া আগুনে তারা সবাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ভীমদেব উত্তর দেন।

—সেই কঠিন সত্যটা ভারতবর্ষ আজ ও বুঝছে না।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ বলেন।

—তোমাদের বোঝাতে হবে। প্রতিটি রাজ্যকে অবহিত করতে হবে। আমি অবন্তীর সৈন্যাধ্যক্ষ দেবশর্মাকেও স্মরণ করেছি। তোমার উপরও আমার আস্থা আছে ভীমদেব। তোমাদের মত তরুণ কর্মী দেশপ্রেমিকই পারবে সারা ভারতে এই কথাটা প্রচার করতে। আমাদের নিজেদেরও তৈরী হতে হবে।

মন্ত্রণাসভার একপাশে বসে ছিল একটি মাঝবয়সী ব্যক্তি। দেহটা তার এমনিতেই মেদবহুল। রাত্রি অধিক হয়ে গেছে এসব কথাবার্তা আলোচনা গুর্জর সেনাপতি বালুকারামের ঠিক ভালো লাগছিল না।

গুর্জর রাজ চামুণ্ডা রায় এমনিতেই তেমন কাযের লোক নন। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই অনেকে কিছু গুছিয়ে নিয়েছে।

বালুকারামের দৃষ্টি ওই সিংহাসনের দিকে।

তাই সামান্য কিছু সে হাত করতে চায় না, এখন থেকেই তার

স্বভাবের সেই নীচতার সংবাদ জানা হয়ে গেলে আসল পাওয়াটাতেই বাধা পড়বে।

তাই বালুকারাম গা ঢাকা দিয়ে আছে। সুযোগ খুঁজছে। একটা গোলমাল কিছু হলেই সে সেই সুযোগেই সিংহাসন হস্তগত করবে।

তাকে মন্ত্রণাসভায় ডাকা হয়েছিল, মহারাজ চামুণ্ডা রায় কোনদিনই এসব ব্যাপারে মাথা ঘামান না। তাই বালুকারামই এসেছিল।

রাত্রিতে তার একটু সোমরস পান করার অভ্যাস। কোন কোন দিন বা সরস্বতী নদীর তীরবর্তী শৈব আশ্রম থেকে তার জন্য প্রসাদী গৌড়েয়—নাহয় মাধ্বী পাঠানো হয়। সেই উৎকৃষ্ট পানীয় পান করে সন্ধ্যাটা নৃত্যগীতের চর্চায় কাটে।

আজ এই কঠিন আলোচনার কচকচির মধ্যে এসে পড়ে বিরক্তি বোধ করে বালুকারাম।

তবু কথাগুলো তার কাছে বেশ ভালো খবর বলেই ঠেকে।

একটা গোলমালই হতে চলেছে। একটু হুঁসিয়ার থাকতে পারলে চাইকি বিনা আয়াসেই সারা গুর্জর সৌরাষ্ট্রমণ্ডলের সিংহাসন তার অধিকারে আসবে।

সুলতান মাহমুদের নাম শুনেছে। সে যে এতদূর আসবে তা ভাবেনি।

বালুকারামের তন্দ্রা ছুটে গেছে।

তার মুখ চোখে একটা পৈশাচিক তৃপ্তির আভাস খেলে যায়। গঙ্গাসর্বজ্ঞ বলেন।

—সেনাপতি বালুকারামকেও আমরা এই গুরুকর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতে অনুরোধ করছি।

বালুকারাম মনের উত্তেজনা চেপে জবাব দেয়।

—নিশ্চয়। প্রাণ দিয়েও আমরা এই কায করবো সর্বজ্ঞ।

দিকে দিকে দূত পাঠাবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। জুনাগড়, ভৃগুকচ্ছ কচ্ছ, অবন্তী, আবুপর্বত সবদিকেই দূত যাবে।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ ও তার সর্বশক্তি দিয়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তৈরী হচ্ছেন। বালুকারাম অভয় দেয়।

—গুর্জরও কম শক্তিশালী নয়, সর্বজ্ঞ।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ ওর কথায় বলেন।

—কার্যক্ষেত্রে সেটা দেখা যাবে বালুকারাম। মহারাজকেও এই কথাটা জানাবেন। আপাততঃ আপনার সৈন্যসামন্তদের আদেশ দিন তারা যেন আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কোন বিদেশীকে সন্দেহ হলেই তল্লাস করবে, কোন গুপ্তচর যেন রাজ্যের মধ্যে কোন খবর সংগ্রহ না করতে পারে।

বালুকারাম মোটা দেহ নড়িয়ে মাথা নীচু করে জানায়।

—আপনার আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হবে সর্বজ্ঞ।

রাত হয়ে গেছে।

প্রাকারে সাবধানী প্রহরীর দল ছায়ামূর্তির মত ঘোরাফেরা করছে। মাঝে মাঝে বাতিদানে দুএকটা বাতি জ্বলছে পথে পথে। প্রহরীরা বালুকারামকে চেনে।

বাইরে যাবার দ্বার খুলে দিল।

সহরের ওপাশেই বালুকারামের একটা বিশ্রামস্থল আছে। ছোট খাটো প্রাসাদই বলা চলে।

গুর্জররাজ তার প্রতিনিধির জন্য এখানেও একটা স্থান করে রেখেছেন। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে চলেছে বালুকারাম।

সমুদ্রে এসে মিশেছে এখানে কপিলা আর সরস্বতী নদী। বোধহয় ভাটার সময়।

জলরেখা অনেক নীচে নেমে গেছে। বেলাভূমির ওদিকে সমুদ্রে মিশেছে কয়েকটি জলরেখা।

বাতাসে ওঠে মৌন গুঞ্জনধ্বনি।

বালুকারামের মেজাজটা ঠিক নেই। যে খবরগুলো শুনেছ সেগুলো অনেক গুরত্বপূর্ণ। সুলতান মাহমুদ কেমন লোক কে জানে? তাকে চেনেও না সে।

গুর্জরের সিংহাসন বালুকারামকে পেতেই হবে। চামুণ্ডা রায়কে হত্যা করার শক্তি বা সাহস তার নেই। তাই কৌশলই অবলম্বন করতে হবে।

সারা দেহে একটা ক্লান্তি আর উত্তেজনাব ছায়া নামে। তার প্রাসাদের আলো একটা দেখা যায়। একাই ফিরছে বালুকারাম। ঘোড়াটা চলেছে আনমনে। বালুকারামের সন্ধ্যে থেকে আজ পানীয় জোটেনি। কি ভেবে প্রাসাদের দিকে না গিয়ে ওই ঝাউ বনের ভিতব দিযে চলতে থাকে সরস্বতী তীরের আঁধারঢাকা শক্তি আশ্রমের দিকে। ওখানেব মঠাধ্যক্ষ তার পরিচিত। বালুকারাম জানে ওখানে গভীর রাত্রেও মাধ্বা গৌড়ীয় মদ্য পাওয়া যায়। একটা কিছু পান না করলে সারা দেহমনে কোন জোরই সে পাচ্ছেনা।

নেশার লোভে ওই অন্ধকারেই এগিয়ে চলে লোভী বালুকারাম।

তন্ত্রাচার্য মিত্রপাদ নিজের চেষ্টায় সেই মঠকে আরও বড় আরও শক্তিমান করে তুলতে চান। দুর্গম হিমালয়েব গুহায় তিনি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করে এসেছেন। শিষ্যদলও জুটতে দেরী হয় না।

ভেরাবল বন্দর এবং প্রভাসপত্তনের আশপাশে অনেক সার্থবাহী পণ্যবাহী নৌকার নাবিক মাঝি মাল্লা বেকার যুবক আছে তারাই এসে জোটে এখানে।

তণ্ডুল নাহয় যবচূর্ণ পচিয়ে তৈরী করা পৌষ্টেয় পানীয় নাহয় অরণ্যভূমি থেকে সংগৃহীত মধু থেকে জারিয়ে তৈরী উৎকৃষ্ট মাধ্বি বা সরস্বতী তীরের গ্রামপ্রান্ত থেকে সংগৃহীত ইক্ষু গুড় থেকে তৈরী গৌড়েয় পানীয় তাদের প্রসিদ্ধ।

এছাড়া পার্বত্য অঞ্চল থেকে আসে গুল্ম বিশেষ।

তারই ধূমপান নাকি সাধনার বিশেষ উপযোগী, সেই ধূমপানে চিত্তের একাগ্রতা আসে, সাধনার সুবিধা হয়। তন্ত্রাচার্য সাধন ভজনের জন্যই এই সব পানীয়ের নির্দেশ দেন। অবশ্য অনেকেই এই দিয়ে চিত্তের নির্মল আনন্দের সাধনা করে। ওপাশেই বেশ বড় একটা একতল বিশিষ্ট গৃহ, ওটা অতিথিশালাই বলা যেতে পারে। অনেকেই ওখানে আশ্রয় পায়।

আলবেরুণী সহরে ওদের সঙ্গ ত্যাগ করে এদিক ওদিক ঘুরছেন। অপরিচিত স্থান।

চারিদিকে সতর্ক প্রহরী। মনে হয় তার দিকেও যেন দুএকজন প্রহরী দৃষ্টি দিচ্ছে। গতরাত্রে সরাইখানার সেই ঘটনার পর থেকেই আলবেরুণী চিন্তায় পড়েছেন :

এতক্ষণ সারাটা দিন পথে পথে কেটেছে। ওই মেয়েটি আর সামন্তদেবের সঙ্গে কথায় সে অতীতের চিন্তা ভুলেছিল। একা পড়তেই আবার মনে ভিড় করে আসে। এতদিন তিনি ভারতে আছেন। ভারতবর্ষের শিক্ষা দীক্ষা ধ্যানধারণাকে চেনবার সুযোগ পেয়েছেন, পড়াশোনা করেছেন।

সারা ভারতের বহুতীর্থ পর্যটন করেছেন। তার পথের সব নিশানাটুকুও কাল রাত্রে সেই দৈত্য সুলতানের চর অনুচররা কেড়ে নিয়ে গেছে। তারা যে এতদূর অবধি এসে হানা দেবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি আলবরুণী। ভেবেছিলেন তিনি মুক্ত।

কিন্তু সে যে সুলতান মাহমুদের বন্দী এই কথাটাই কাল যেন তারা তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছে।

তার কোন স্বাধীন চিন্তাধারা মতামত থাকবে না।

সহর থেকে বের হয়ে পড়ে আলবেরুণী চলেছেন পরিখার ওপারের রাস্তা দিয়ে। আবছা চাঁদের একটু আলোয় আঁধার ঘনতর হয়ে উঠেছে।

সামনে সরস্বতীর বিস্তার। জোয়ারের জল ঘন ঝাউবনের নীচে এসে ঠেকেছে। পথটা বাঁদিকে মোড় নিয়ে নদীর ধারে ধারে চলেছে। একপাশে নদী, অন্যদিকে প্রাসাদমালা।

সোমনাথ মন্দিরের পরিবাহক ক্ষৌরকার জলবাহী ইত্যাদি কর্মচারীদের বাসস্থান। এরা সংখ্যায় কয়েক হাজার হবে।

তাদের বাসস্থানের সীমানা পার হতে অনেকক্ষণ লাগে। পিছনে মাথা তুলে রয়েছে সোমনাথ মূল মন্দিরের বাইরের প্রাকার। এর বিশালত্ব আর বৈভব দেখে বিস্মিত হয়েছেন আলবেরুণী।

কোথায় চলেছেন জানেন না।

সহরের সীমা শেষ হয়ে এইবার প্রান্তর সুরু হয়েছে। একদিকে সরস্বতী নদীর জলধারা অন্যদিকে নারকেল ঝাউবনের ফাঁকে একটা বাড়ী আর আলো দেখে থামলেন।

এতক্ষণ পর অনুভব করেন তিনি ক্ষুধার্ত।

সহরে কিছু খাওয়াও হয়নি। কি যেন খেয়াল বশে আর দুশ্চিন্তা নিয়ে সহর থেকে বের হয়ে চলেছেন এই দিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যান ওই আলোর নিশানা ধরে। কিছু লোক-জনও দেখা যায়। বাতাসে ওঠে যজ্ঞধূমের সৌরভ। আগুনে ঘৃত আহুতির সৌরভ ওঠে তাতে ধূপ গুগগুলও মিশেছে। আলবেরুণীর এই সৌরভ পরিচিত।

মুলতানে মথুরায় তিনি ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ করতে দেখেছেন।

মন্ত্রধ্বনি শোনা যায়।

কারা অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশে বসে সমবেত কণ্ঠে মন্ত্র আওড়ে চলেছে।

—কে!

আবছা অন্ধকারে কার কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়ালেন আলবেরুণী।

এগিয়ে আসে প্রশ্নকর্তা।

অস্পষ্ট অন্ধকার ঢাকা রাত্রি, দু একটা মশালের আলোর সঙ্গে আঁধারের চক্রান্ত চলেছে। প্রশ্নকর্তার পরনে রক্তবাস।

দুচোখ ওই অন্ধকারে জ্বলছে। খালি পা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে লালসিন্দুর কিংবা রক্ত চন্দনের মোটা ত্রিপুণ্ড্র।

আলবেরুণীকে সে দেখছে কঠিন সন্ধানী দৃষ্টি মেলে।

—কে? কে তুমি!

ওর হাতে একটা মুক্ত কৃপাণ, একফালি আলোয় নিমিষের জন্য চক চক করে ওঠে সেটা।

আলবেরুণী বেশ বুঝছেন ওদের রাতের অন্ধকারে এই কাজগুলো করতে হয়। বোধ হয় এখানের কর্তৃপক্ষ বা শক্তিমান প্রতিপক্ষ এদের এই রীতিনীতিগুলো ধর্মের বিভিন্ন পন্থাগুলোকে প্রশ্রয় দিতে চায় না।

তাই এদের এই প্রহরা এবং সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে।

—জবাব দাও।

আলবেরুণী ওর অধৈর্য কণ্ঠের প্রশ্নে জবাব দেন ধীর কণ্ঠে।

—আমি ভিনদেশী পরিব্রাজক।

কঠিন কণ্ঠে সাড়া ওঠে।

—সোমনাথ দেখতে এসেছো তবে রাতের অন্ধকারে এখানে উকি ঝুঁকি মারতে এসেছো কেন? গুপ্তচর বুঝি?

আলবেরুণী এক নিমিষের মধ্যে জবাব ঠিক করে নেন।

—ওখানে স্থান হ'ল না! ধর্মের এত বাহ্যাড়ম্বর। এত প্রাচুর্য আর কোলাহল সইতে পারলাম না। তাই বের হয়ে এলাম। যদি শান্ত স্তব্ধ পরিবেশে কোথাও একটু আশ্রয় মেলে তারই আশায়। রাতের মত আশ্রয় একটু পেলে খুশী হ'তাম আচার্য।

—সঙ্গে এসো।

একটা ছায়াান্ধকার একটানা বাড়ী। ঘরগুলো সব বন্ধ। দু'একটা খোলা আছে। আলো জ্বলছে মিটি মিটি।

একটা বন্ধঘর খুলে বলে লোকটি!

—রাতে এইখানে থাকতে পারো এই যাত্রীশালায়। খাবার দাবার নাই

আলবেরুণী তবু একটু আশ্রয় পেয়ে খুশী হন।

ঘরটায় একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে, অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় ওপাশে জানলার ধারে তক্তপোষে একটা পুরোনো কম্বল বিছানো। লোকটির কথায় জবাব দেন আলবেরুণী।

—ওপথেই ঢুকিয়ে নিয়েছ। সোমনাথ পত্তনে।

—উত্তম! কাল প্রত্যুষে আচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

আলবেরুণী ক্লান্ত দেহে ঘরে ঢোকেন।

হঠাৎ অনুভব করেন দরজাটা বাইরে থেকে সেই প্রহরী বন্ধ করে শিকল তুলে দিল। অবাক হন। ডাকতে থাকেন।

—আচার্য দেব!

বাইরে থেকে কঠিন কণ্ঠের জবাব শোনা যায়।

—কাল প্রতুষে সাক্ষাৎ হবে; এখন শান্তিতে বিশ্রাম কর।

হঠাৎ এভাবে অচেনা জায়গায় বন্দী হয়ে যাবেন কল্পনা করেননি আলবেরুণী। চারিদিক বন্ধ।

মুক্তিরও কোন পথ নেই। একটা মাত্র দরজা, তাও বাইরে

থেকে বন্ধ হয়ে গেল, আর আছে একটা গবাক্ষ মত তাও মেঝে থেকে অনেক উপরে।

সেখানে পৌঁছাবার কোন উপায় নেই।

কি ভেবে মনে মনে হাসেন আলবেরুণী। নাঙ্গার আবার বাটপাড়ের ভয় কি ?

নিশ্চিন্ত মনে শয্যায় শুয়ে পড়েন টানটান হয়ে। সারাদিন পথে পথে ঘুরেছেন। সারা শরীর ভেঙ্গে পড়ে ক্লান্তিতে। ঘুম আসতে দেরী হয় না।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে আলবেরুণীর অতীতের দিনগুলো। নিজের দেশ তাকে রক্ষা করতে পারেনি। দেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন সেই অপরাধে গজনীর সুলতান তাকে বন্দী করে এনেছে।

আলবেরুণী চেয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ড।

বন্দীজীবনের পরিসমাপ্তি হোক, কিন্তু নিষ্ঠুর সুলতান ওকে নির্বাসন দিয়েছেন। এদেশে এসে আশ্রয় পান আলবেরুণী। বিচিত্র মহান সম্পদপূর্ণ একটি দেশের ঐতিহ্য তিনি চিনেছেন, তার বেদপুরাণ শাস্ত্র পাঠ করেছেন। দেশ ভ্রমণ করেছেন এখানে। তাঁর সব তত্ত্ব তথ্যের সঞ্চয় ও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সেই সুলতানের অনুচররা।

আজ নিরাশ্রয় একটি মানুষ, জীবনে কোন আশ্বাস নেই। তবু বেঁচে আছেন তিনি।

দেহটাও বিশ্রাম চায়। তার ধর্ম বেঁচে থাকা। তারজন্য সে নিজেই জৈবিক ধর্মে বাঁচবার মত বিশ্রাম আহার্য সংগ্রহ করে নেয়।

তাই অপরিচিত এই স্থানেও ঘুম আসে।

একটা ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

কঠিন একটি দানব, বলিষ্ঠ তার চেহারা। চোখে মুখে কি

লালসার ছাপ, লোভী দুটো হাতে রক্তের গাঢ় দাগ নিয়ে এগিয়ে আসছে তার সামনে।

পিছনে আশপাশে তার মুক্ত কৃপাণধারী সৈন্যবাহিনী, ওদের বর্ষার ফলায় ঝকঝক করে দিনের আলো। তারই আভা ওই দানবের মুখে পড়ে তার পাশবিকতাকে প্রকট করে তুলেছে।

—চিনতে পারো আবু রাইয়ান আলবেরুণী?

আলবেরুণী চেয়ে দেখেন।

ওই দস্যু দীর্ঘ পথ বহু গিরিকন্দর নদী মরুভূমি অবণ্যানী পার হয়ে এইখানে এসে পৌঁচেছে।

চমকে ওঠেন আলবেরুণী।

—সুলতান মাহমুদ!

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দস্যু! বলে চলেছে।

—তুমি মৃত্যু চেয়েছিলে? তোমাকে তিলেতিলেই মৃত্যুদণ্ড দোব। অপমৃত্যুর শাস্তি। শয়তানের কাছে তুমি আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হবে।

—সুলতান!

সুলতান মামুদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—ইতিহাস আমাকে বলবে দস্যু লুণ্ঠনকারী দানব। আর তোমাকে জানবে সেই দানবের ঘৃণ্য গুপ্তচর। তার কাছে তুমি এ দেশের সব সংবাদ দিয়েছো।

—এর চেয়ে আমায় মৃত্যুদণ্ড দাও সুলতান।

আলবেরুণীর কণ্ঠস্বর ওর হাসির প্রচণ্ড শব্দে ঢেকে যায়।

—এই তোমার শাস্তি।

হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় আলবেরুনীর। চমকে উঠে চারিদিকে চাইলেন। কোথাও কেউ নেই। রুদ্ধদ্বার কক্ষে তিনি একা।

মনে পড়ে কাল রাত্রির কথা।

অপরিচিত এই জায়গায় প্রায় বন্দী হয়েই রয়েছেন তিনি। দেওয়ালের উপরে ছোট ঘুলঘুলিটা দিয়ে একঝলক আলোর আভাস এসে পড়েছে। কান পেতে শোনেন—সকাল হতে দেরী নেই।

পাখীগুলো কলরব করছে।

হঠাৎ একটা শব্দে উৎকণ্ঠ হন তিনি। ভারি দরজাটা বাইরে থেকে কে ঠেলে খুলছে, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢোকে অন্ধকার ঘরে দিনের একটু আলো।

কার ভারি কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—বাইরে এস।

তান্ত্রিকাচার্য মিত্রপাদ এখানে ওই সোমনাথ মন্দিরের এলাকার বাইরে সরস্বতী নদীর ধারে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করছেন। আশ্রম অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক আগেই।

তখন গুর্জরখণ্ডে বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল বেশই। হীনযান বৌদ্ধরাই ক্রমশঃ এইদিকে ঘা খেতে খেতে এসে একেবারে নীচুর পর্যায়ে ঠেকেছিল।

সনাতন হিন্দুধর্ম—শৈবতন্ত্র একত্রিত হয়ে তাদের ধর্মমতকে নিদারুণ আঘাত হেনেছে। দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে তাদের বিহার গুলোকে ধ্বংস করেছে।

কোথাও কোন আশ্রয় সেদিন তারা পায় নি।

মিত্রপাদ সেই হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই একটি শাখার আচার্য। দেখেছিলেন এই আশ্রমের তখনকার অবস্থা!

সোমনাথদেবের অন্ধ ভক্ত অনুচররা সেদিন এই আশ্রমে অগ্নিসংযোগ করতে দ্বিধা করেনি। হত্যা করেছিল অনেককে।

প্রাণভয়ে সকলেই পালিয়েছিল।

শ্মশানে পরিণত হয়েছিল এই সবুজ শান্ত আশ্রম।

মিত্রপাদ তখন তরুণ, সবে এপথে এসেছেন।

তার তরুণমনে সেদিনের সেই প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা আজও আঁকা রয়ে গেছে। মনে কি দুর্বার জ্বালা নিয়ে সেদিন পথে পথে ঘুরেছিলেন। বুকে প্রতিশোধের আগুন।

কিন্তু প্রবল শক্তিতে সমাসীন সনাতন হিন্দু ধর্ম আর শৈবতন্ত্রকে কোন আঘাতই হানা সম্ভব হয় নি।

তবু টিকে থাকতে হবে। এই ভেবেই সেদিন গির্ণার পর্বতের ওদিকে তাঁরা পালিয়ে যান।

নির্জন গুহায় সমবেত হয়ে তাঁরা মন্ত্রণা করেন এখন প্রতিশোধের কোন চেষ্টাই করা সম্ভব হবে না। চুপকরে কূর্মনীতি অবলম্বন করে লুকিয়ে থাকতে হবে।

গোপনে গোপনে তারা শক্তি সঞ্চয় করবে। শক্তির সাধনা করবে। সুযোগ পেলে তখন দুর্বার বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এই ধর্মান্ধ একটি জাতির উপর।

মিত্রপাদই সেদিন এই পথের সন্ধান দেন।

হীনযান বৌদ্ধধর্ম থেকে কিছুটা সরে এসে তারা তন্ত্র উপাসনার রূপই মেনে নিলেন।

আবার চারিদিকের পরিত্যক্ত আশ্রমে তারা এসে উপস্থিত হলেন দীর্ঘদিন পর। জনসাধারণের মন থেকে সেই তীব্রঘৃণা তখন অনেক মুছে গেছে।

সরস্বতী তীরের আশ্রমে এলেন মিত্রপাদ।

আবার সবুজ হয়ে উঠল আশ্রমের উবর মৃ'ত্তকা। গাছগুলো ততদিনে অনেক বড় হয়ে উঠছে। দূর থেকে আশ্রমকে দেখে মনে হয় ঘন বন সীমা, নীচ দিয়ে সরস্বতী বয়ে চলেছে। যোয়ারের জল এসে মন্দিরের পিছনে ঠেকে।

মিত্রপাদ অনেক কষ্টে আবার আশ্রমকে দাঁড় করিয়েছেন। সাহায্য ইদানীং বেশই আসছে। কোন অলক্ষ্য পথে অর্থ সাহায্য আসছে তা আশ্রমের দুচারজন ছাড়া কেউই জানেনা।

নোতুন প্রাসাদ উঠেছে, কেউ কেউ বলে ওরা নাকি ছোট খাটো দুর্গই গড়ে তুলবে, মাটির নীচেও ইতিমধ্যে কয়েকটা ঘর গড়েছে।

এগুলো অবশ্য সবই রটনা।

ইদানীং কোন অলক্ষ্য পথে এখানে আসছে অনেক সাহায্য।

রাতের অন্ধকারে সরস্বতী পার হয়ে কারা আসা যাওয়া করে। রাতের অন্ধকারে আসে অশ্বারোহী আবার রাতের আঁধারেই তারা হারিয়ে যায়। চারিদিকে থাকে সজাগ প্রহরা।

ওদের হাতেই বন্দীহয়েছিলেন আলবেরুণী।

সকালের আলোয় দেখাযায় সবুজ বনস্পতিগুলোকে। চারিদিকে সবুজ নারকেল বীথি আর কলাগাছের প্রহরা। কোথায় মধুমালতীর লতা ছেয়ে ফুল ফুটেছে। বাতাসে মিশেছে তার মধুসৌরভ।

পাখীগুলো ডাকছে।

শান্ত সমাহিত একটি পরিবেশ, সরস্বতী নদীদিয়ে দুএকটা নৌকা মালপত্র নিয়ে দেশের ভিতর থেকে বন্দরের দিকে এগিয়ে যায়। লম্বা গলা বের করে তুলোর বস্তা নিয়ে চলেছে উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে কোন গাঁও প্যাটেল।

আলবেরুণী চারি দিক দেখছেন।

—এই দিকে চল।

প্রাতঃকালে কে তাকে দিয়ে যায় কয়েকখানা চাপাটি, ঘৃতপক্ক চাপাটি। বেশ সুবাস উঠেছে সেই সঙ্গে আখের গুড় আর এক পাত্র দুধ।

কাল সারাদিন ভালো করে খেতেই পাননি। পথশ্রমক্লান্ত দেহ। খিদের মুখে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খান ওই খাদ্য আর পানীয়।

সামনেই একটা বড় বাড়ী, দ্বিতল বলেই বোধ হল। পাথরের তৈরী, সামনে অলিন্দের মত। তারই নীচে একটা ঘেরা জায়গায় আবছা অন্ধকারে কিসের শব্দ শুনে সচকিত হ'ন আলবেরুণী।

এ শব্দ তার চেনা।

ঘোড়ার খুরের শব্দ। তেজী ঘোড়াই কয়েকটা যেন ওই অন্ধকারে বাঁধা আছে। পাথরের মেজেতে তারা পা ঠুকছে।

ওই পা ঠোকার শব্দে সচকিত হয়ে ওঠেন আলবেরুণী। আবছা আলোয় দেখা যায় কয়েকটা আরবী ঘোড়া।

এ জাতের ঘোড়া এখানে বড় একটা দেখেননি, যা দেখেছেন তা খোরাসানী ঘোড়া! এই ছোট ঘোড়াগুলো যেমন দ্রুতগামী তেমনি কষ্টসহিষ্ণু। দামী জিন, রেকাব গুলো ওপাশে রাখা।

মন্দিরে ঘোড়া দেখে আলবেরুণী একটু বিস্মিত হন।

কিন্তু মন্দিরের সেই ধূর্ত নির্বাক সেবক সেটা লক্ষ্য করে ওকে বলে ওঠে।

—প্রাতঃরাশ হয়েছে, এবার নিজের ঘরে চল।

আলবেরুণী বলেন।

—আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

—সম্ভব নয়। অধ্যক্ষের আদেশ না পেলে আমরা তোমায় যেতে দিতে পারি না।

—অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চাই!

মন্দিরের সেবকটি শুকনো কণ্ঠে জবাব দেয়।

—অনুমতি নেই তাঁর। সময় হলেই তোমায় ডেকে পাঠাবেন। এখন তোমার ঘরে যেতে হবে।

আলবেরুণী বাধ্য হয়েই উঠলেন। বেশ বুঝেছেন বলপ্রয়োগ করে কোন লাভ হবে না। চুপ করে সেই টানা ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে আসেন।

কোন শ্রী নেই। প্রাকারের মত মজবুত ঘরগুলো মন্দিরের চারিপাশ ঘিরে রেখেছে নীরব কাঠিন্যে।

ব্যাপারটা আলবেরুণী সঠিক অনুমান ও করতে পারেন না। আচার্য মিত্রপাদ ও তার সঠিক পরিচয় জানতেন না।

সেই রাত্রে মন্ত্রণাসভা বসেছে। মন্দিরের চত্বরে সেদিন ভৈরবী মূর্তির তান্ত্রিক পূজা ও ঘটা করে হয়ে গেছে।

ভীষণ দর্শনা তারাদেবীর পূজো করে তারা রাত্রির মধ্যপাদে।

একদিকে পূজার অভিনয়, অন্যদিকে চলেছে গোপনমন্ত্রণা। গুর্জর সেনাপতি বালুকারাম ও সবে সোমনাথ মন্দিরের মন্ত্রণা সভা থেকে ফিরে এসেছে।

ধূর্ত এই লোকটি চায় সারা গুর্জরের আধিপত্য। বেশ জেনেছে বালুকারাম গুর্জর রাজ চামুণ্ডা রায় অযোগ্য হলেও তার পিছনে আছেন সোমনাথ মন্দিরের সর্বাধিনায়ক গঙ্গাসর্বজ্ঞ আর সৌরাষ্ট্রের মহানায়ক ভীমদেব চালুক্য, তাছাড়া অন্যান্য রাজারাও আছেন।

সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ এই গুর্জরের উপর।

বালুকারাম দেখেছে সেদিক দিয়েও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, সেখানে তার কোন প্রতিষ্ঠাই নেই।

তাই আচার্য মিত্রপাদের কাছেই আসে।

কোথায় অন্ধকারের মধ্যে কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। আজ বালুকারাম শুনেছে সেই সংবাদ। সুদূর গজনী থেকে এগিয়ে আসছে মহাপরাক্রমশালী এক দস্যু। সুলতান মাহমুদ।

সঙ্গে তার অগণিত পদাতিক, অশ্বারোহী বাহিনী। ভারতের একপ্রান্ত থেকে সে অন্যসীমান্ত এই আরবসমুদ্রতীরে সোমনাথের দিকে এগিয়ে আসছে।

বালুকারামের মনে আশার সাড়া জাগে। জানে সুলতান মাহমুদ এদেশে এসে কোন সাহায্য না পেলে একা নিজের জোরে

এতদূর অবধি আসতে পারবে না! এদের সমবেত আক্রমণে সে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

রাত্রির অন্ধকারে এগিয়ে আসে বালুকারাম ভৈরব আশ্রমের দিকে। আশ্রমে যজ্ঞ হোম চলেছে। তার ঘোড়াটা একজন প্রহরী নিয়ে চলে গেল ভিতরের আস্তাবলের দিকে।

বালুকাবাম দ্বিতলের দিকে এগিয়ে যায়।

মিত্রপাদ একটা বড ঘরে বসে আছেন পদ্মাসনে হরিণের চামড়াব উপর। শীর্ণ দেহ, দেহের মধ্যে নাকটাই প্রকট আর শীর্ণ, নাকের দুপাশে দুটো চোখ কি দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করছে।

হাতে গলায় সোনার তারে আটকানো রুদ্রাক্ষের মালা। কপাল সারা দেহ বিভূতিভূষিত। বালুকারাম তাকে প্রণাম করে ওপাশে একটা গালিচাব উপর বসল

—মন্ত্রণাসভা শেষ হ'ল?

বালুকারাম ওর শীর্ণ চেহারার দিকে চেয়ে থাকে।

মিত্রপাদের কণ্ঠস্বরে একটা প্রচণ্ড কাঠিন্য, ওতে মাধুর্যেব লেশমাত্র নেই। বালুকারাম ও অবাক হয় ওর কথায়। গোপন মন্ত্রণা সভার খবর কি করে পৌঁছল এখানে তা অনুমান করতে পারে না।

মিত্রপাদ কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

—সুযোগেব সদ্ব্যবহার করতে চাও?

—সুযোগ? বালুকারাম অবাক হয়।

মিত্রপাদের শীর্ণমুখে শাণিত তরবারির মত ঝকঝকে হাসির আভাস জাগে। মাথা নাড়েন তিনি।

—হ্যাঁ, সুযোগ! ইচ্ছে করলে সাবা গুর্জর তোমার হাতে আসতে পারে।

বালুকারামের মুখে লালসা আর লোভের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

—গুর্জর !

—হ্যাঁ। তবে তার জন্য তোমায় কিছু সাহায্য করতে হবে। আমি তোমায় সেই সুযোগ করে দেবো।

বালুকারাম ধূর্ত লোক। সামান্য সৈনিক থেকে সে আজ একটা প্রদেশের সৈন্যদলের সর্বময় কর্তা হয়েছে। এই উন্নতির জন্য অনেক কিছু দিতে হয়েছে। ও জানে মিত্রপাদ বিনাস্বার্থে তাকে এই সুযোগ দেবেনা।

তাই আগে থেকেই সব কথা পরিষ্কার থাকা ভালো। জিজ্ঞাসা করে বালুকারাম।

—কিন্তু এতে আপনার স্বার্থ ?

হাসেন মিত্রপাদ, তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত ওর হাসি কোটরাগত দুচোখে কি জ্বালা আনে।

তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে আগেকার সেই আঘাতের কথা। ওরা আজ বৌদ্ধতন্ত্রকে কঠিন আঘাত হেনেছে। একদিন তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। নিজের সমাজ দেশের উপর থেকে তাদের প্রাধান্য লুপ্ত করেছে।

তাদের এই চরম অপমান আর আঘাতের প্রতিশোধ নিতে হবে, সে যে কোন মূল্যেই হোক।

তাই মিত্রপাদ বলেন।

—স্বার্থ আমার ও আছে। তবে তোমার স্বার্থ রাজত্ব করা আমার স্বার্থ প্রতিষ্ঠা আর হারানো প্রতিপত্তি ফিরে পাওয়া। সেই সঙ্গে প্রতিঘাত হানা।

বালুকারাম কি ভাবছে।

হাতের কাছে এতবড় প্রাপ্তিযোগের সংবাদে সে হকচকিয়ে গেছে। অনায়াসে সারা দেশটা যে পাকা ফলের মত টুপ করে তার হাতে এসে পড়বে তা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেনি।

মিত্রপাদ ওর দিকে চেয়ে বুঝতে পারেন ধূর্ত বালুকারাম বোধহয় তার মুখে এতবড় কথাটা শুনে বিশ্বাস করতে পারেনি।

তাই ইঙ্গিত করতেই ওপাশের কক্ষ থেকে বের হয়ে এল এক সুপুরুষ গৌরকান্তি সৈনিক।

• পরণে তার আংরাখা, তাতে জরির কাজ করা। প্রশান্ত ললাট, চিবুকের দাড়িটা সযত্নে ছাঁটা। চোখদুটো নীলাভ, সারাক্ষণ তাতে সাপের মত একটা ক্রুরতা মিশে আছে। বালুকাবাম সামনে বিদেশী আগন্তুককে দেখে অবাক হয়।

এখানে কি করে সে এল ভাবতেই পারে না। কোন বিদেশী সওদাগরই হবে বোধহয়। কিন্তু মুখে হাতে ক্ষতচিহ্নের দাগ দেখে অনুমান হয় লোকটা যুদ্ধব্যবসায়ী।

হাসাম খাঁ মিত্রপাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আগে থেকেই, তারজন্য অর্থও দিতে হয় রাজপুতনার দরগা শরীফের লোকরাই এই যোগাযোগ স্থাপন করেছে। শুধু এইখানেই নয় পথেও অনেক মন্দির জনপদে বিভিন্ন কূটকৌশলী অর্থগৃধ্নু লোকদের গোপনে হাতে এনেছে সুলতান মাহমুদের বিশ্বাসী অনুচররা।

দীর্ঘপথ। ভিনদেশ। এখানে তাদের সাহায্য ছাড়া অভিযান চালানো সম্ভব নয়।

মিত্রপাদ পরিচয় করিয়ে দেন।

—ইনি হাসাম খাঁ, সুলতান মাহমুদের সৈন্যাধ্যক্ষ। ইনি বালুকারাম গুর্জরের সেনাপতি।

রাতের অন্ধকার নেমেছে সরস্বতীর ওপারে বনসীমায়। যোয়ারের সময়। জলধারা এসে মন্দিরের প্রস্তরনির্মিত সোপান শ্রেণীর গায়ে আঘাত হেনে ফিরে চলেছে। মেঘাবৃত আকাশে কোথায় দুএকটা তারা আবছা দেখা যায়, আবার ঢেকে যায় আঁধারে।

কোথায় একটা শিয়াল ডেকে ওঠে, পেচক ঘোষণা করে রাত্রির তৃতীয় যাম।

মিত্রপাদ বলেন।

—বালুকারাম জানতে চান তিনি যদি আপনাদের সাহায্য করেন কি পাবেন?

হাসাম খাঁ এমনিতে পশম মেওয়ার সওদাগর সেজেই এসেছে এদেশে তাই ব্যবসাদারী চালটা জানে। জবাব দেয়।

—গুর্জর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব। আমরা এদেশে রাজ্য বিস্তার করতে আসবো না। যা পাই নগদ তাই নিয়েই আমরা খুশী। ওরা বাধা দেবে সে বাধা আমরা নিঃশেষ করে, স্বর্ণ মণিমাণিক্য যা পাবো নিয়ে ফিরে যাবো, তারপর আপনাদের দেশ আপনারা ভোগ করুন।

বালুকারাম ওর দিকে চেয়ে আছে।

—শুধু এই! পরে কি পাবো তার জন্য এত কিছু আগে থেকে করা কি সম্ভব?

হাসাম খাঁ সাপের মত ক্রুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে জবাব দেয়।

—আগাম কিছু চান তাও মিলবে। তবে সেটাও শোধ দিতে হবে রাজ্য হাতে পেলে। এদেশে আমরা তো ব্যবসা করতে আসছি না সেনাপতি, কেন আসছি তাতো জানেনই। লুট করতে। কিছু নিয়ে যেতে, দিয়ে যাবার কথাটা এখানে গৌণ।

বালুকারাম এত জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে তা ভাবেনি।

আজ রাত্রে মন্দির থেকে বের হয়ে চামুণ্ডা রায়ের প্রাসাদেই যাবার কথা ছিল। চামুণ্ডা রায় অবশ্য তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকতো না। তার মেয়ে গোপাবতীর সাক্ষাৎ পেতো।

সেইটুকুই তার কাছে ছিল সবচেয়ে বেশী কাম্য। জীবনে ও একটা পরম পাবার আশ্বাস।

কিন্তু মিত্রপাদের চরের মুখে সংবাদ পেয়ে এখানে এসেছিল, তারপরই এইসব ভাবনায় জড়িয়ে পড়েছে। হাসাম খাঁ ওকে দেখছে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। বলে ওঠে ধূর্ত বিদেশী।

—অবশ্য আপনার যদি অসুবিধা থাকে সেনপতি, আমাকে অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অন্য লোকও এই প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য বসে আছে এবং আপনাকে—

বালুকারাম কথাটা ভাবতে পারে না।

তার সামনে অন্যলোক গুর্জর হাতে পেয়ে যাবে। মহানায়ক চামুণ্ডা রায়ই হয়তো ওৎ পেতে বসে আছে। হাসাম খান তার কাছেই যাবে।

বালুকারাম বলে।

—ঠিক আছে। আমি দু একদিন ভেবে দেখি।

মিত্রপাদ জবাব দেন।

—অবশ্য কিছু এখুনিই পাবে। বালুকাবামই যোগ্য লোক। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে, তৃতীয় যাম। হাসাম খান্ জবাব দেয়।

—কাল সকালেই তাহলে জবাব পাবো আশা করছি।

ওদিকে চলে গেল ধূর্ত হাসাম খাঁ। মিত্রপাদ আর বালুকারাম বসে আছে। কি ভাবছে তারা। মিত্রপাদ বলে।

—রাত্রির তৃতীয় যাম, এসময় কারা জেগে থাকে বালুকারাম ?

পয়লা প্রহরমে সবকোই জাগে।

দুসরা প্রহরমে ভোগী।

তিসরা প্রহরমে তস্কর জাগে।

চৌঠা প্রহরমে যোগী।

আমরা ওই তৃতীয় প্রহরের জাগার মানুষ বালুকারাম! কিছু পাওয়াই আমাদের একমাত্র কথা। তুমি এতে অমত করো না। হয়তো গুর্জর রাজ্যই তোমার হাতে এসে যাবে।

বালুকারাম এ সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নয়। ওদের বাধা দিয়েই বা কি লাভ হবে তার? যা আছে তাই থাকবে। হয়তো যুদ্ধে প্রাণও যেতে পারে। সব শেষ হয়ে যাবে।

আর গোপনে সাহায্য করলে বেশী কিছু লাভই হতে পারে; তাই জবাব দেয়।

—আপনার আদেশই মানবো আচার্যদেব।

হাসেন মিত্রপাদ। শঠতার হাসি। খ্যানখ্যানে গলায় কি নিষ্ঠুরতার আভাস জাগে ব্যাঙের মত।

--মহাশক্তি তোমার কল্যাণ করুন।

রাতের অন্ধকারের পর সূর্য ওঠে।

পূর্ব আকাশ রাঙ্গা হয়ে গেছে, সেই আলোর আভা পড়েছে আরব সাগরের নীল জলরাশির বুকে।

হাসামখাঁ উঠে দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে।

দূরে দেখা যায় সোমনাথদেবের মন্দির চূড়া, ওর ধ্বজাদণ্ডে রক্তপতাকা সগৌরবে উড়ছে। প্রাকারে বাজে দুন্দুভি ভেরী।

সার্থবাহী পশারীর দল চলেছে সোমনাথপত্তনের হট্টিকার দিকে।

সবুজ ঝাউ আর নারিকেল বনে হাওয়া জাগে। শনশন হাওয়া। চুপ করে কি ভাবছে হাসামখাঁ।

এখানকার কায সেরে তাকে ফিরতে হবে আজমীরের দরগা হয়ে মরুস্থলী ভেদ করে পাঞ্জাবের মূলতানে।

সেইখানেই দেখা হবে সুলতান মাহমুদের সঙ্গে।

তার আগেই আয়োজন সেরে ফেলতে হবে; প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব সব এগোনো চাই।

হঠাৎ নীচের চত্বরে একজন মন্দির রক্ষীর সঙ্গে আলবেরুণীকে

দেখে অবাক হয় হাসামখাঁ। আলবেরুণীকে কদিন আগে সে দেখেছিল গিরিনগরের সরাইখানায়।

আজ এখানে দেখে একটু চমকে ওঠে।

পথ তাহলে একই আছে। পণ্ডিত হতে পারে লোকটা কিন্তু ভীরু না হয় অকর্মণ্য। তাই তাকে দিয়ে কায করানো সহজ।

অনেক পুঁথি পত্তর পড়লে বোধহয় আদমী অমনি দেহ মনে কমজোরী হয়ে ওঠে। হাসামখাঁ নেমে গিয়ে মিত্রপাদকে সামনে পেয়ে অলিন্দ থেকে ওই চত্বরের আলবেরুণীকে দেখিয়ে কি নির্দেশ দেয়।

ধূর্ত মিত্রপাদ ও হাসাম খাঁয়েব কথা বুঝতে পেরেছেন।

মাথা নাড়েন ঠিক আছে।

—হ্যাঁ, ও যেন আদৌ টের না পায় আপনার সঙ্গে আমার কোন যোগ আছে। ওকে কৌশলে এইখানে রাখুন। সোমনাথ পত্তনের সংবাদ ওর মারফৎও পেতে পারেন। ওকে হাতে রাখলে কায পাবেন।

মিত্রপাদ আলবেরুণীর নাম শুনেছেন।

ওই সাধারণদর্শন লোকটা যে পণ্ডিত আলবেরুণী এ খবর তার জানা ছিল না। তার নাম শুনেছেন মিত্রপাদ। হিন্দু শাস্ত্র দর্শন জ্যোতিষবিদ্যা রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শী তিনি।

আজ তাকে হাতে পেয়ে মিত্রপাদের মনে অন্য আশা জাগে।

তাই খুশীর আবেগটা চেপে রেখেই হাসাম খাঁয়ের কথায় সায় দেন মিত্রপাদ।

—তাই হবে। কতদিন পর আবার সাক্ষাৎ পাবো?

হাসামখাঁ তা নিজেই জানে না। তবু জবাব দেয়।

—সংবাদ পূর্বেই আসবে। তোমার কায তুমি করে যাও। সোমনাথপত্তনের সব সংবাদ যেন তৈরী থাকে। কোন কোন রাজা

সেনাপতি আসছেন। তাদের মন্ত্রণার ফলাফল এমন কি মন্দিরের নগরের সৈন্যসংখ্যা অবধি জানা দরকার।

হাসামখাঁ অর্থ দিয়ে কিনে নিতে চায় মিত্রপাদকে।

রাতের অন্ধকারে নয়, দিনের আলোতেই হাসামখাঁ বিদেশী সওদাগরের বেশে আশ্রম থেকে বের হয়ে ওই সার্থবাহীদের দলে মিশে গেল। তার অনুচর দুজনও চলেছে পুস্তিন গালিচা আর মেওয়ার পশরা নিয়ে।

চামুণ্ডা রায় গুর্জরের মহানায়কের পদ পেয়েছিল নেহাৎ ভাগ্য জোরেই। তরুণ বয়সে সে বীর যোদ্ধাই ছিল, দেশে শান্তি বিরাজমান। প্রতিপক্ষ যারা ছিল তারাও দুর্বল। তাই করারও কিছুই ছিল না।

চামুণ্ডা রায় কয়েকটি স্ত্রী নিয়ে সুখেই বাস করছিল।

তরবারি কোষবদ্ধ করে রেখেছে তা আর খোলার প্রয়োজন হয়নি। ঢালে মরচে পড়েছে। আহারের পর প্রভূত মোদক আর রাত্রে সোমরস তার দেহকে বেশ শাঁসে জলে ফুলিয়ে গোলগাল করে তুলেছে।

যা করার রাজা ভীমদেব নিজেই করেন। তরুন উৎসাহী যুবক। বয়স্ক কর্মচারীদের শ্রদ্ধাই করেন।

চামুণ্ডা রায়ের কন্যা গোপার এসব ভালো লাগে না।

শৈশব থেকেই সে অস্ত্রচালনা অশ্বারোহন শিখেছে। সরস্বতী নদীর পূর্ণ যোয়ারে সে সাঁতার দিয়ে এপার ওপার করে।

দস্যি ডানপিটে মেয়ে, বয়স হয়েছে তবুও সেই দস্যিপনা কমেনি। বালুকারাম সকালেই গেছে চামুণ্ডা রায়ের প্রাসাদে।

সুন্দর নারকেল বনসমাকীর্ণ বাগান, মাঝখানে সুরকিঢালা রঙ্গীন পথের দুপাশে সবুজ ঘাসের গালচেপাতা। বালুকারামকে

আসতে দেখে গোপা একবার ফিরে চাইল মাত্র, ওদিকের পিপুল গাছে কতকগুলো হরিয়াল পাখী বসেছিল, সে তীর ধনুক দিয়ে সেগুলোর দিকে নিশানা করছে।

ঘোড়ার খুরের শব্দে সচকিত হয়ে পাখীগুলো উড়ে যেতেই গোপা বিরক্তি ভরে চাইল। ওর ডাগর দুচোখে কি বিরক্তির আভাস।

—দিলে তো পাখীগুলো উড়িয়ে ?

হাসে বালুকারাম।

—চোখের তীরে তো আমাকেই বধ করেছো, আবার ওদের কেন ? তবু নীল আকাশে উড়ে যাক ওরা।

গোপা ওর দিকে চাইল না। পাখীগুলো ওপাশের আর একটা গাছে বসেছে, সেই দিকে চেয়ে বলে।

—তোমার কায নেই বুঝি ? আব গুর্জরের সেনানায়ক য'দ সামান্য একজন মেয়ের তীরে আহত হয় তাহলে গুর্জরের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

কথাটা শুনে জবাব দিল না বালুকারাম।

চামুণ্ডা রায় কাল রাত্রেই লোক পাঠিয়েছিল, আজ সকালেও আবার প্রতিহারী গেছে সংবাদ নিয়ে।

চামুণ্ডা রায় এবার সত্যিই চিন্তায় পড়েছে

সংবাদ সঠিক কিনা বলা যায় না। নানা গুজব ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে, সুলতান মাহমুদ গজনী থেকে অগণিত সৈন্য নিয়ে বের হয়েছে, এবার তার লক্ষ্যস্থল এই সোমনাথের মন্দির।

গুর্জর সৌরাষ্ট্র এবার তার আক্রমণ থেকে বাদ যাবে না। মুলতানের দিকে এসে পৌঁছেছে সেই দানব।

ইতিমধ্যেই তার চর অনুচরবৃন্দ মরুস্থলী আজমীর ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে এই সোমনাথ পত্তনের দিকেও।

তারা এখানেও পথ পরিষ্কার করছে।

চামুণ্ডারায়ের নেশা ছুটে গেছে। কালরাত্রে স্বয়ং ভীমদেবও তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সাবধান সজাগ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। কোন অপরিচিত ভিনদেশীকে সন্দেহ হলেই যেন প্রহরীরা ধরে আনে। তার সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়।

সোমনাথপত্তন প্রভাসপত্তনের নগরদ্বারে প্রহরাচৌকিতে ইতিমধ্যেই প্রহরা আরও জোরদার করা হয়েছে।

চামুণ্ডারায় কালরাত্রেই তাই বালুকারামকে স্মরণ করেছিলো কিন্তু তার কোন সংবাদই মেলেনি।

সকালে তাকে আসতে দেখে চামুণ্ডা রায় বেশ বিরক্তিভরা কণ্ঠেই বলে—চারিদিকে এখন গোলমাল, তোমাকে দরকারের সময়ও পাইনি। কালরাত্রে কোথায় ছিলে ?

বালুকারাম চমকে ওঠে। চামুণ্ডা রায় তাহলে কি জানে হাসামখানের সংবাদ!

তবু জবাব দেয় বালুকারাম।

—একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম। একজন ভিনদেশী সওদাগরকে সন্দেহ হওয়ায় তাঁর পিছনে গেছলাম!

—উত্তম! চামুণ্ডারায় ওর জবাবে খুশীই হয়েছে।

মনে মনে গজরায় বালুকারাম মহামুর্খ তুমি! প্রকাশ্যে চুপ করেই থাকে।

—প্রহরা কড়া করো। দেশের দুর্দিনে আরও সাবধান হতে হবে বালুকারাম। শুনছি সুলতান মামুদের চর সর্বত্র ঘুরছে। তিনিও সসৈন্যে আসছেন।

কথাটা শুনেছে গোপাও।

তার মনে একটা নীরব ঘৃণার সাড়া জাগে। ভয় তার করেনি।

বাবার কথার মধ্যে সেও ঘরে ঢুকেছিল কি কাযে, বালুকারাম বলে চলেছে।

—আমরাও প্রস্তুত মহানায়ক। আমাদের সৈন্য ভীরু নয়।

বালুকারামের কথায় চামুণ্ডারায় যেন নিশ্চিন্ত হয়। শুধু চামুণ্ডারায়ই নয়—বালুকারাম ভীমদেবের সামনেও এমনি নিখুঁত অভিনয় করতে পারবে।

এই অভিনয় করতে হবে তাকে গোপার কাছেও।

জীবনে তার অনেক আশা ; বালুকারাম একদিকে চায় গুর্জর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব, অন্যদিকে গোপাকেও।

তারা সুখী হবে।

জীবনে তার আশা অনেক।

বালুকারাম বের হয়ে এল, আপাততঃ তাব কাজ নেই। দুইদিক সামলে চলতে হবে তাকে। বাগানে দিনের গিনিগলা রোদ অভ্র রং হয়ে এসেছে।

গোপাকে দেখা যায় না, বালুকারামের নিজের ঘোড়াটাও নেই। হঠাৎ দেখে ঘোড়াটাকে দাবড়ে নিয়ে বাগানের ওদিকে ঘুরছে গোপা। শাডীখানা গাছ কোমর কবা, চেলিতে তার সুগঠিত দেহ সুঠাম ছন্দের একটি সুষমায় ভরে উঠেছে। সুগৌর ললাটে ফুটে উঠেছে রক্তিমাভা। বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমেছে একটা চূর্ণ কুন্তল তাতে জড়ানো।

ডাগর দুচোখে কি আনন্দের দীপ্তি। সদ্য আমা তেজী ঘোড়াটাকে বালুকারামই শায়েস্তা করতে পাবে না। গোপা তাকে সংযত করে দাবড়ে ফিরছে কদমে। ঘোড়াটাও মাঝে মাঝে সামনের দুপা তুলে ওকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর দুই পায়ের গুঁতোয় আবার সিধে হয়ে কেশর ফুলিয়ে চলেছে সে।

বালুকারাম ব্যস্ত হয়ে ওঠে—ভয়ানক বদমেজাজী ঘোড়া ওটা।

গোপা রাশ টেনে ঘোড়াটাকে থামিয়ে বলে।

—তাই ওকে একটু শায়েস্তা করে দিলাম।

হাঁপাচ্ছে ঘোড়াটা। বালুকারাম বলে

—ঘোড়ার মালিককে ?

—দরকার হলে তাকেও শায়েস্তা করতে পারি।

বালুকাবাম হাসতে থাকে। গোপা বলে চলে।

—বাবা কাল থেকে ভাবনায় পড়েছেন, সুলতান মাহমুদ নাকি এসে পড়ল, তার অনুচররাও নাকি এইখানে এসেছে তার আগেই। এত ভীতু পুরুষরা।

—তুমি কি করতে ?

গোপা সতেজে বলে।

—যদি কোনও দিন সে আসে, তাকে বাধা দোব। দস্যুকে চিরকালই ঘৃণা করি।

বালুকারাম ওর দিকে চেয়ে থাকে। তেজদৃপ্ত চেহারায় ফুটে উঠেছে অপরূপ একটি শ্রী। বালুকাবাম ওর এই রূপ কোনদিনই দেখেনি। ভীরু সে। নইলে কোনদিনই তাকে সোজা একটা কথা জানাতে পারেনি, বার বার বলতে গিয়ে বেধেছে।

—গোপা।

ছায়া ঢাকা নারিকেল বীথি। বাতাস দোলা জাগায় ওর পত্রাবরণে। সাড়া জাগে। গোপা বালুকারামের দিকে চাইল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। বলে ওঠে বালুকারাম।

—যদি সুযোগ আসে তুমি গুর্জরের মহারাণী হতে পারো একদিন।

হাসিতে ফেটে পড়ে গোপা।

—বয়স্ক ভীমদেবের তো শুনেছি অনেকগুলো রাণীই আছেন। আবার তার সখ হয়েছে নাকি ?

বালুকারাম থমকে দাঁড়াল। আসল কথাটা কি ভাবে বলতে হয় তা তার জানা নেই। সব কেমন ঘুলিয়ে যায়।

গোপা বলে চলেছে।

—মহারাজের হয়ে ঘটকালী করছ আজকাল?

বালুকারাম জানাতে পারে না আসল কথাটা। বলে চলেছে তবু।

—না, না। এমনিই বলছিলাম।

—তবু ভালো। দেখ এ সময় শত্রু এগিয়ে আসছে, বিয়েটিয়ে উনি আর যেন না করেন। বরং ঠাণ্ডা মাথায় রাজকার্য্য দেখুন, দেশের মঙ্গল হবে। তোমরাও তাই করগে!

গোপা চলে গেল বিরক্তি ভরে ওর দিকে ঘোড়ার লাগামটা ছুঁড়ে দিয়ে। বালুকারামের মুখে কে যেন একপোঁচ কালি মাখিয়েছে।

—গোপা!

গোপা জবাব দেয়—আমার এখন কাজ আছে।

বালুকারাম বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের দোষেই সব সুযোগ নষ্ট করে দিল সে।

বালুকারাম তবু আশা ছাড়ে না। সে জানে তাকে আরও উপরে উঠতে হবে। গুর্জর রাজসিংহাসন তাকে পেতেই হবে, সেদিন একবার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবে এই যৌবনদর্পী কন্যা।

আর তার মনে কোন দ্বিধা সংশয় নেই, সে তার পথ বেছে নিয়েছে।

বন্যাপ্রবাহের মত এগিয়ে আসছে সেই দুর্বার সৈন্যদল।

হিমালয়ের গিরিখাত পরিপূর্ণ করে বন্যার ধারায় তারা আসছে। কয়েকদিন ধরে চলেছে তাদের যাত্রা। তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী।

খোরাসানী তুর্কিমেন—গজনীর সৈন্যদল একযোগে নামছে। সুলতান মাহমুদ আসছে হিন্দুস্থানের দিকে।

পথের দুপাশের গ্রাম বসত থেকে অনেকেই যোগ দিয়েছে তার দলে।

কয়েকদিন পদযাত্রার পর তারা খাইবার গিরিপথ পার হয়ে হিমালয়ের উপত্যকায় এসে হাজির হল। মৃত্তিকা এখানে সবুজ। ঘোড়াগুলো কদিন পর বিশ্রাম পাবে।

তাবুর সারি পড়েছে। সমস্ত উপত্যকা ভরে গেছে তাবুতে। তারই মাঝে একটি সুন্দর পট্টাবাস গড়ে উঠেছে। কঠিন মাটিতে পড়েছে বোখারার মূল্যবান কার্পেট; পট্টাবাসের চারিদিকে রঙ্গীন ঝালর, মূল্যবান কার্পেট মোড়া আসনে মাহমুদ বসে আছেন। চারিদিকে মুক্ত খঞ্জর হাতে প্রহরীর দল।

খোদার বান্দা সুলতান মাহমুদ গজনীর সৈন্যদের কাছে দেবতা, চারিদিকে সন্ত্রস্ত ভাব।

হাসামখাঁও ফিরেছে, লাহোরে এসে ক'দিন সময় নিতে হয়েছে, দেরী হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে খবর এসেছে সুলতান মাহমুদ হিন্দুকুশ পার হয়ে ভারতের সীমান্তে ঢুকবেন এইবার।

তার আগেই এটা করাতেই হবে।

লাহোর সহরে আনারকলি অঞ্চলে বিখ্যাত খান্‌কা। অনেকখানি এলাকা জুড়ে তার মসজিদ, মুয়েজ্জিনদের থাকার জায়গা মুসাফিরদের আস্তানা।

সেই খান্‌কাতেই থাকেন প্রসিদ্ধ আরবের পণ্ডিত আলি বিন্ উস্‌মান অলহজবিশি। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ফকীরকে মূলতানের চৌহান রাজা অজয়পাল অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তাঁর আশীর্বাদেই

অজয়পালের সন্তান জন্মেছে। জাগ্রত মহাপুরুষের নির্দেশ তিনি মেনে চলেন।

সুলতান প্রথম থেকেই যুদ্ধ করতে চাননি। ভারতের প্রথম প্রভাবশালী রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলে তার সব কল্পনাই শূন্যে মিলিয়ে যাবে। তাই চেয়েছিল কৌশলে তাকে হাত করতে। হাতে এলে তারপর দেখা যাবে।

হাসামখাঁয়ের উপর তাই ভার ছিল এই ফকীরের সঙ্গে দেখা করে অজয় পালকে যদি নিরস্ত করাতে পারে তাঁর নির্দেশে।

ফকীর সাহেব প্রথমে রাজী হন নি। শেষকালে রাজী হয়েছিলেন এক সর্তে; সুলতান খোদার বান্দা; সে যেন মূলতানবাসীদের কোন অনিষ্ট না করে।

হাসামখাঁ কাজ উদ্ধার করে সেই রাত্রে লাহোর থেকে রওনা হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসেছে।

সুলতান ওকে দেখে চাইলেন। হাসামখাঁ কাজের লোক। সব কাজই গুছিয়ে এনেছে। লাহোরে আজমীরে যাকে দিয়ে যেভাবে হোক কিছু কায করানো যায় করিয়ে এসেছে। হাসামখাঁ বলে।

—তবে লাহোরের ফকীর সাহেবের হুকুম ওই মূলতান-বাসীদের উপর কোন অত্যাচার করা চলবে না।

হাসতে থাকে সুলতান। কঠিন সেই হাসির শব্দ যেন সারা তাঁবুতে ছড়িয়ে পড়ে।

ওই হাসির অর্থ ওর অনুচরবৃন্দ জানে। হাসির রেশ থামলে বলে সুলতান মাহমুদ।

—আলি বিন্ উস্মান আলহাজ মেহেরবান, খোদার বান্দা সুলতানের উপর তার বহুৎ মেহেরবানী। তুমি ও তাঁকে জানিয়ে

দিলে না কেন হাসাম খাঁ—খুদার নির্দেশেই আমি এই জেহাদে বে
হয়েছি। তাহলে পয়লা কায সাফ?

মাথা নোয়ালো হাসাম খাঁ।

—তারপর?

হাসাম খাঁ বলে চলেছে—পথ দুর্গম। মূলতানের পর লৌহকোট
সপাদলগ্ন মরুস্থলী তারপর দুর্গম মরুভূমি; পানি নেই সবুজঘাস নেই
দানা মিলবেনা, সেই মরুভূমি আর বালুর পর্বতের প্রবেশ মুখেই
মরুস্থলীর থানাদার ঘোঘাবাবা। বহুৎ জবরদস্ত রাজপুত। তার
সীমানা পার হয়ে আজমীর।

পথ দূর দুর্গম। তবু সুলতান মাহমুদকে পার হতে হবে।
বিচিত্র দেশ। কোথা থেকে কি বাধা আসবে জানেনা সে। তবু
সুলতান মাহমুদ কে যেতে হবে।

হাসামখাঁ বলে চলেছে।

—তাজ্জব দেশ জনাব। সোনা আর রূপোর ছড়াছড়ি
মাঠে মাঠে ফসল, আর লোকজনও শান্তিতে আছে।

—শান্তিতে আছে? সোনা রূপা—আসরফি—জহরৎ মণিমুক্তা
আছে? হাসতে থাকে লোভী একটা দানব। দুটো চোখে ওর
ফুটে ওঠে কি বীভৎস লোভের ছায়া। সবকিছু সে ছিনিয়ে নেবে
দু হাতে। এই সমৃদ্ধ জনপদ এর শান্তিপূর্ণ গ্রামের সাধারণ মানুষের
মর্মে সে আঘাত হানবে।

সবকিছু সম্পদ সে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

এই লুণ্ঠন থেকে কারো অব্যাহতি থাকবে না।

রাতের অন্ধকারেই পট্টাবাসগুলো তোলা হয়ে যায়। বিরাট
খচ্চর বাহিনীর পিঠে বোঝাই হল খুঁটি তাঁবু গালচে নানা কিছু।

পাহাড়ের সীমান্তে বিরাট তাঁবু নগরী কোন যাদুমন্ত্র বলে উধাও
হয়েছে। সাজ সাজ রব পড়ে যায়।

সুলতানের পথ পরিষ্কার। কোন বাধা নেই। তাই দেরী না করেই সুলতান এখুনি এগিয়ে যেতে চায়। হঠাৎ কাদের কথার শব্দে ফিরে চাইল সুলতান।

কে যেন কাঁদছে। একটি নারী।

মশালের আলোর লাল আভা পড়েছে ওর সুন্দর মুখে।

সুলতান মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। তার দুজন সেনানায়কই বলে।

—ওরা পাশের গাঁও বসতিতে তুম্বার সন্ধানে গিয়েছিল।

সুলতান প্রশ্ন করে।

—তারপর এই শিকার করে এসেছ?

মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে ওকে দেখছে। হঠাৎ মেয়েটির কান্নাভেজা দুটো চোখ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে মেয়েটি।

—তুমি সুলতান?

হাসতে থাকে মাহমুদ।

—ঠিক ধরেছো?

মেয়েটি ঘৃণা ভরা কণ্ঠে বলে।

—তুমিই এদের মধ্যে সবথেকে জানোয়ার, আওরতের ইজ্জত জানো না, তাই ভাবলাম তুমি এদের মধ্যে সেরা শয়তান সুলতান মাহমুদ।

চমকে ওঠে সুলতান। নিমেষের জন্যে তার মুখের পেশীগুলো কঠিন হয়ে ওঠে। তার অভ্যাসবশেই হাতটা গিয়ে পড়ল তরবারির মুঠিতে। তবু সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে।

—কি নাম তোমার?

—মিনা বাঈ। আমাকে মুক্তি দিন সুলতান।

সুলতানের চোখে ফুটে ওঠে কাঠিন্য, ক্ষণিকের জন্য জলে ওঠে সেই ডাগর নীলাভ দুটো চোখ। সুলতান বলে।

—ওটা পরে ভাবা যাবে সুন্দরী। এখন তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। হিন্দুস্থানের লুটের পহেলা চিজ তুমি, বউনি ছেড়ে দিতে নেই। ব্যবসা খারাপ হয়ে যায়। আগে কায শেষ হোক তারপর তোমায় ছেড়ে দোব।

—সুলতান! আমার দেশ আমার ঘর--

মেয়েটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সুলতান হাসতে থাকে নির্মম সেই হাসি। তেজদৃপ্ত মেয়েটি আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

কিন্তু নিষ্ঠুর দানবের মনে সে কান্না কোন রেখাপাতই করে না।

—তাঞ্জামে ওঠো মিনাবাঈ, এখন ওইসব কান্না দেখার সময় আমার নেই।

তূরী ধ্বনি শোনা যায়। রাতের অন্ধকারে দু একটা তারা জ্বলছে, কালো পর্বতশ্রেণী মাথা তুলেছে আকাশকোলে। অশ্বখুরের শব্দ ওঠে। লুণ্ঠনকারীর দল কলরব করে চলেছে, ওই কলরবে একটি অসহায় নারীর কান্নার সুর কোন অতলে হারিয়ে গেছে।

মূলতান তখনকার দিনে সুন্দর নগরী।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসা কেন্দ্রই বলা যায়। খাইবার গিরিপথ পার হয়ে কাবুল, কান্দাহার তাসখন্দ সমরখন্দ মধ্য এসিয়ার বাণিজ্যের যোগাযোগ ঘটে এইখানে। ভারতের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য তারা নিয়ে যায়। তাই মূলতান তখন সমৃদ্ধশালী নগর। বিদ্যার পীঠস্থান।

হিন্দু ধর্ম দর্শনের আলোচনা পঠনপাঠন চলে এইখানে। আলবেরুণীকেও এই মূলতানই আশ্রয় দিয়েছিল। মূলতানের সূর্যমন্দিরের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশাল চত্বরঘেরা মন্দির। দেশ বিদেশ থেকে পুণ্যার্থীরা আসে সূর্যদেবকে দর্শন করতে। মূলতান তাই জাগ্রত তীর্থ।

মূলতানের রাজা অজয়পাল খুবই বিপদে পড়েছেন।

সংবাদ এসেছে সুলতান মাহমুদ অগণিত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে। তার লক্ষ্যস্থল এবার আরব সাগর তীরে সোমনাথ মন্দির।

জানেন অজয়পাল সুলতানের নিষ্ঠুরতার কথা।

সৈন্যদল অমাত্যবর্গও তৈরী হয়ে উঠেছে, সর্বশক্তি একত্রিত করে তারা বাধা দেবে।

সহজে তারা মূলতানে সেই লোভী দানবকে প্রবেশ করতে দেবে না। কিন্তু অজয়পাল লাহোরের ফকীর সাহেবের নির্দেশ শুনে চিন্তায় পড়েছে। সুলতানকে প্রবেশ করতে দিতে হবে মূলতানে, এবং সুলতান মূলতান নগরীর কোন ও ক্ষতি করবে না।

লাহোরের ফকীর সাহেব জাগ্রত পীর।

ঈশ্বর বিশ্বাসী একজন সাধু পুরুষ। তাঁর দয়াতেই অজয়পালের এই সমৃদ্ধি। সহরের গণ্যমান্য অনেক লোকই তাঁর ভক্ত অনুরাগী।

মন্ত্রণাসভায় সকলেই ভাবনায় পড়ে।

সূর্যমন্দিরের প্রধান আচার্য সোমদেব বলেন।

—সুলতানের কাছ থেকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি আমরা পাইনি। তাছাড়া একবার প্রবেশ করে পরে যদি সুযোগ বুঝে অত্যাচার সুরু করে, তখন আমাদের উপায় থাকবে না।

কিন্তু সে মতামত নিয়ে যুদ্ধ করার সময় ও নেই।

চিন্তিত নগরী, সেই দিন অপরাহ্নেই সহরের বুরুজ থেকে দেখা যায় প্রান্তরে উঠছে অশ্বখুরের ধুলিজাল, সূর্যাস্তের

আলোয় রঞ্জিত আকাশে সেই ধূলিজাল রক্তিম আভাস এসেছে।

বিনাবাধায় এগিয়ে আসছে সুলতান।

ফকীর সাহেবের অশেষ দয়া, প্রথমেই প্রভাবশালী রাজা অজয় পালকে সুলতান মাহমুদ তারই দয়ায় বন্ধুরূপে পেয়েছে।

অজয় পাল প্রস্তুত হবার আগেই সহরের বাইরে এসে ছাউনি ফেলেছে সুলতান মাহমুদ। সৈন্যরাও বিস্মিত হয়। কোন লুটপাট যুদ্ধ করার আদেশ নেই। শুধু তাইই নয়।

সহরের জীবনযাত্রাও স্বাভাবিক ভাবেই চলেছে, বণিকের দলও বেসাতি মেলেছে বাজারে, মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি ওঠে।

সুলতান মাহমুদ তুজন অনুচর নিয়ে এসেছেন অজয় পালের দরবারে। সকলেই বিস্মিত হয় ওর কথায়।

—আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র আমরা, আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিদ্বেষ নেই। মূলতান আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র।

অজয়পালও ভেবে দেখেছেন। ওরা অতর্কিত এসে পড়েছে। সুলতানের পদাতিক অশ্বারোহী সৈন্যও প্রস্তুত। এক্ষেত্রে যুদ্ধ না করে যদি ওর মিত্রতা স্বীকার করে নিয়ে মূলতানকে বাঁচানো যায় সেইটাই হবে বুদ্ধিমানের কায। তাই অজয় পালও সুলতানকে স্বাগত জানান।

—আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি। মূলতান আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

—মূলতানের এই সহৃদয় আতিথ্য আমি মাথা পেতে স্বীকার করলাম।

সুলতান মাহমুদ এবার পায়ের নীচে মাটি পেয়েছে।

ছাউনিতে ফেরবার পথে সহরের এদিক ওদিক বিপণিশ্রেণী দেখতে থাকে। বিশাল নগর। তেমনি সম্পদ এখানে ছড়ানো।

সহরের মাঝে বিরাট উদ্যান মুক্ত প্রান্তর। ওর সেনাদল এইসব জায়গাতেই ছাউনি ফেলেছে।

সারা মূলতান সহরের মধ্যে সৈন্যদলকে তুলে এনেছে মাহমুদ, ধীরে ধীরে এর সব অন্ধিসন্ধিতে রেখেছে সৈন্যদল।

প্রয়োজন হলেও মূলতান সহর যেন মাথা তুলতে না পারে।

দুচোখ মেলে লোভী শয়তান সহরের প্রাচুর্য-ধনসম্পদ দেখছে, দূর থেকে সূর্য মন্দিরের দিকে নজর পড়ে। দিনের আলোয় ঝকমক্ করছে তার স্বর্ণকলসচূড়া।

মন্দিরের চারিদিকে তোরণ দ্বার। একটা দুর্গের মতই সেটা সুরক্ষিত.

কত ধন সম্পদ ওখানে সঞ্চিত আছে কে জানে।

নগরের শেঠজীদের প্রাসাদ গুলো ও দেখবার মত, যে কোনটা গজনীর প্রাসাদের চেয়ে বড়। সারা সহরে ধন দৌলত ছড়ানো। সুলতান মাহমুদ সুযোগ খুঁজতে থাকে।

রাজা অজয় পালকে সেদিন ছাউনিতে সমাদর করে এনে সুলতান কথাটা বলে। অজয় পাল ওকে সহরের কোন অনিষ্ট করতে না দেখে খানিকটা বিশ্বাস করছে।

হিন্দুর সহজবিশ্বাসী উদার মন বলে সুলতান বন্ধুত্বই চান। সুলতান ও অনুরোধ জানায়।

—আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। ওই লোহকোট আর মরুস্থলীর সামন্তরাজা ঘোঘাবাবা আপনার নিকট আত্মীয়। আপনি আমার বন্ধু, তাই আপনি ওদের অনুরোধ করলে, আমাকে আজমীরের দিকে এগিয়ে যেতে পথ দেবেন তারা।

অজয় পাল সুলতানকে এখান থেকে সরাতে পারলে নিশ্চিন্ত হ'ন। ও যদি পথ পেয়ে সৈন্য সামন্ত নিয়ে চলে যায়—মূলতান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে।

এই ভেবেই অজয়পাল বলেন।

—আমি চেষ্টা করে দেখবো।

সুলতান প্রগাঢ় বন্ধুত্বের স্বরে বলে।

—আমি জানি আপনি নিজে গেলে তাঁরা অমত করবে না। যদি যান অশেষ উপকৃত হবো।

অজয় পাল তাঁর অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে। তাঁরাও ভাবেন একথা সত্য। যদি কোনরকমে এই সুলতানকে এখান থেকে বিদায় করতে পারা যায় মঙ্গলেরই কথা।

তাই অজয় পাল নিজেই রওনা হলো লোহকোট মরুস্থলীর দিকে। ধূর্ত সুলতান ইতিমধ্যেই সব সংবাদ নিয়েছে।

লোহকোট ক্ষুদ্ররাজ্য, সামান্য তার পরাক্রম। আর মরুস্থলীর সামন্ত দুর্গই একটা সমস্যার কথা। চারিদিকে তার দুর্গম পর্বত আর মরুভূমি। সেই গিরিপথের মাঝে মরুস্থলী একটি অজেয় দুর্গ।

তাকে কায়দা না করতে পারলে মরুস্থলীতে প্রবেশ করা যাবে না; আজমীরের পথের সিংহদরজা ওই দুর্গম দুর্গটিই।

তবু তাকে জয় করতেই হবে।

সুলতান মাহমুদ অজয় পালকে রাজধানী থেকে সরিয়ে দিয়েই সহরের প্রধানদের তলব করেন।

তারা সমবেত হয়েছে ভীত ত্রস্ত মন নিয়ে। এতদিন কোন প্রস্তুতিই তাদের ছিল না। অতর্কিতে এই দানব এসে পড়েছিল সহরে।

আজ সেই দানব বন্ধুত্বের মুখোস খুলে ফেলে নির্লজ্জ ভাবে বলে।

—আমাকে দুকোটি স্বর্ণমুদ্রা নজরাণা দিতে হবে, না দিতে পারেন মূলতান আমি ধ্বংস করে যাবো।

চমকে ওঠে তারা এমন কথা শুনবে আশা করেনি।

সূর্যমন্দিরের সোমদেব আচার্য বলেন—বন্ধুত্বের এই পরিচয়?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সুলতান, ওর পৈশাচিক সেই হাসির শব্দ সারা প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ে।

ওদিকে সহরের বিপনি শ্রেণীতে লুট তরাজ সুরু হয়ে গেছে। কলরব আর্তনাদ কানে আসে। দুচারজন বাধা দেবার চেষ্টা করতেই সুলতানের সৈন্যদের হাতে তারা প্রাণ দেয়।

ভীত ত্রস্ত নগরী।

সূর্যমন্দিরে হানা দিয়েছে দস্যুদল রক্ত কৃপাণ হাতে তারা এগিয়ে চলেছে মন্দিরের কোষাগারের দিকে। এতদিনের সঞ্চিত স্বর্ণ—স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যতাল সব লুণ্ঠন করছে তারা।

ভেঙ্গে পড়ে মন্দিরের স্বর্ণ চূড়া—স্বর্ণ কলস। পূজারীরা নিহত। মন্দিরের শ্বেত প্রস্তর নির্মিত চত্বরে—প্রাঙ্গনে রক্তের অক্ষরে লেখা হয়েছে সুলতান মামুদের দস্যুদলের নিষ্ঠুর পাশবিকতার কাহিনী।

সব কিছুকে মুছে দেবার জন্য তারা মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে।

জ্বলছে সেই মন্দির—জ্বলছে সারা মূলতান নগর। রাতের অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পৈশাচিক আলোয়। সেই আলোয় হিংস্র ছায়ামূর্তিগুলো নগরের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে চলেছে, হত্যা করে চলেছে অসহায় নরনারীকে।

আকাশে বাতাসে শুধু অগ্নিশিখা আর কান্নার রোল ওঠে।

প্রাসাদ চূড়ে বসে দানব সুলতান মাহমুদ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

রাশি রাশি স্বর্ণ—স্বর্ণমুদ্রা—হীরা মাণিক্য তার সামনে। ওরা লুণ্ঠন আর হত্যা করে চলেছে।

—কুত্তা!

—কৌন? কার কথায় গর্জে ওঠে সুলতান। ফিরে চাইল। প্রাসাদের একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই মীনাবাঈ। দুচোখে তার ঘৃণা আর জ্বালা। সহরের ওই অগ্নিকাণ্ডের আলোক আভা পড়েছে তার সুন্দর মুখে।

সুলতান ওকে দেখে হাসছে। বলে চলেছে।

—তুমি খুব পয়মন্ত সুন্দরী;···পহলা লুঠ আমার তুমি, সেরা দৌলত। এ সবতো ঝুট মিনাবাঈ।

সুলতান ওর দিকে এগিয়ে আসে। ঘৃণায় পিছিয়ে যায় মিনাবাই।

—খবরদার সুলতান!

—আউরতের এ তেজ যেন বিজলীর ঝলক! সুলতান এর তারিফ করতে পারে মীনাবাঈ। শুধু সে লুটেরাই নয়—তারও একটা অন্তর আছে, সে ভালবাসা ও চায়!

—জানোয়াব তুমি!

তবু হাসতে থাকে সুলতান মাহমুদ।

মূলতান সহর পুড়ে ছাই হতে আর কত দেরী? সামনে এইবার এগোবে সে।

লোহ কোট মরুস্থলীতে ও মূলতান ধ্বংসের সংবাদ পৌঁছে গেছে। চারিদিকে নেমেছে ত্রাসের রাজত্ব। বাতাসে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই নিষ্ঠুরতার সংবাদ। বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ।

মথুরা—কনৌজ—অর্বুদ পর্বতে পরমার রাজ্যে—ভোজরাজার কাছেও এই বীভৎস নৃশংসতার সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে।

মুলতানের পবিত্র সূর্যমন্দির পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে, সব সম্পদ তার লুণ্ঠিত হয়েছে। ভারতের শান্তিকামী মানুষ ভয়ে শিউরে উঠেছে।

ভোজরাজার সেনানায়ক দেবশর্মাও এই সংবাদ শোনে।

তরুণ কৌশলী সেনানায়কের তন্ত্রীতে উষ্ণ রক্ত স্রোত প্রবাহিত হয়। নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতক লোভী সেই দানব বিনাবাধায় লৌহকোট সীমান্ত পার হয়ে এগিয়ে আসছে মরুস্থলীর দিকে।

শান্ত সৌম্য পরিবেশ। রাজাভোজের রাজধানীতে সেই ধ্বংস আর লুণ্ঠনের ছায়া কোথাও পড়েনি! এর রাজপথে চলেছে বিলাসিনীর দল।

সার্থবাহকের দল তাদের মালপত্র নিয়ে চলেছে দক্ষিণ কিংবা পূর্বভারতের মগধ গৌড়ের দিকে। গৌড় থেকে তারা আনে রেশমী বস্ত্র রঞ্জনের জন্য লাক্ষা - শঙ্খের তৈরী সৌখিন জিনিষপত্র, হাতির দাঁতের উপর সোণার কাজ করা দামী অলঙ্কার।

রাজপথের পর কোন যাদুকর তার যাদুর খেলা নিয়ে বসেছে। বিলাসিনী নারীদের আনাগোনা চলেছে হট্টিকার পথে। তাদের চতুর্দ্দোলার সোনার জরিদার পরদা খুন্টিদার আবরণ আর সাচ্চাজরির কাজ করা ঘুন্টিগুলো দুলছে, ক্ষণিকের জন্য হাওয়ায় সরে যাওয়া চতুর্দ্দোলার আবরণের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় কোন রূপবতী কন্যার দুটো নেশা ধরানো কালো চোখের তির্যক চাহনি দেবশর্মা চলেছে রাজসভার দিকে।

পথে সহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলেছে, সেনানায়ককে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পথিকের দল সরে যায়, হঠাৎ কোন চতুর্দ্দোলার দিকে চেয়ে চকিতের জন্য থমকে ওঠে দেবশর্মা।

মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। এমনি একটি নটী তাকেও ভালবেসেছিল, শুভাকে সে ভুলতে পারেনি। কোন কামনার

জ্বালা সেই ভালবাসায় ছিল না। নিঃশেষে সেই নটী শুভা তাকে মন দিয়েছিল।

কিন্তু দেবশর্মা যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত, কারোও অন্তর দেওয়া নেওয়ার মর্ম সে বোঝেন কোনদিন।

কর্মব্যস্ততার মধ্যে তবু মনে জাগে একটা অসীম শূন্যতা। তার জন্য কোথাও এতটুকু শান্তির স্পর্শ নেই।

মন থেকে সব ঝেড়ে মুছে ফেলে দেবশর্মা। মুলতানের সংবাদ তাকে চঞ্চল করে তুলেছে। রাজা অজয়পাল পলায়িত।

শত্রু এগিয়ে আসছে। তাকে জানিয়ে দিতে চায় দেবশর্মা ভারতে প্রতিবাদ করার, প্রতিরোধ করার লোকের অভাব নেই।

রাজসভায় প্রবেশ করে থমকে দাঁড়াল দেবশর্মা।

কোথাও কোন চাঞ্চল্য নেই। শ্বেতপাথরের তৈরী মেজেতে দামী আস্তরণ পাতা, ঝরোখায় ঝুলছে মসলিনের পর্দা; ঝাড়ের কাঁচগুলোয় বাতাসে টুং টাং শব্দ ওঠে।

সেই সুরের সঙ্গে সুর মিশিয়ে রাজভোজের সভায় কাব্য পাঠ চলেছে।

কুমারসম্ভবের যোগনিমগ্ন মহাদেবের তপোবনে এসেছে অকালবসন্ত। লতাবধূগণ আপন যৌবনের লাবণ্য-প্রাচুর্যে যেন তরুরাশির বিনম্র শাখাভুজের বন্ধনলাভ করেছে, প্রচুর পুষ্পস্তবকে ফুটে ওঠে তাদের স্তনভার; কিশলয়ের মাঝে তাদের মনোহর সুঠাম অঙ্গের সজীব লাবণ্য, এই সৌন্দর্যের প্রাচুর্যেই তারা প্রিয়তমের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করে সৌভাগ্যবতী হয়ে উঠেছে।

—পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ

স্ফুরৎ প্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।

লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপু—

বিনম্রশাখা—ভুজবন্ধনানি ॥

—মহারাজের জয় হোক!

ভোজরাজা দেবশর্মাকে ঢুকতে দেখে ইসারায় তার অভিবাদন গ্রহণ করে আসন নির্দেশ করে আবার কাব্যে মন দেন।

দেবশর্মা আশ্চর্য হয়। সারাদেশের এই সবনাশের সংবাদ ভোজদেবের কাছে বোধ হয় পেঁাছে নি। পৌঁছলে তিনি এমন নিশ্চিতে কাব্যরস গ্রহণ করতে পারতেন না।

বলে দেবশর্মা।

—সুলতান ধ্বংসের সংবাদ শুনেছেন মহারাজ? নিষ্ঠুর সেই সুলতান মাহমুদ এগিয়ে আসছে মরুস্থলীর দিকে।

ভোজদেব বলেন।

—সে অনেক দূর দেবশর্মা, তোমার চিন্তিত হবার কিছুই নেই। তার চেয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাখো, শুনছি দাক্ষিণাত্যের সামন্ত রাজারা নাকি কলিঙ্গ, গৌড় আক্রমণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে। ভোজরাজ তাদের এই রাজ্যবিস্তারে বাধা দেবে। প্রয়োজন হলে কালঙ্গ গৌড় আমরাই অধিকার করবো।

দেবশর্মা বিস্মিত হয়।

—আর বিদেশী এসে ভারতবর্ষের বুকে লুণ্ঠন পর্ব চালাবে?

ভোজরাজ উত্তর দেন।

—তারা রাজ্যবিস্তার করতে আসেনি লুটপাট করবে, বাধা পেলেই ফিরে যাবে। তাদের বাধা দেবেন আজমীরের রাজা ধর্মগজদেব। তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই দেবশর্মা। পাঠ চলুক। মেঘদূতের কিছু পাঠ করুণ কবি।

বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবণিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ

সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।

মানুষের জগত থেকে ওরা আকাশের মেঘ আর অলকাপুরীর প্রাসাদের উপমার রাজ্যে হারিয়ে যায়।

দেবশর্মা চিন্তান্বিতভাবে সকলের অলক্ষ্যে সভা থেকে বের হয়ে এল। তার কাছে এসব বিলাস ভাল লাগে না।

মনে হয় সে একেবারেই নীরস তাই বোধ হয় অন্তরে তার কোন স্মৃতিসঞ্চয় নেই।

শুভাও তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

কাঙ্গাল মন তাকে কেন্দ্র করেই মাঝে মাঝে কি বিচিত্র স্বপ্নজাল রচনা করে।

কিন্তু সে সব আজ হারিয়ে গেছে।

জানে না, শুভা কোথায় চলে গেল কি বুকভরা বেদনা নিয়ে। তার জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে দেবশর্মাই।

ভোজরাজার অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র, তার স্বাধীন কোন ইচ্ছা নেই। নইলে ভারতের এই বিপদেও তার করার কোন পথ সে পায় নি। কালো মেঘটা, তার বিস্তৃত ছায়া আকাশের আলোটুকুকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। বোধ হয় ঝড় উঠবে।

দেবশর্মা ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল তার প্রাসাদের দিকে।

মরুস্থলী সত্যই ভীষণ একটি স্থান।

কোথাও জলের আশ্রয় নেই, সবুজের স্পর্শমাত্র নেই। সাদা গেরুয়া বালি আর তামাটে কালো ধূসর বর্ণের তরুলতাহীন পাহাড়গুলো মাথা তুলে রয়েছে। দিনের রোদ সেখানে সহস্র ধারায় লেলিহান নৃত্য সুরু করে। দুচোখ ঝলসে যায়—সারা শরীরে লাগে উষ্ণ স্পর্শ।

জল!

জল এখানে স্বর্ণের চেয়েও মূল্যবান।

ওই পর্বতের একটা দিক সোজা আকাশে উঠে গেছে, নীচে দিয়ে গিরিপথ; ওই শিখর চূড়ায় লাল আর কালো পাথরের তৈরী দুর্গটা দেখা যায়; সমস্ত গিরিপথ মরুভূমির কর্তৃত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

ওই দুর্গের অধিপতি ষাট বৎসরের বৃদ্ধ ঘোঘাবাবা রাজপুতদের মধ্যে সম্মানী ব্যক্তি। প্রবীণ যোদ্ধা। দুর্গে বাছাই করা কয়েকশো রাজপুত সৈন্য। যুদ্ধে তারা সকলেই পারদর্শী।

সংবাদ এসেছে গজনীর সুলতান মূলতান লোহকোট ধ্বংস করে এগিয়ে আসছে এই পথে, তার গতিপথ ধর্মগজদেবের রাজধানী আজমীর। সেখানে নাকি জাগ্রত পীর মৈনুদ্দিনচিস্তীর সমাধিতে সির্ণি চড়াতে যাবে। তীর্থ যাত্রায় এসেছেন মাত্র সুলতান মামুদ।

ঘোঘাবাবা গর্জে ওঠে।

—তীর্থ যাত্রায় এসেছেন! শয়তানের আবার দেবতা আছে নাকি? দেবতাও তাকে ঘৃণা করেন।

দূত এসেছে মাহমুদের কাছ থেকে। নিয়ে এসেছে বিনয়ের বয়ানে লেখা একটা অনুবোধ পত্র, ঘোঘাবাবার সঙ্গে তার কোন শত্রুতা নেই। তিনি যেন মরুস্থলীতে ঢোকবার পথ দেন।

ঘোঘাবাবার যোগ্য সন্তান সংগ্রাম সিংহই জবাব দেয়।

—পথ আমরা দোব না। পথ তাঁকে করে নিতে হবে।

—আপনার বন্ধুত্ব চান সুলতান!

হাসে ঘোঘাবাবা।

—বন্ধুত্ব! সুলতান মামুদের বন্ধুত্বে আমার প্রয়োজন নেই।

দূত চুপ করেই ফিরে গেল।

চারিদিকে লেলিহান রোদের শিখা, মৃত্তিকার বুক থেকে শত-সূর্যের উত্তাপ উঠছে। মরুভূমির রুক্ষতার মাঝে ঠেলে উঠেছে আকাশছোঁয়া বাধাপ্রাচীর। এই পাহাড়ের এদিক ওদিক থেকে

একটা পথ এঁকে বেঁকে ওই দুর্গের নীচ হয়ে, ওদিকের অন্তহীন মরুভূমির দিকে চলে যায়। দু একটা বাবলা মুজ গাছ বালির উপর দাঁড়িয়ে ধুঁকছে।

খাড়া পাহাড়ের উপর ওই অজেয় দুর্গের চৌহদ্দী। ওর আশপাশে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখছে দূতরূপী হাসাম খাঁ।

পিছনে কোন রাজপুত প্রহরীর তাড়ায় ফিরে চাইল।

—একটু তাড়াতাড়ি বিদেয় হও খাঁসাহেব। দূত হয়ে এসেছো আবার গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছো কেন?

হাসাম খাঁ ঘোড়ার লাগামটা আলগা দিয়ে যেন অবজ্ঞাভরে এগিয়ে গেল লোহকোটের দিকে। বেশ একটু অসুবিধায় পড়েছে তারা এবার।

তবু দুর্গের আকার প্রকার দেখে অনুমান করতে পারে হয়তো হাজার দুয়েক সৈন্য থাকতে পারে। তবে জানে না আরও সৈন্য বাইরে থেকে এসে উপস্থিত হবে কিনা।

তাহলেও সুরক্ষিত ওই পর্বত দুর্গ জয় করা কঠিন, তবু পথ পেতে গেলে ওই দুর্গ তাদের ধুলিসাৎ করতেই হবে।

হাসাম খাঁ চলে যাবার পর ঘোঘাবাবা ওদের বলে।

—বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হও ললিত সিংহ।

তারাও জানে এবার সুলতান মাহমুদ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবে চরম আঘাত হানতে।

ঘোঘাবাবা বলে—সে আঘাত প্রতিহত করার সাধ্য আমার নেই।

—রাজপুত চৌহানরা তবু মরতে ভয় পায় না। সুলতানকে সেই কথাটাই জানিয়ে দোব আমরা।

ঘোঘাবাবার মুখে হাসির আভাস ফুটে ওঠে।

তবু শেষ চেষ্টা করবে সে। নিরাপত্তার জন্যই বলে।

—সংগ্রাম সিংহ, তুমি দুর্গের স্ত্রীলোক ছেলেমেয়েদের নিয়ে আজমীরে চলে যাও, রাজা ধর্মগজদেবকেও সংবাদ দাও। যদি তিনি এখানে সৈন্য পাঠাতে পারেন ভালো। নইলে তিনিও যেন প্রস্তুত থাকেন। তবে মরুস্থলীর দুর্গে একটি মাত্র প্রাণী বেঁচে থাকতে সুলতান মামুদ পথ পাবে না।

দুর্গের মধ্যে বিষাদের ছায়া নামে। ওরা তৈরী হয়েছে। দ্রুতগামী অশ্ব আর উটের পিটে চেপে ওরা আজমীর চলে যাবে।

বৃদ্ধা রাণী লছমীবাই-এর এতদিনের সংসার আজ ভেঙ্গে গেল। পুত্রবধূ কমলা—সনকাকে বিদায় দিতে গিয়ে তার দুচোখে জল নামে। সংগ্রাম সিংহও এই সময় দুর্গ ছেড়ে যেতে রাজী হযনি।

ঘোঘাবাবা বলে।

—তোমাকেই বেঁচে থাকতে হবে সংগ্রাম সিংহ। মরুস্থলী দুর্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তুমি থাকবে একমাত্র বংশধর, যে বাইরে গিয়েও এই নৃশংসতার প্রতিশোধ নিতে পারবে। তোমাকে তাই চলে যেতে হবে এখান থেকে।

সংগ্রাম সিংহ বাবার আদেশ বাধ্য হয়েই মেনেছিল।

সন্ধ্যাব অন্ধকার নামতে দেরী নেই।

বানী কমলা ও বলে লছমীবাঈকে।

—আপনি চলুন আম্মাজী।

হাসেন বৃদ্ধা—আমার ডাক এসেছে মা। একলিঙজীর নির্দেশ এসেছে। তোমবা যাও। বেঁচে থাকো, সুখে থাকো।

—দিদাজী! যাবো না আমি।

ছোট্ট নাতিটা বুড়ী লছমীকে জড়িয়ে ধরে দুহাত দিয়ে। ও জানে না কি কালো ছায়া নামছে এর আকাশে।

—কেন যাবো? আমি সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করবো দিদা।

বুড়ী ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে। ওই কিশোর জানে না কি মহাবিপদ এখানে সমাগত।

শিশুর দুচোখে অশ্রুধারা।

ঘোঘাবাবা দাঁড়িয়ে দেখে তার চোখের সামনে এই ঘরভাঙ্গার খেলা, সুলতান তার বুকে কঠিন আঘাত হেনেছে।

রাজপুত বীরের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে প্রতিহিংসার জ্বালায়।

সূর্য্যের শেষ আলো মরুভূমির নিঃস্ব বুকে অন্তহীন জ্বালা এনেছে। উটের দল লম্বা পা ফেলে চলেছে, তামাটে পাহাড়-গুলোয় আলো মুছে আঁধার নামছে।

চলে গেল ওরা। মরুস্থলী দুর্গের প্রাণ চাঞ্চল্যটুকু ওরা নিয়ে গেল। প্রাকার থেকে চেয়ে থাকে ঘোঘাবাবা, পুত্র ললিতসিংহ। দূরে ওদের আর দেখা যায় না।

দুর্গপ্রাকার থেকে ঘোঘাবাবার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

—দুর্গদ্বার বন্ধ করো!

পাহাড়ের বুকে বড় ভারি লোহার গজাল বেড় লাগনো বড় দরজাটা কয়েকজন বলিষ্ঠ রাজপুত ঠেলে বন্ধ করছে।

প্রাকারের উপর জায়গায় জায়গায় তেলের বড় বড় কড়াই' গুড়ের কড়াই আর প্রচুর জ্বালানী রাখা হয়েছে। দুর্গের প্রাকার ওই খাড়া পাহাড়ের উপর ছোট বড় প্রচুর পাথর তোলা হচ্ছে।

সারারাত্রি ধরে আয়োজন চলে।

মশালের আলোয় দুর্গের প্রাঙ্গণ ভরে উঠেছে। কামারশালে তৈরী হচ্ছে তীরের ফলা, বর্শার মাথা। সেগুলোকে তীর বর্ষায় লাগানো হচ্ছে।

গভীর কুপ থেকে বড় বড় পাত্রে জল তুলে সঞ্চিত করা হচ্ছে

প্রাকারের এদিক ওদিকে প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে। ক্লান্ত সৈনিকরা যাতে হাতের কাছে পানীয় জল পায়।

ললিতসিংহ নিজে ঘোড়ায় চেপে প্রাকারের চতুর্দিকে ঘুরে সব আয়োজন পরীক্ষা করছে।

পথটা এই খাড়া পাহাড়ের নীচে দিয়ে চলেছে, অনেক নীচে সেই সঙ্কীর্ণ গিরিখাতটা দেখা যায়, ওরা সব শক্তি জমা করেছে এই খানে, দুপাশে প্রচুর পাথর এনে রাখা হয়েছে। প্রাকারের উপর কাঠের তৈরী উৎক্ষেপক যন্ত্রও রয়েছে। মাঝারি পাথর গুলোকে এর চামড়ার মশকের মত পাত্রে লাগিয়ে টান দিয়ে ছেড়ে দিলে সেগুলো বহুদূরে গিয়ে পড়ে।

সকালের আলো সবে ফুটে উঠেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। ওরা সাবধানী দৃষ্টিমেলে দুর্গ থেকে চেয়ে থাকে, তীক্ষ্ণ প্রহরা রেখেছে।

হঠাৎ শোনা যায় আকাশচারী পাখীদের কলরব, ভীতত্রস্ত পাখীগুলো উড়ে পালাচ্ছে বাতাসে দূর থেকে প্রবল বন্যার শব্দ আসে। নদীর মরাখাতে যেন দুকুল প্লাবিত করে বন্যা নেমেছে।

উত্তর আকাশের নীল আকাশ লালধুলোয় ভরে ওঠে, দেখা যায় কালো একটা রেখার মত এগিয়ে আসছে সুলতান মাহমুদের সৈন্যদল, ওদের বর্ষার ফলায় শাণিত তরবারিতে রোদের আভা পড়ে নিষ্ঠুর আভায় ঝলসে ওঠে।

ঘোঘাবাবা নীল দুচোখ মেলে দেখছে।

পর্বতের আশপাশে ভীলসৈন্যরাও প্রস্তুত। নিপুণ শিকারী আর যোদ্ধা তারা। পর্বতের কালো গায়ের সঙ্গে তাদের রং মিশিয়ে গেছে। পাথরের আড়ালে তারাও আশ্রয় নিয়েছে। বাইরের প্রতিরোধও প্রবল করে রেখেছে ঘোঘাবাবা।

সুলতান মাহমুদ দুর্বার বিক্রমে এগিয়ে আসছে।

মূলতানের সেই প্রভূত স্বর্ণ অর্থ সম্পদ সৈন্যবাহিনীর রসদপত্র, অশ্ব পেয়েছে। লৌহকোট তার দখলে। সেখানকার কিছু বেকার লক্কাবাজ ছোকরাও জুটেছে সৈন্যদলে।

তারা দেখেছে যুদ্ধ তো করতে হচ্ছে না। বেফয়দায় কিছু মজা লোটা যাচ্ছে, তাই তারাও এক একটা ঘোড়া আর তরবারি জুটিয়ে নিয়ে দলে ভিড়ে পড়েছে। তারাও বেশ মজাসে গজল গাইতে গাইতে চলেছে প্রমোদ ভ্রমনে।

সুলতান মামুদ দুর্গের একটু দূরে এসে ওই পর্বতশীর্ষের দুর্গকে দেখছে। চারিদিকে ওর খাড়া পর্বত। একটা টিকটিকিও উঠতে পারে না। তার মাথায় দুর্গ।

তবু যেভাবে হোক পথ তাকে করতেই হবে।

সৈন্যদল অগ্রসর হতেই হঠাৎ দেখা যায় সামনের সেই গজল গাইয়ের দল করুণ আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে। দু একটা ঘোড়া তীরবিদ্ধ অবস্থায় মরীয়া হয়ে দৌড়চ্ছে। একটু দূরেই গিয়ে ছিটকে পড়ে। আবার তীর এসে পড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে তীর।

তবু তারা মরীয়া হয়ে ওই পর্বতের গিরি পথ দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছে। সরু গিরিপথ ভিড়ে ভরে গেছে। এমনসময় উপরের পাহাড় থেকে প্রবল জলস্রোতের মত নামে পাথরগুলো। ছোটবড় পাথর এসে ওদের উপর পড়ছে। পিষে ফেলছে সৈন্যদের।

একটা পাথরের প্রচণ্ড আঘাতে সুলতান মামুদের ঘোড়াটা ছিটকে পড়ল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন সুলতান।

সেনাপতি আলি মস্‌নদ—হাসামখাঁ নিস্ফল আক্রোশে পাথরের সেই দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে লেগে থেকে কোনরকমে বাঁচবার চেষ্টা করছে।

পাহাড়ের গিরিখাতে ইঁদুর কলে পড়েছে সৈন্যদল। বদ্ধ অসহায় অবস্থায় তারা এই কঠিন আঘাতে লুটিয়ে পড়ছে। গিরিখাত যেন নরকে পরিণত হয়েছে। রক্তস্রোত বইছে। মৃতদেহ জমে স্তূপ প্রমাণ হয়।

কোন উপায় নেই এগোবার।

সেই বিপর্যস্ত ক্ষতবিক্ষত সৈন্যদলকে নিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হল সুলতান। এপথে এভাবে এগোনো যাবে না, দুর্গকে ধূলিসাৎ না করলে ওই গিরিপথে ঢোকাও অসম্ভব।

পরাজিত সুলতান নিষ্ফল রোষে বন্দী সিংহের মত ক্ষেপে উঠেছে। তাকে মাথা নীচু করে ফিরে যেতে হবে সামান্য একজন সামন্তরাজের কাছ থেকে ?

সেনাপতি আলি মসনদই বুদ্ধিটা বের করে।

—অন্যপথ নিশ্চয়ই আছে দুর্গে ওঠবার।

একদল সেইপথ অধিকার করে দুর্গে হানা দেবে, অন্যদল দুর্গের কিছু সৈন্যকে ব্যস্ত রাখবে ওই গিরিসঙ্কটে। দুদিক থেকে আক্রমণ হানতে হবে।

সুলতান মামুদ গর্জন করে ওঠে।

—এই মতলবটা আগে বের করোনি কেন বেকুফ্।

হিন্দুস্থানে এসে এবার এই প্রথম রক্তাক্ত সংগ্রাম করেছে সুলতান। আজ হেরেই ফিরে এসেছে।

রাতের অন্ধকারে তাই দুর্বার বেগে আবার আক্রমণ হানতে এগিয়ে যায় তারা। কঠিন পথ। রাতের দুএকটা তারা জ্বলছে। তারই মাঝে পদাতিক দল এগোচ্ছে। বাধা পেয়েই মারমুখী হয়ে ওঠে সৈন্যদল।

তীরের ঝাঁক এসে পড়ছে, অগণিত ভীল সৈন্য ও সামনে

শত্রুদের দেখে প্রবল বেগে আক্রমণ করেছে। তীর ধনুক আর তরবারি বর্ষার আঘাতে পাহাড়ের গা থেকে গড়িয়ে পড়ে মানুষের প্রাণহীন, আহত দেহ। ওদিকে গিরিপথের দিকে শত্রুসৈন্য হানা দিয়েছে।

রাতের অন্ধকারে জ্বলে ওঠে আগুনে তীরগুলো।

ঘোঘাবাবা জানতো কালকের আক্রমণের পর সুলতান দ্বিগুণ তেজে আবার আঘাত হানবে। নিশ্চিত ফল কি তা সেও জানে। তবু আশা করেছিল যদি ইতিমধ্যে আজমীর থেকে সৈন্যদল আসে। কিন্তু তারও কোন লক্ষণ নেই।

আজ রাতের অন্ধকারে ধূর্ত ওই দানব আঘাত হেনেছে দুদিক থেকে। বাইরের সৈন্য ওদের ওই তরবারির সামনে দাঁড়াতে পারে না। অনেকেই পিছু হঠে এসে দুর্গের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে।

এদিকে শত্রুসৈন্য পথ পেয়ে হাজারে হাজারে এসে হাজির হয়েছে দুর্গ প্রাকারের কাছে।

সামনের পাহাড়ের উপর থেকে তারাও দুর্গের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়ছে। মাঝে মাঝে আসে আগুনের তীর। সেই সঙ্গে হানা দিয়েছে ওরা দুর্গ তোরণে। গরম তেলের ধারায় নীচেকার সুলতানের সৈন্যদল পিছিয়ে যায়, আবার হানা দেয়।

প্রাণপণ যুদ্ধ চলেছে। আজ ঘোঘাবাবা বুঝেছে কোন পথ নেই। তবু শেষ পর্যন্ত যুঝবে সে। আজমীরের অধিপতি তবু তৈরী হবার সময় পাবে। সুলতানের যতটুকু পারে ক্ষতি করবে সে তার প্রাণের বিনিময়ে।

রাত শেষ হয়ে আসে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সৈন্যদল।

সুলতান মামুদ পিছনে একটা বাবলা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। অজেয় দুর্গটা পরিহাস ভরে চেয়ে আছে তার দিকে।

হঠাৎ কার হাসির শব্দে চেয়ে দেখে সুলতান।

ওপাশের তাঞ্জাম থেকে নেমে মিনাবাঈ তার দিকে এগিয়ে আসে।

পরিহাসউছল কণ্ঠে বলে মিনাবাঈ।

—তাহলে একজন সামন্তরাজার হাতেই পরাজিত হলেন সুলতান?

সুলতানের চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। মরুস্থলীর রোদ বেড়ে উঠেছে। এইবার সমস্যায় পড়ে। ছায়া নেই জলের সঞ্চয় কমে আসছে। মিনাবাঈ এর কথায় জ্বলে ওঠে সুলতান।

—খবরদার! বেসরমী।

হাসছে মিনাবাঈ।

—বেসরম্ তো সত্যিই সুলতান। তবে তুমি যে কতবড় যোদ্ধা তাও বুঝলাম।

সুলতান অসহায় রাগে পায়চারী করছে। বিশ্রী দেশ এই ভারতবর্ষ। রোদের তাপে এখানে আগুন ঝরে। হাঁপাচ্ছে সুলতান। তবু অপমানে জ্বলে ওঠে সে।

মিনাবাঈ বলে।

—ফিরে চলুন সুলতান। গজনীর সিংহাসনে তবু আরামে বসবেন। সেখানের জল হাওয়া আর ও তাগতদার।

ও যেন ব্যঙ্গ করছে সুলতানকে।

প্রজ্বলিত আগুনের তেজে জ্বলে ওঠে সেই দানব। নিজেই এগিয়ে চলে। সেনাপতি আলি মসনদ দুর্গ প্রাকারে আক্রমণ হেনেছে।

কঠিন দরজায় আঘাতের পর আঘাত হানে, আবার উপর থেকে গরম তেলের স্রোত নামতেই আহত সৈন্যরা পিছিয়ে আসে।

সুলতান নিজেও এসেছে। দড়ির মই ও তৈরী হয়ে গেছে। তারা এবার পূর্ণবেগে হানা দেয়। কিছু সৈন্য উপরের প্রাকারে উঠবার চেষ্টা করে। ললিত সিংহ তীরের আঘাতে আহত।

বৃদ্ধ ঘোঘাবাবা ও আজ জীবনের শেষ যুদ্ধই করতে চান। বৃদ্ধ আজ যুবার তেজে বলীয়ান হয়ে আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছে।

ওরা দুর্গের প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছে সকলে। পরণে গৈরিক বাস। সহসা দুর্গের দরজা খুলে যায়। কয়েক শত রাজপুত সৈন্যের হর হর ব্যোম শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। সুলতান নিজের চোখে এই আত্মঘাতী যুদ্ধ কখনও দেখেনি।

রক্তস্নানে তারা আজ মেতে উঠেছে। ঘোঘাবাবা প্রবল বিক্রমে এসে পড়ে সুলতানের উপরই। ওর তরবারির আঘাতে শিরস্ত্রাণ ছিটকে পড়ে মামুদের। কাঁধের কাছে আঘাত লেগে বর্মে ঠেকেছে। তাই রক্ষে। নইলে সুলতানের আজ সব শেষ হয়ে যেতো। ছিটকে পড়েছে সুলতান। হাসাম খানের তরবারী বৃদ্ধের বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে যায়।

দুর্গ তোরণে বয়ে যায় রক্তের বন্যা।

ক্লান্ত বিজয়ী সুলতানের সৈন্য যখন দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে দেখে শূন্য দুর্গ ···চারিদিকে নিহত রাজপুতের দল। একটা চিতা জ্বলছে অনির্বাণ শিখায়।

চমকে ওঠে সুলতান, মিনাবাঈ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

···লছমী বাঈ জওহর ব্রতে নিজেকে নিঃশেষ করেছে। দুহাত তুলে নমস্কার জানায় মিনাবাঈ দুচোখে তার জলধারা।

নিজের মনের অন্তহীন দুর্বলতার কথাই স্মরণ হয় তার। সুলতান বীরদর্পে বলে।

—বীরত্ব দেখলে মিনাবাঈ? সুলতান ভীরু নয়।

মিনা জবাব দেয় ওই প্রজ্বলিত চিতার দিকে চেয়ে।

—তোমার সাধ্য কি এদের স্পর্শ কর সুলতান ? এরা মরণকে জয় করতে জানে।

সুলতান একথা আজ মুখে না বললেও অন্তরে বিশ্বাস করে। সামান্য একজন দুর্গাধিপতি তার যা ক্ষয় ক্ষতি করেছে তা অপূরণীয়। এখনও বহুদূর পথ। দুর্গম মরুভূমি আর অরণ্য সঙ্কুল পথ।

তবু তাকে এগোতে হবে।

শূন্য প্রানহীন দুর্গেই একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে তারা আবার অগ্রসর হবে। ততদিনে আগেকার পথের ও কোন সংবাদ আসবে নিশ্চয়ই। গুপ্তচররা ও এগিয়ে গেছে।

জলের অভাব নেই।

কূপের সুমিষ্ঠ জল পান করে সুলতান একটু শান্ত হয়। রাত্রির স্তব্ধতা নামছে। রাতের অন্ধকারে মরুভূমির দিক থেকে শিয়াল—হায়নার দল আসে। প্রচুর ভোজ্য পেয়ে খুশী হয়েছে তারা।

তাদের বীভৎস চীৎকার ভেসে আসে।

সারা দিগন্ত স্তব্ধ ক্লান্ত সৈন্যদল ছাউনিতে—মুক্ত প্রান্তরে যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে।

জেগে আছে ওই শিয়াল হায়নার দল! আঁধারে তাদের নীল চোখগুলো জ্বলছে কি শ্বাপদ লালসায়।

দুর্গ প্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে মিনাবাঈ।

তার নিজের কাছেই এই অভিনয় অসহ্য ঠেকে। কি যেন বাঁধনে সে আটকে পড়েছে এই দানবের হাতে। এই বন্ধন থেকে সারা মন তার মুক্তি খোঁজে, লছমীর কথা মনে পড়ে।

জওহর ব্রতে সে আত্মনিবেদন করেছে, সেও ভারতের নারী।

তার তুলনায় মিনাবাঈ তুচ্ছ, অতিতুচ্ছ একটি ঘৃণ্য জীব। তবু টিকে আছে সে।

কেন বেঁচে আছে জানে না।

মনে হয় একদিন এর জবাব পাবে সে। মানুষটাকে ঘৃণা করে—নিদারুণ ঘৃণা।

তবু কোথায় তার একটা পরাজয় ঘটে গেছে।

—মিনাবাঈ!

সুলতানের ডাকে চমকে ওঠে মিনা! মিনাবাঈ বলে ওঠে।

—রাত্রে এখানে জেগে আছে শিয়াল আর হায়নার দল। মানুষের মধ্যে জেগে আছো তুমি।

ক্লান্ত সুলতান আজ বিশ্রাম চায়, চায় ক্ষণিকের জন্য শান্তি। কিন্তু মিনার মাঝে ও শুধু দেখেছে জ্বালা আর জ্বালা।

তাই হতাশ হয়েই সরে এল।

মিনা হাসছে। ওর হাসিটা সুলতানের কাছে ব্যঙ্গের মতই ঠেকে।

ঘাড়ের কাছে সেই বেদনাটা টনটন করে ওঠে। সুলতানকে আজ বৃদ্ধ রাজপুত হত্যাই করে ফেলতো।

অসহায় রাগ বেদনা আর নীরব অপমানে একটি কঠিন মানুষ আগ্নেয় গিরিব মত ফুঁসছে। কোথায় সে হেরে গেছে আজ।

আচার্য মিত্রপাদ সোনা চায়, সম্পদ চায়।

লোভী মন তাই অনেক পথই খুঁজেছে। আলবেরুণীকে পেয়ে মনে মনে খুশী হয়েছিল মিত্রপাদ।...ও পণ্ডিত লোক। হয়তো জানে অনেক বেশী।

মিত্রপাদ নিজেও বেশকিছু চেষ্টা করেছে, সোনা তৈরী করার পদ্ধতি তার সঠিক জানা নেই। তবু নানা ভাবে জানবার চেষ্টা করছে। ব্যাধি তখনকার দিনের নাম করা রসায়নবিদ, নাগার্জুনের

পর থেকে এদেশে রসায়ন চর্চার প্রচলন আরও বেশী হয়। অনেক রসায়নবিদ ও চেষ্টা করেন কি করে স্বর্ণ তৈরী করা যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই পারদ বা অন্য কোন ধাতুর মিশ্রনকে অগ্নিস্ফুটিত করে স্বর্ণ তৈরী করার স্বপ্ন দেখে।

ব্যাধিকেও মিত্রপাদ এনেছেন, ব্যাধিই বলেছে কথাটা।

আশ্রমে আর একটি প্রাণী ও আছে—সে মেনকা।

এককালে জুনাগড়ের কোন দেহ পশারিণী ছিল, আজ সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছে এই খানেই।

ব্যাধিকে তার ভাললেগেছিল। আত্মভোলা বিজ্ঞানী। সারাদিনই নানা ওষুধ পত্র গাছ গাছড়া—ধাতু নিয়ে পরীক্ষা করে। মিত্রপাদ তাকে আশ্রয় দিয়েছে।

ব্যাধিকে কেন আশ্রয় দিয়েছে মিত্রপাদ তা জানে মেনকা। মিত্রপাদ মেনকার সর্বনাশ করেছে, তার এ পথে আসাব মূলে ছিল ওই তরুণ মিত্রপাদ।

আজ মেনকা তাই লোকটাকে দেখতে পাবে না জানে সে স্বার্থপর নিষ্ঠুর একটি মানুষ।

ব্যাধিকেই বলে মেনকা।

—এ ভাবে আর থাকা যায় না ব্যাধি।

ব্যাধি অবাক হয়।

—কেন?

মেনকার নারীমন আজ সব হারিয়ে আবার বাঁচতে চায় নোতুন করে। একজনকে কেন্দ্র করে, সে ঘর বাঁধতে চায়।

কিন্তু ব্যাধি সে কথা বোঝে না। তার স্বপ্ন সে সোনা তৈরী করবেই।

তারই পিছনে দিন রাত্রি সে পরিশ্রম করে চলেছে।

মিত্রপাদ তাকে সব রকম সাহায্য করে চলেছেন, যদি ব্যাধি

একবার স্বর্ণরসায়ন বের করতে পারে সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী হবে মিত্রপাদ।

মেনকা তাকে নিষেধ করে।

—এসব মিথ্যা স্বপ্নে দিন কাটিয়ো না, তুমি গুণী লোক। তোমার জ্ঞানের সাহায্যে তুমি দেশের কল্যাণ করতে পারবে।

—সোনা তৈরী না করতে পারলে আমার সব কিছু মিথ্যা হবে মেনকা।

—না! এ পথে যেও না তুমি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

মেনকা তাকে বাধা দিয়েছে শুনে মিত্রপাদ চটে ওঠেন। আজ সে জানে সিদ্ধি তার হাতের কাছে। মেনকাকেই বলেন মিত্রপাদ।

—তুমি যদি অসুবিধা বোধ করো—এখান থেকে চলে যাও।

অবাক হয় মেনকা।

—আমার সব নিয়ে আজ দূর করে দিতে চাও?

—হ্যাঁ! কোন মায়া দয়া আমার নেই।

—বেশ!

মেনকা চলে যাবে এখান থেকে। কোথায় যাবে জানে না। তবু ফিরে যাবে সেই গিরিনগরের সবুজ শান্ত পরিবেশে।

ব্যাধিকে খুঁজে ফেরে, মিত্রপাদ বাধা দেন।

—ওর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।

ব্যাধি তখন সাধনায় মগ্ন।

মিত্রপাদ ও আয়োজনের ত্রুটি রাখেননি। বিরাট একটা তৈলকটাহ চাপানো হয়েছে। তাতে ফুটছে গরম তেল! একটা সুদর্শন সুলক্ষণ বালককে হাত পা বেঁধে আনা হয়েছে।

ওই তপ্ত তৈল কটাহে নিক্ষেপ করে তাকে জ্যান্ত ফুটিয়ে হত্যা করে পারদ জারিত কবে স্বর্ণ তৈরী কবা হবে। কোন মায়া দয়া নেই।

অবিচল ভাবেই কর্তব্য করে চলবে সে।

লোকটা বোধ হয় ওই বালকের আর্তনাদে কান দেয় না। কজন বলিষ্ঠ মঠবাসী ছেলেটাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই সেই তৈল কটাহে নিক্ষেপ করে দেয়। একটা করুণ আর্তনাদে ভরে ওঠে প্রায়ান্ধকার ঘরটা।

তারপর সবশেষ। প্রাণহীন লা-াভ দেহটা পারদ জারিত করতে থাকে। মিত্রপাদ উত্তেজনা -রে পায়চারী করছেন। চেয়ে থাকেন স্থির দৃষ্টিতে ওই দেহটার দিকে, ওটা এইবার স্বর্ণপিণ্ডে পরিণত হবে।

কিন্তু না।

সব স্বপ্ন কল্পনা তাব ব্যর্থ হযে যায়। কিছুই হ'ল না।

—ব্যাধি।

ব্যাধি স্তব্ধ হযে গেছে। তাব এতদিনেব অধীত বিদ্যা সব মিথ্যা। স্বর্ণ রসাযন মিথ্যা। কোন দাম এর নেই।

তখনও কাণে বাজছে সেই ছেলেটার কাতর করুণ আতনাদ। তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে ব্যাধি।

মিত্রপাদ গর্জন করে ওঠেন।

—ধাপ্পা দিয়েছো তুমি আমায়।

ব্যাধি চুপ করে থাকে। ওকে ধাপ্পা দিযেছে না নিজেই সবচেয়ে বেশী প্রতারিত হয়েছে তা জানে না ব্যাধি।

আজ মনে হয় কোন কিছুই সে জানে না।

এ তার চরম পরাজয়। মাথা নীচু করে থাকে ব্যাধি। মিত্রপাদ গর্জন করেন।

—তোমাকেই তপ্ত তৈল কটাহে নিক্ষেপ করতাম, তা আর করবো না। তুমি দূর হয়ে যাও।

ব্যাধি তার সম্বল জীবনের এতদিনে গবেষণার সমস্ত পুথি রসায়ন শাস্ত্রের মূল্যবান লেখাগুলো নিয়ে বের হয়ে এল। কোথায় যাবে জানে না।

সরস্বতীর কূলে এসে দাঁড়াল।

মেনকাও চলে গেছে। এতদিন সে ডেকেছে তাকে বারবার।

কিন্তু সে ডাকে সাড়া দিতে পারে নি ব্যাধি। কোন এক মিথ্যা মোহে মগ্ন ছিল

ব্যাধির সারা মন গ্লানি আর দুঃসহ অপমানে ভরে গেছে। মনে হয় রসায়ন শাস্ত্রই মিথ্যা, এতদিনের অধীত বিদ্যাই অর্থহীন। নিজের জীবনের উপরই ধিক্কার আসে।

শূন্য ব্যর্থ জীবন—কলঙ্ক আর অপমানে কালো হয়ে গেছে।

পুঁথিগুলো ফেলেই দেবে সে।

তালপত্রে—ভূর্জপত্রে লেখা পুঁথির পাতাগুলো খুলে খুলে সরস্বতীর জলে ফেলে দেয়। ফেলতে থাকে এক একটা করে।

নদীতে জোয়ারের জল এসেছে। আরব সমুদ্রের নীল জলরাশি বয়ে চলেছে উজানে, তাতেই ব্যাধির সারাজীবনের সাধনার ধন—হারিয়ে যাচ্ছে।

যাক। মূল্যহীন সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে ব্যাধি নিজেকেও ওই অতল জলস্রোতে ভাসিয়ে দেবে।

মেনকা তার ঘরেই ফিরে যাবে, নদীতীরে স্নান সেরে সে উটের গাড়ীতে উঠবে। যান প্রস্তুত। যাবার আগে তাই শেষবারের মত পুণ্যতোয়া সরস্বতীতে স্নান সেরে নোতুন সেই শূন্যতাময় জীবনে ফিরে যাবে।

নদীর ধারে হঠাৎ কি ভেসে আসতে দেখে অবাক হয় সে। হাতে ঠেকে পুঁথির পাতা, চেনা হস্তাক্ষর। ব্যাধির হাতের লিখো করা এ পুঁথি। একটা নয়—অনেক পাতাই ভেসে আসছে জলস্রোতে।

রসায়নবিদ ব্যাধি সারা জীবন ধরে এইসব পুঁথি সংগ্রহ করে গবেষণা করেছে। তার কাছে জীবনের চেয়েও মূল্যবান এসব।

সেই পুঁথির পাতাগুলোকে আজ স্রোতে ভেসে আসতে দেখে মেনকা অবাক হয়। তুলে নিতে থাকে জল থেকে এক একটা করে। স্তূপাকার হয়ে যায় পাতাগুলো। মেনকা কি ভেবে নদীর ধার দিয়ে চলতে থাকে।

এক নিমিষে ওই দেহটা অতলে কোথায় হারিয়ে যাবে। মেনকা অস্ফুট ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দেয়।

—ব্যাধি! ব্যাধি!

ছুটে এসে ওর হাত ধরে ফেলে মেনকা।

ব্যাধিও তৈয়ারী হয়েছিল। সব তার ফেলে দিয়েছে জলে। এইবার নিজেই ওই অতলে লাফ দেবে। এ জীবনের আর কোন দাম নেই। কিন্তু হঠাৎ বাধা পেয়ে চমকে ওঠে।

—তুমি!

মেনকা তাকে ডাকছে।

মৃত্যুর সামনে থেকে জীবনের দিকে তাকে আশাভরা দুচোখ নিয়ে ডাকছে মেনকা। আজ সে বেদনাবোধ করে ওই মানুষটির জন্য। ব্যাধি বলে।

—বাঁচার আমার কোন পথ নেই মেনকা, আমার সাধনা মিথ্যা। মিথ্যা ওই রসায়ন।

—না! ওই স্বর্ণ রসায়ন—ওই লোভ তোমাকে ভুলপথে নিয়ে গিয়েছিল ব্যাধি। তুমি রসায়নবিদ, রসায়ন মিথ্যা নয়। নোতুন করে

মানুষের কল্যাণে সেই রসায়নকে লাগাও। সুখী হবে—মানুষও শান্তি পাবে ; তুমি অনেককে প্রাণদান করতে পারবে।

ব্যাধির চোখের সামনে সেই কিশোরের ছবিটা সেই প্রাণ নেবার দৃশ্যটা ফুটে ওঠে। সেই বেদনাই তাকে এমনি অধীর করে তুলেছে।

মেনকার কথায় অবাক হয় সে।

—প্রাণ দিতে পারবো মানুষকে ?

—নিশ্চয়ই। তোমার রসায়ন কাজ করবে মানুষের মঙ্গলের জন্য, ধ্বংসের জন্য নয়।

—কিন্তু কোথায় যাবো মেনকা ? এতবড় পৃথিবীতে আমার আশ্রয় কই ?

মেনকার দুচোখে প্রেমের বন্যা নামে। দেহপশারিনী আজ সব ভুলে একজনকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চায়। তাকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে চায়। তাই বলে।

—সব আছে ব্যাধি। চল, আমরা এখান থেকে দূরে কোন শান্তিপূর্ণ ঠাঁই এ চলে যাই। সেখানে নোতুন করে বাঁচবো আমরা। আমি আর তুমি। তোমার রসায়নবিদ্যা সেখানে সার্থক হবে।

ব্যাধি আজ পথ চেনে না। সবকিছু সে আজ বিসর্জন দিয়েছে এই সরস্বতীর জলে।

কিন্তু কিছুই হারায় নি। সেই স্তূপীকৃত পুঁথির পাতাগুলোকে আবার গাড়িতে তোলে মেনকা। ব্যাধি অবাক হয়। কৃতজ্ঞতায় তার সারা মন ভরে ওঠে।

—মেনকা!

ধূলিধূসর পথ দিয়ে চলেছে উটের গাড়ীটা। দুটি মানুষ এই বিলাসবৈভব আর লোভের রাজ্য থেকে কোন নীলপাহাড় বনরাজি ঘেরা ছোট্ট একটি জনপদের সন্ধানে চলেছে।

তারা হারিয়ে যেতে চায়।

অবশ্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষ এমন কি মিত্রপাদ নিজে এ নিয়ে অনেক বিপদেই পড়েছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনিতেই এই শৈব এবং হিন্দুধর্মের তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে অনেক অপবাদ জড়িয়ে আছে, তাছাড়া এর আগে তাদের হীনযান বৌদ্ধমতকে এরা নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেছিল। একটা চিরন্তন আক্রোশ রয়ে গেছে সনাতন হিন্দু ধর্ম আর বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যে।

হঠাৎ এই নৃশংস হত্যার খবরটা নানা ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ বলে ওই তান্ত্রিকের দল নাকি অমাবস্যার রাত্রে একসঙ্গে পাঁচটা নরবলি দিয়েছে।

কেউ বলে মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠ পুঁতে তাতে পরপর দশটা মানুষকে তারা কেটেছে।

তাই নিয়ে প্রভাস পত্তনের কোতোয়াল নিজে তদন্তে এসেছিল। মন্দিরে ঢুকে দেবস্থান অপবিত্র করেছে। সেই রসায়ন শালার জিনিষপত্র তছনছ করেছে। কিন্তু কোন প্রমানই পায়নি।

মিত্রপাদকে লাঞ্ছনা করেছে।

কিন্তু চতুর মিত্রপাদ সেই মৃতদেহটাকে গভীর মাটির নীচে ইতিপূর্বে পুঁতে তার উপরই তৈরী করেছে যজ্ঞবেদী। সেই পাপের কোন চিহ্নই রাখেনি তারা।

তবু বহু লোকের মাঝে এই আশ্রমকে কেন্দ্র করে নানা কাহিনীই প্রচলিত হয়েছে। সকলের চোখেই একে ঘিরে নানা আতঙ্কের কল্পনা, সাধারণ মানুষ তাই এদের এড়িয়ে চলে। এই আশ্রম সোমনাথপত্তনের বাইরে এই সবুজ নদীর ধারে একটা অশুভ অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে। সে অতীতের কথা।

তবু আজও মিত্রপাদ সেই স্বর্ণ রসায়নের কথা ভোলেন নি।

পণ্ডিত আলবেরুণীকে পেয়ে মনে মনে তিনি কল্পনাই করেছেন আবার একবার চেষ্টা করবেন।

আলবেরুণী এই আশ্রমে রয়েছেন আজ দুদিন হয়ে গেল। কে বা কারা তাকে আশ্রয় দিয়েছে জানতেন না তিনি।

হঠাৎ তাকে সেই অন্ধকার ঘর থেকে একটা ভালো ঘরেই আশ্রয় দেওয়া হ'ল। দোতলার একটা ঘর। সামনের বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় সরস্বতীর জলপ্রবাহ, দূরে কপিলা নদী এসে মিশেছে তাতে, ওপাশেই আরব সাগর।

সঙ্গমই বলা যায়।

হিন্দুদর্শন পুরাণে তিনি এই প্রভাস পত্তনের কথা পড়েছেন।

রাজা দক্ষের জামাতা চন্দ্র তার মেয়েদের অপমান এবং অবজ্ঞা করার জন্য দক্ষ চন্দ্রকে অভিশাপ দেন, ফলে সে ক্ষয়রোগগ্রস্থ হয়।

রোগগ্রস্থ চন্দ্র তখন মহাদেবের তপস্যা করে তার বর লাভ করেন, তিনিই এই সোমনাথ জ্যোর্তিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এই প্রভাসসঙ্গমে স্নান করে রোগমুক্ত হয়ে তার দেহের প্রভা ফিরে পান।

তারই জন্য এই তীর্থের নাম প্রভাস।

পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজত্বকালে তিনি এই মহাদেবের স্বর্ণনির্মিত মন্দির তৈরী করেন। কালক্রমে তা বিনষ্ট হলে রৌপ্য নির্মিত মন্দির তৈরী হল পরে এখনকার মানুষ তাদের কল্পনা আর প্রভূতসম্পদ দিয়ে বিশাল অভ্রংলিহ এই মন্দির গড়ে তোলে। ষড় ঐশ্বের্য্যশ্বর দেবাদিদেব মহাদেবকে তারা এখানে প্রভূত ঐশ্বর্যময় করে রেখেছে।

চুপকরে কি ভাবছেন আলবেরুণী।

আকাশের কালিমায় যেন একটা কালো মেঘের ছায়া ...মছে। সুলতান মামুদের নৃশংসতাকে এরা চেনে না।

জানে না এই শান্তিপূর্ণ নগরীর ভাগ্যে কি সর্বনাশ প্রতীক্ষা করছে।

শান্ত নগরীর এদিকের আকাশসীমায় মাথা তুলেছে প্রস্তর নির্মিত সুউচ্চ প্রাকার শ্রেণী। তারও ওপাশে দেখা যায় সোমনাথ দেবের স্বর্ণ-শীর্ষ মন্দির চূড়া।

ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং।

শান্তসমাহিত পরিবেশ। সরস্বতী নদীর শান্ত জলধারায় জোয়ারের স্তিমিত আবেগ আসছে।

কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইলেন আলবেরুণী।

মিত্রপাদ ঢুকছেন তার কক্ষে।

—কোন অসুবিধা হয়নি তো?

আলবেরুণী ওর দিকে চাইলেন। লোকটাকে ইতিমধ্যে কয়েক-বারই দেখেছেন। শীর্ণ চেহারা, সারা শরীরটা যেন কাঠিন্যে ভরা, দেহের শিরা উপশিরাগুলো পর্যন্ত পাকানো। শক্ত দুটো চোখে জ্বলজ্বল করে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

গলার রুদ্রাক্ষ আর স্ফটিকের মালা ওর কথা বলার সঙ্গে স্পন্দিত হয়ে নিষ্ঠুর পৈশাচিক একটা শব্দ তোলে।

আলবেরুণী ভেবেছিলেন ওর কাছে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন বোধহয়। সেই আশাতেই এখানে রয়ে গেছেন।

মিত্রপাদের কথায় উত্তর দেয় আলবেরুণী।

—না, না। কোন অসুবিধা হয়নি। মহাতন্ত্রসার সম্বন্ধে পুঁথি পাওয়া যাবে বলেছিলেন সেটার একটু ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়।

মিত্রপাদ ও ধূর্ত লোক, তার সেই স্বর্ণ রসায়ন সমন্ধে এখনও জানা হয়নি। তাছাড়া ওকে এইখানে কৌশলে আটকে রাখতে

হবে। হাসাম খাঁনের কাছে তেমনি কথাই দিয়েছেন মিত্রপাদ। তাই ওর কায এত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে চান না।

মিত্রপাদ জবাব দেন।

—গিরিনগরের আশ্রমের ওখান থেকে সেই মহামূল্যবান পুঁথি আনাবার ব্যবস্থা করছি। ততদিন এখানের গ্রন্থাগারে যা আছে তাতেও কায চলে যাবে আপনার।

আলবেরুনী মাথা নাড়েন। মিত্রপাদই বলে চলেছেন।

—তাছাড়া সোমনাথ পত্তনে, প্রভাস পত্তনে ও অনেক কিছু দেখার শেখার আছে।

আলবেরুণী মিত্রপাদের দিকে চেয়ে থাকেন।

মিত্রপাদও ওকে সোমনাথপত্তনের সম্বন্ধে বলেছেন।

—সুরক্ষিত নগরী। তবু আপনি এতদিন এদেশে আছেন। হিন্দুদের শাস্ত্র রীতিনীতি সবই জানেন, আপনাকে কেউ সন্দেহ করবে না।

আলবেরুণী কথাটা ভাবেন নি, তার পথ সহজই। তাছাড়া সারা ভারতের মধ্যে এতবড় তীর্থ আর নেই। এত সম্পদ এত প্রাচুর্য নিজের চোখেও দেখতে ইচ্ছা করে।

মিত্রপাদ বলে চলেছেন।

—স্বচ্ছন্দে দর্শন করে আসতে পারেন।

—আপনাদের মধ্যে এই গোলমাল, মতদ্বৈততা কেন ?

মিত্রপাদ ওর কথায় একটু অবাক হন। প্রশ্নটা কেমন গোলমেলে।

আলবেরুণী ও তার জবাব জানেন। দেখেছেন সারা ভারতবর্ষে বড় বড় শক্তিমান অনেক রাজা আছে। অতীত ঐতিহ্য, সম্পদ বৈভবের ও কোন অভাব নেই।

মৃত্তিকা এখানে স্বর্ণপ্রসূ।

এই ধনসম্পদপূর্ণ দেশে সব আছে, নেই সুধু ঐক্য আর সহনশীলতা। পরস্পর এরা কাউকে সহ্য করতে পারে না।

আপোষ ও করে না। তাই এদের হানাহানি আর দ্বন্দের জন্যই হয়তো এরা একদিন চরম বিপদে পড়বে।

মিত্রপাদ ধূর্ত লোক, বিদেশীকে এই প্রশ্ন করতে দেখে একটু বিস্মিতই হন। কি ভেবে জবাব দেন।

—আমরা অন্যমতে অবিশ্বাসী।

—আর কোন মত কি বিশ্বাসযোগ্য নয়? সহনীয় নয়?

স্তব্ধ হয়ে থাকেন মিত্রপাদ, এর জবাব কিছু না দেওয়াই ভালো। তাদের মতবাদের সমর্থক কতজন?

ওপাশে সোমনাথের মন্দিরে স্নানপর্ব সুরু হয়েছে।

দেবাদিদেব সোমনাথ মন্দিরে ভোর থেকেই প্রভাতী রাগে সানাই এর সুর ওঠে, টিকাবার গুরু গুরু শব্দ মেশে তার তালে, বিশাল ডমরুর তালে তালে যেন মহাকালের উদ্দাম নৃত্য লীলা চলছে। সেই নৃত্যের ধ্বনি জাগে আকাশবাতাসে, তারই প্রচণ্ড আলোড়ন জাগে অকূল সমুদ্রের বুকে।

সারা ভারতবর্ষ থেকে আসে তীর্থযাত্রীর দল।

মন্দিরের বাইরের তোরণদ্বার খুলে গেছে। প্রাকার সীমানার বাইরেই কয়েক সহস্র ক্ষৌরকাররা ব্যস্ত। যাত্রীদল দূর পথ অতিক্রম করে আসছে, মাথায় তাদের পবিত্র গঙ্গাজল, তারা বয়ে আনছে সেই দূর থেকে সোমনাথের পূজো দেবে বলে।

বাহির পরিখার পরই সহর। বিভিন্ন দেশের লোক আর ব্যবসায়ী সেখানে সমাগত। শ্রেষ্ঠীদের বাসস্থান বিপনীর শ্রেণী। ধর্মশালা রয়েছে। সেখানে হাজারো যাত্রী অপেক্ষা করে মধ্যনিশা

থেকে, কখন ভোরের মঙ্গল আরত্রিকের সময় সেই মন্দিরের মূল তোরণদ্বার খোলা হবে।

তারপর বিশাল চত্বর। দেবদাসী মহল প্রায় হাজার পুরোহিত পদস্থ কর্মচারীদের বাসস্থান, ওপাশে ভোগমন্দির। সেখানে ভোগের সব আয়োজন থরে থরে সাজানো।

সোমনাথের ভোগের জন্য মন্দির থেকে ব্যয়ের দৈনিক বরাদ্দ বেশ কয়েক-সহস্র অর্থ। মিষ্টান্নশালা ও দর্শনীয় স্থান।

দশহাজার জনপদের রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়েছে সোমনাথের সেবার জন্য, তাছাড়া ভক্ত জন, সারা ভারতের রাজাদের দান তো আছেই।

ভোগ মন্দিরে সারি সারি সোনার যাঁতা বসানো, ওপাশে কয়েকটা রূপার তৈরী পেষনযন্ত্র। সুদূর কাশ্মীর থেকে আসে বহু মূল্যবান জাফরান কেশর কস্তুরী। সেগুলো মিষ্টান্নে ব্যবহৃত হয় এই যাঁতায় পেষাই করে নিয়ে।

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি, তার লাল আভা নীলসমুদ্রের বুকে আরক্তিম আভাস এনেছে। দেবতার প্রাতঃ স্নান পর্ব চলছে। ভারে ভারে প্রায় সহস্র ক্রোশ দূর থেকে আনীত গঙ্গাজল ঢালা হচ্ছে ভগবান সোমনাথের বিরাট মূর্তির উপর। কষ্টিপাথরের তৈরি মূর্তি প্রায় পাঁচহাত উঁচু তিনহাত বেড়।

মন্দিরের চত্বরে দেবদাসীদের নৃত্য সুরু হয়েছে।

হাজারো জনের ভক্তিভরা কণ্ঠের আহ্বান মেশে আকাশে বাতাসে। প্রাকারশীর্ষে সতর্ক প্রহরীর তূরীধ্বনি শোনা যায়।

প্রহরা বদল হবে এইবার।

মূল পূজারী গঙ্গাসর্বজ্ঞ নিজের কক্ষে পায়চারী করছেন।

মন্দিরের পূজার প্রতিদিনের পর্ব সারবার জন্য কয়েকশো পুরোহিত পূজারী আছেন। তিনি বিশেষ তিথি যোগে পূজা করেন মাত্র।

আর নিত্যপূজার জন্য তার বিশেষ সময়ে যখন তিনি যান তখন মন্দিরদ্বার থাকে রুদ্ধ। সাধারণের দর্শন করার উপায় নেই।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ চিন্তায় পড়েছেন।

ওদিক থেকে সংবাদ এসেছে দস্যু সুলতান মামুদ মরুস্থলীর সামন্তরাজকে পরাজিত নিহত করে তার দুর্গ ধ্বংস করেছে। সেই খানেই তার গতিরুদ্ধ হয়নি, বাধামুক্ত পথ পেয়ে দুর্গম মরুভূমি পার হয়ে সে তার সৈন্যবাহিণী নিয়ে আজমীরের দিকে এগিয়ে আসছে।

এখনও সময় আছে।

রাজস্থানের আজমীর, আবুপর্বতে পারমর, উজ্জয়িনীর ভোজরাজ, গুর্জর এবং সৌরাষ্ট্রের সৈন্যদল যদি সমবেত ভাবে সুলতানকে বাধা দেয় সেই প্রচণ্ড সম্মিলিত শক্তির সামনে দাঁড়াতে সে পারবে না। শুনেছেন গঙ্গাসর্বজ্ঞ মূলতান লাহোরের বিতাড়িত নরপতি অজয় পাল ও উত্তর ভারতে কনৌজ প্রভৃতি রাজাদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

ভীমদেব নিজে এসেছেন এই সংবাদ নিয়ে।

বাইরে সমুদ্রের একটানা গর্জনধ্বনি ভেসে আসে। মন্দিরে ওঠে টিকারা আর তুরীর শব্দ, স্বাভাবিক ভাবেই এখানের সেই জীবনযাত্রা চলেছে।

এই শান্তিকে বিঘ্নিত করতে আসছে দুর্বার কোন দস্যুর দল।

গঙ্গা সর্বজ্ঞ বলেন।

—আর দেরী করা যুক্তিযুক্ত হবে না ভীমদেব। ভোজরাজকে আমার চিঠি দিয়ে দূত পাঠাও?

পারমার রাজের কাছেও সংবাদ দাও তারা এখনও বসে থাকলে কেউ বাঁচবেন না। আজমীরের রাজার সঙ্গে একযোগে তাঁরাও বাধা দিন সুলতানকে। সারাভারতে কি এমন কেউ নেই যে একনায়কত্ব নিয়ে এর প্রতিবিধান করবে?

ভীমদেব ও এই কথা ভেবেছেন, কিন্তু কোন পথ পান নি। সারা ভারতবর্ষ যেন একটা অতল সমাধির মধ্যে ডুবে আছে, তারই মধ্যে কয়েকটি অযোগ্য মানুষ তাদের রাজ্যলিপ্সা আর স্বার্থ নিয়ে সংঘাত করে চলেছে তার ঊর্দ্ধে কেউ উঠতে পারেনি।

বলেন ভীমদেব।

—এই আত্মকলহ স্বার্থপরতা আর নীচতাকে এরা ভুলতে পারে নি।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ কঠিনকণ্ঠে বলেন।

—তাই এদের পরাজয় কেউ রোধ করতে পারবে না। আজ নয় ভবিষ্যতেও এই আত্মকলহ আর স্বার্থপরতা এদের মজ্জায় ঘূণ ধরিয়ে দেবে ভীমদেব, এর থেকে সারা জাতকে বাঁচাবার দায়িত্ব আমাদের সকলের, এ আমাদের কর্ত্তব্য।

তুমি দূত পাঠাও, বিশ্বস্তযোগ্য দূত। আর আজমীরের নরপতি ধর্মগজদেবকেও দেবতার নির্মাল্য আর আমার বাণী জানিয়ে দাও। শত্রুকে তিনিই নির্মূল করতে পারবেন।

ভীমদেব বের হয়ে গেলেন গঙ্গাসর্বজ্ঞকে প্রণাম জানিয়ে।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ তার ত্রিতলের অলিন্দ থেকে নীচে ওই দেবচত্বরের দিকে চেয়ে থাকেন, তখন মঙ্গল আরত্রিকের পর বন্দনা গান সুরু হয়েছে। কয়েকজন দেবদাসী নৃত্য নিবেদন করছে। ওপাশে বীণা বেণু মুরলী পাখোয়াজ সঙ্গত করে চলেছে যন্ত্রীদল।

ভোরের আলো আঁধারিতে দেবাদিদেবের মন্দিরে যথারীতি অনুষ্ঠান চলেছে।

শুভা ক'দিনই হ'লো এখানে আশ্রয় পেয়েছে। মন্দিরের মূল চত্বরের একদিকে পাথরের তৈরী দ্বিতল বিশাল একটি মহল পিছনে সমুদ্র। সেই মহলে কয়েকশো দেবদাসীর মধ্যে সেও এসে আশ্রয় পেয়েছে।

প্রথম প্রথম মনে পড়তো তার সেই উজ্জয়িনীর কথা।

রেবা নদীর তীরে শাল সেগুনের সবুজ সমারোহ, কূজন মুখর সেই প্রস্ফুটিত উপবনে সে প্রতীক্ষা করছিল একজনের জন্য, দেবশর্মার কথা সে ভোলেনি।

তরুণ সুঠাম একটি পুরুষ। শুভা তাকে ভালবেসে নিজেকে অনুভব করেছিল কতবড় দীন সে, রাজনটী শুভা সেদিন ভোজরাজসভার শ্রেষ্ঠা নর্তকী।। কত শ্রেষ্ঠী—তার পায়ের নীচে তাদের সবসম্পদ এনে উপঢৌকন দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তাদের দিকে ফিরেও চায়নি।

কিন্তু দেবশর্মার অবজ্ঞা আর অবহেলার বেদনা শুভার সারামনে নিদারুণ ব্যথা এনেছিল।

দেবশর্মা ও জানতো শুভার অন্তরের এই আকুতি কিন্তু তার করনীয় কিছুই নেই। তাই শুভাকে সে সবিনয়ে প্রত্যাখান করেছিল।

শুভা নিজের সব অতীতকে ভুলতে চায়।

তাই সব সম্পদ বৈভব ত্যাগকরেই সে চলে এসেছে এই দেবতার পদপ্রান্তে। তবু মন থেকে সবকিছু মুছে ফেলতে পারে নি।

এ তার নিজেরই অক্ষমতা, অপরাধ।

বহুবার মন্দিরের দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে নৃত্যের উদ্দাম ছন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু নিষ্ঠুর সত্যের মত স্মরণে এসেছে একটি মুখ, বলিষ্ঠ সুন্দর দেহ।

দেবতার সঙ্গে তার মনে ওই ছবিটা কেমন একাকার হয়ে যেতে চেয়েছে, শান্তি পায় নি সে।

মনে হয় এসব কথা আচার্যদেবকে খুলেই বলবে সে, জানাবে তার মনের এই বেদনার কথা তবু হয়তো কিছুটা ভার লাঘব হবে শুভার, এই ভেবেই এসেছিল সে গঙ্গাসর্বজ্ঞের কক্ষে।

এই সময় তিনি একা থাকেন, হঠাৎ তাঁর কক্ষের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল শুভা। গঙ্গাসর্বজ্ঞের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

তিনি চিন্তিত, যে কথা গুলো দেবশর্মার মুখে শুনে এসেছিল সে এখানে তারই ঠিক প্রতিধ্বনি শুনছে, কি একটা বিপদের করাল ছায়া এগিয়ে আসছে ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে, সোমনাথ মন্দির ও সেই বিপদের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবে না। তারই প্রতিরোধের আয়োজন চলেছে।

দেবশর্মার কথা মনে পড়ে। ভোজদেবের সেনাপতি, বিরাট বাহিনীর সর্বময় কর্তা। তাঁদের সাহায্য এঁরা চান একান্তভাবে।

জানে শুভা দেবশর্মা ও এমনি আহ্বানের প্রতীক্ষা করছেন। কার পায়ের শব্দ শোনা যায়, বেশ জানে শুভা এ গঙ্গাসর্বজ্ঞের পদধ্বনি নয় তিনি তো কাষ্ঠ পাদুকা পায়ে দেন।

একটা শ্বেতপাথরের থামের পাশে সরে দাঁড়াল শুভা। একটি সুন্দর সুপুরুষ মূর্তি দ্রুত পদক্ষেপে বের হয়ে গেলো কক্ষ থেকে, চুপকরে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে শুভা।

হঠাৎ কার ডাকে চমকে ওঠে।

—কে ওখানে ?

গঙ্গাসর্বজ্ঞ এই সময় ওকে এখানে দেখে অবাক হন, দেবদাসী শুভা, সেদিনের নবাগত একটি নটী।

—তুমি! এখানে ? এ সময় ?

শুভা স্তব্ধহয়ে যায় ওই কঠিন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটির সামনে এসে। গঙ্গাসর্বজ্ঞ বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলেন।

—তোমার যদি কোন বক্তব্য থাকে দেবদাসীমহলের কর্ত্রীকেই জানালে পারতে ?

শুভা মুখ তুলে চাইল। ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলে।

—একটা সংবাদ আপনাকেই জানাতে চাই।

—কি সে সংবাদ! সর্বজ্ঞের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

শুভা বলে চলেছে।

—এই বিপদের কথা ভোজরাজের সেনাপতিও জানেন। দেবশর্মা আপনার আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হযে আছেন। যদি তাকে স্মরণ করেন তিনি নিশ্চয় আপনার নির্দেশ পালন করবেন।

সর্বজ্ঞ ওকে স্থিরসন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখছেন। এসব তথ্য কোন দেবদাসীর কাছ থেকে তিনি পাবেন তা কল্পনাও করেননি।

—তুমি এসব তথ্য জানলে কি করে?

—ভোজরাজসভা থেকেই আমি এসেছি। দেবশর্মা আমাব পরিচিত। তিনিও দেশের এই বিপদ সমন্ধে চিন্তা করেন। যদি অনুমতি করেন আমি ও যোগাযোগ করতে পারি।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ ওকে বলেন।

—একথা ভেবে দেখি। দরকার হলে তোমায় স্মরণ করবো। শুভা ওকে প্রণাম করে মন্দিরের চত্বরের দিকে এগিয়ে যায়। গঙ্গাসর্বজ্ঞ তখনও চিন্তিতমনে কি ভাবছেন।

আজই সর্বত্র যোগাযোগ করার দরকার। তাঁদেব ও প্রস্তুত থাকতে হবে সব রকমে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য। মন্দির এবং সারা প্রভাসপত্তন রক্ষা করতে হবে। প্রাকারঘেবা নগরী আজ ওই দস্যুদলের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শূন্য রিক্ত মরুভূমি।

চারিদিকে বালির স্তূপ। কাঁটাগুল্মগুলো জন্মেছে, তাদের মধ্যে দুএকটা বাবলা গাছ এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

তারই বুক চিরে এগিয়ে আসছে সুলতান মামুদের সৈন্যদল। পরপর দুটো বাধা তারা উত্তীর্ণ হয়েছে। মুলতান লোহকোট মরুস্থলী তাদের হাতে এসেছে। তারা শীতপ্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা।

এই খররোদে লেলিহান মরুভূমির বুকচিরে এগিয়ে চলতে তাদের সবশক্তিটুকু যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসে। গরম বাতাস সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সূর্যের প্রখর তেজ তাদের ঝলসে দেয় মুখচোখ।

তবু এগিয়ে চলেছে তারা।

এপথের যেন শেষ নেই। মূলতান লোহকোট থেকে জুটেছে কিছু স্থানীয় বেকার লোকও। তাদের মাইনে দিতে হবে না। আপন খুশীতেই এসেছে তারা। লুটপাট করে পেয়েছে ঘোড়া নাহয় উট। আর কিছু অস্ত্রশস্ত্র।

তাদের রসদপত্র ও ওই ভাবে সংগৃহীত হয়েছে। তারাও এই লুণ্ঠনপর্বে যোগ দিয়েছে লুটের মালের বখরাদার হিসাবে।

দুপাশের বালিয়াড়ির মাঝে মাঝে এইবার পর্বতের রেখা দেখা যায়। ন্যাড়া পাহাড়। কোথাও তার সবুজ নেই। দু একটা গাছ মাথা তুলেছে ভয়ে ভয়ে, প্রকৃতির কঠিন শাসনে তারা স্তব্ধ। কুঁকড়ে গেছে অজানা ভয়ে। জলের সঞ্চয় কোথাও নেই।

রাত্রি নেমেছে। সারা শিবির স্তব্ধ। তবু রাতের বাতাসে সেই আগুনের তাপ কমে আসছে। পাহাড় মরুভূমির বুকথেকে একটু ঠাণ্ডার আমেজ আসে।

চারিদিকে তাঁবুর শ্রেণী তাকে ঘিরে সাবধানী প্রহরা রয়েছে।

সুলতান মামুদের চারিদিকে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি।

হঠাৎ কালো বোরখা ঢাকা একটি অশ্বারোহীকে আসতে দেখে প্রহরী বাধা দেয়।

অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে কি সঙ্কেত দেখালো। রাতের অন্ধকারে তার দুচোখ জ্বলছে।

প্রহরী পথ ছেড়ে দেয়, তাদের অন্যজন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে স্থলতানের পট্টাবাসের দিকে।

আজমীর রাজস্থানের একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। পৌরাণিক কালের মহারাজা অজ এর প্রতিষ্ঠাতা। মরুভূমির এক প্রান্তে আকাশছোঁয়া পাহাড়গুলো কালো মাথা তুলেছে, পাহাড়ঘেরা বেশ খানিকটা উপত্যকা। এখানে জল আছে, শস্যশ্যামল এর মৃত্তিকা।

পাহাড়ের কোলে বাঁধ দিয়ে এই পার্বত্য ঝরণাগুলোর জল আটকে বিরাট জলাধার গড়ে তোলা হয়েছে।

আজমীর সেই পাহাড় আর উপত্যকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সমৃদ্ধশালী নগরী।

এইখানে রাজপুত আর মুসলমানরা পাশাপাশি বাস করেছে। রাজাদের সম্পদের চিহ্ন এখানে ছড়ানো। প্রাসাদ পাহাড়ের উপর স্থরক্ষিত গড়, হিন্দুমন্দির গ্রন্থশালা সবকিছুই আছে।

পাহাড়ের গায়ে আছে দরগা মসজিদও। দুই ধর্ম পাশাপাশি বাস করে আসছে নির্বিরোধে।

এই মিলনের মাঝে স্থচতুর মাহমুদ এনেছে বিচ্ছেদের প্রয়াস। অর্থ দিয়ে সম্পদ দিয়ে আর প্রলোভন দেখিয়ে কিছু লোককে সে ইতিমধ্যেই হাত করেছে।

আজমীরের ধর্মগজদেব মহাপরাক্রমশালী রাজা। বিপুল তার সৈন্যসম্ভার। নিজেও তেমনি সাহসী।

স্থলতান মাহমুদ আজমীরের সব সংবাদই পেয়েছে। যতই খবর পেয়েছে ততই চিন্তায় পড়েছে স্থলতান। মূলতান জয় করেছে কেবল মিথ্যাছলনার আশ্রয় নিয়ে, লোহকোট ও সেইভাবেই হাতে এসেছে।

মরুস্থলীতে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাকে সত্য, কিন্তু সেতো একজন সামন্তরাজার সঙ্গে, দুর্গ অবরোধ করে মাত্র কয়েকশত সৈন্যকে হত্যা করতেই মাহমুদের সৈন্যদলের বেশ ক্ষতি হয়েছে।

সামনে তার চেয়েও বড় বাধা।

আজমীর সুরক্ষিত সহর। সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য।

তাছাড়া ধর্মগজদেবের অশ্বারোহী পদাতিক হস্তিবাহিনী ও আছে অনেক, সুলতান চিন্তায় পড়েছে!

তাঁবুর গালিচার উপর আলোর আভা পড়ে সারা জায়গাটা লাল হয়ে উঠেছে; মনে হয় সব যেন রক্ত স্রোতের আভাস। এতদূর এসে এখানে আঘাত পেয়ে ফিরে যেতে হবে?

কাকে ঢুকতে দেখে সুলতান ফিরে চাইল।

সেনাপতি হাসামখান্! আলি মস্নদ ও উঠে দাঁড়ায়। প্রবেশ করে কালো আংরাখা গায়ে একজন মুস্কিলআসান্। কালো কাপড়ের অন্তরালে দুটো চোখ যেন জ্বলছে।

গলায় একরাশ নীল লাল পাথর আর স্ফটিকের মালা।

—আজমীর থেকে আসছি জনাব। চিস্তীসাহেব আপনাকে দোয়া করুন।

জ্ঞানী মহাপুরুষ নিজামুদ্দিন চিস্তীর সমাধি মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান। শুধু মুসলমানই নয় হিন্দুরাও সেখানে তাদের প্রার্থনা জানাতে যায়। প্রণাম জানায় সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে। এরা সেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ঐক্য আজ নীচতা আর হীন স্বার্থের জন্য বোধহয় সবচেয়ে কলঙ্কিত করে তুলবার জঘন্য চেষ্টা করছে।

হাসাম খাঁ এগিয়ে আসে।

—আলিইয়াকুব!

হাসতে থাকে সেই মুস্কিল আসানরূপী আলি ইয়াকুব। ধূর্ত কৌশলী চর। এই বেশে আজমীরের পথে পথে নির্বিঘ্নে বিনা বাধায় ঘুরেছে, অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে।

—কি সংবাদ ?

সুলতান ব্যগ্রকণ্ঠে ওকে প্রশ্ন করে। আলি ইয়াকুব বলে চলেছে।

—নগরী রক্ষার ভার রাজা ধর্মগজদেব তার পুত্রস্থানীয় সৌদল চৌহানেব উপর দিয়ে মহারাজ নাগপর্বত উপত্যকায পুষ্করের দিকে এগিয়ে এসে তার ছাউনি ফেলেছেন।

সুলতান ভেবেছিল কোনরকমে কৌশলে এখানেও কার্য সিদ্ধ হবে, সে পথ পাবে। কিন্তু চৌহান রাজা ধর্মগজদেব তার দূতদের ফিরিয়ে দিয়েছে। তার এক সর্ত, সুলতান ফিরে যান আমিও কোন বাধাদোব না।

সুলতান আজ চিন্তায় পড়েছে।

উন্মত্ত সিংহের মত পায়চারী করছে সেই পট্টাবাসের ভেতর।

রাজা ধর্মগজদেব ও সংবাদ পেয়ে গেছেন। মরুস্থলীর সামন্ত ঘোঘাবাবার ছেলে সংগ্রাম সিং এসে গেছে এইখানে। কিন্তু সুলতানের তুর্ক-বেলুচি খোরাসানী অশ্বারোহীর দল এত দ্রুতগতিতে এসে যে মরুস্থলীর দুর্গ চূর্ণ করতে পারবে তা ভাবেন নি ধর্মগজদেব।

তাই ওখানে আর কোন সাহায্যই পাঠাতে পরেন নি। বাধা দেবার অয়োজন করেছেন পুষ্কর প্রান্তরে। এদিকে ওদিকে চারিদিকে তিনিও দূত পাঠিয়েছেন, সংগ্রাম সিংহকেই বলেন তিনি।

—এ যুদ্ধ যদি বিস্তার লাভ করে তার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। কিছু মিনা সৈন্য, ভীল যোদ্ধা রাজপুত তুমি সঙ্গে নাও, গুজরাটের সোলাঙ্কিত রাজ আমার শ্যালক, অর্বুদ রাজ আমার

ভ্রাতুষ্পুত্র, এঁদের ও সংবাদ দিয়ে তুমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে সুলতানকে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে এসো।

সংগ্রামসিং ঘোষবাবার যোগ্যপুত্র। তার বাবা বৃদ্ধ বয়সেও সুলতান মামুদকে বাধা দিয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। সেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আজও নেওয়া হয়নি।

সংগ্রামসিংহ এই পুষ্করের যুদ্ধে তারই প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু ধর্মগজদেব বলেন।

—তার সময় এখনও যায়নি সংগ্রাম সিং, আমি তোমাকেই সেই যোগ্য ব্যাক্তি মনে করি, যে একক প্রচেষ্টায় সুলতান মামুদকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে। তাই এই সুযোগ দিচ্ছি তোমায়। তুমি পরবর্তী আক্রমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। দেরীকরার সময় নেই। তুমি তোমার কাযে এগিয়ে যাও।

আজমীর সম্ভর প্রভৃতি এলাকা নিয়ে গঠিত সফাদলগ্ন রাজ্য থেকে এসেছে বিশ্বস্ত ভীল এবং জাঠযোদ্ধা আর মিনা সর্দারবৃন্দ। এরা রাজপুতদের মতই সাহসী, কৌশলী বীব।

ধর্মগজদেবের সৈন্যবাহিনী পুষ্করতীর্থের প্রবেশদ্বারের মরুভূমিতে পথরোধ করে ছাউনি ফেলে সুলতানের জন্য অপেক্ষা কবছে।

পিছনে নাগপর্বত শ্রেণীর বুকে গাছ গাছালিগুলো মাথা তুলেছে, পাহাড়ের কোলে নীলজলভরা পবিত্র পুষ্কর হ্রদ, তার চারি দিকে গড়ে উঠেছে নগরী, দুপাশে দুইটি পর্বতের সীমারেখা এসে শীর্ষ বিন্দুতে শেষ হয়েছে আকাশের অসীমে।

একটা গায়ত্রী পর্বত। অন্যটি সাবিত্রী।

ছায়ানামা সবুজ পর্বতসীমান্তে ওই পুণ্যতীর্থকে-ঘিরে রেখেছে তারা।

ভগবান ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল এই পুষ্কর। স্বর্গথেকে ব্রহ্মা একটি নীল-কমল ফেলেছিলেন, সেটি নাকি এই খানে পড়ে এই হ্রদের সৃষ্টি করে।

এই যজ্ঞকে কেন্দ্র করে একটি করুণ ব্যর্থতার কাহিনী ও মিশিয়ে আছে। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানের সময় আহুতি দিতে হয়। যখন পূর্ণাহুতির লগ্ন সমাগত তখন ব্রহ্মার স্ত্রী সাবিত্রী অতিথি ঋষিপত্নীদের পরিচর্যায় ব্যস্ত, এদিকে যজ্ঞের লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখন ব্রহ্মা কুপিত হয়ে একটি গোপকন্যাকে শুদ্ধি করে স্ত্রীরূপে বরণ করে নিয়ে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেন।

সাবিত্রী দেবী এসে দেখেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

তাঁর স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেছেন। মনের দুঃখে সেই পতিব্রতা নারী নাকি এই অত্যুচ্চ পর্বতশীর্ষে গিয়ে কঠিন তপস্যায় আত্মত্যাগ করেন। সেই থেকে এই সাবিত্রী পর্বতশীর্ষ একটি পুণ্যস্থান।

ব্রহ্মামন্দিরের চূড়ায় ঘণ্টা বাজে। নীরব আতঙ্কের মাঝে ডুবে গেছে সেই পাহাড়ঘেরা ক্ষুদ্র জনপদ, ওই ঘণ্টার শব্দ তবু তাদের অন্তরে একটি আশ্বাস আনে।

সুলতান কোন পথ পায়নি, তাই তাকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। এ যেন কঠিন শিলাখণ্ডের উপর দুর্বার এক জলস্রোত এসে আছড়ে পড়ছে।

সুলতান সমস্ত সৈন্য সেনাপতিদের সাহস দেয়, দুর্বার সাহসী একটি ব্যক্তি। একজনের কাছে তবু তার মনের সব দুর্বলতা কোথায় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সে ওই মিনাবাঈ।

মিনা ও এ নিয়ে অনেক ভেবেছে। মরুস্থলীর যুদ্ধের পর তার মন সুলতানের পৈশাচিক নৃশংসতায় বিরক্ত হয়ে উঠেছে। মাহমুদ যেন একটা দৈত্য, চোখের সামনে দেখেছে একটি মহিয়সী নারীর অগ্নিকুণ্ডে জীবনদান। ইজ্জতকে দেখেছে তারা প্রাণের চেয়ে বড় করে।

আর মিনা !

নিজের উপর নিজেরই ঘৃণা আসে।

সুলতান বলে—আমাকেও ঘৃণা কর মিনা ?

—করি। সারা মন দিয়ে ঘৃণা করি।

—তবে এখানে আছো কেন ?

মিনা ওর দিকে চাইল। ক্ষণিকের জন্যও সেই নারী আজ স্পষ্ট কঠিন কণ্ঠে জানায়।

—আমি বন্দী, বন্দী নারীর সঙ্গে সুলতানের পরিহাস শোভা পায় না। সুলতান জবাব দেয়।

—ইচ্ছা করলেই ফিরে যেতে পারো ?

—কোথায় যাবো ? একবার যে নারী বিধর্মীর হাতে বন্দী হয়, আমাদের সমাজে তার আর ঠাঁই নেই। তুমি আমার সব লুণ্ঠন করেছে, এতটুকু আশ্রয়ও আজ আমার নেই।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মিনা। স্তব্ধ সুলতান। অনেক বাঁদীকেই দেখেছে সে। জানে তাদের ভোগের বস্তু হিসাবেই। হারেমে যারা আছে তাদেরও দেখেছে। কিন্তু এ নারী সম্পূর্ণ বিচিত্র।

হিন্দুস্থানের মাটির মতই এর রহস্য অজানা। মিনা বলে।

—আমার মৃত্যু ছাড়া পথ নেই।

চোখের সামনে সুলতান দেখে ও যেন তামাম হিন্দুস্থানকে এমনি কয়েদী করতে চায়। মিনা তারই নমুনা মাত্র।

সরে গেল সুলতান। অসহায় একটি নারী আজ কাঁদছে।

মিনা তবু বেঁচে আছে।

কেন ? কি আশা নিয়ে বেঁচে আছে সে তা নিজেই জানে না। মনের মাঝে অনেক দ্বন্দ্ব অনেক দ্বিধা জেগেছে বারবার। একটা মন হয়ে উঠেছে ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ ; তার যে সর্বনাশ করেছে

তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবে, অন্যমন নিভৃতে কোথায় এতটুকু স্বপ্ন কল্পনা করে।

বিচিত্র স্বার্থপর একটি নারীমন। জীবনে তার আর কোন ঠাঁই নেই।

একবার সে পথ হারিয়েছে। সেই হারানো পথেই তাকে শান্তি খুঁজে নিয়ে জীবনকে সহনীয় করে তুলতে হবে।

তাই হয়তো রয়ে গেছে মিনা। চোখের সামনে বিচিত্র একটি ভ্রামামান জীবনের ছবি ফুটে চলেছে। ভারতের অসীম রুক্ষতা আর বেদনাকে সে দেখেছে।

পুষ্করতীর্থের পাহাড়ে পাহাড়ে ভোরের আলো সবে দেখা দেয়, জেগে উঠছে ছবির মত সেই হ্রদ সেই হর্মমালা। ধূ ধূ বালির হলুদ বুকে কুয়াসার ফিকে আভাস তখনও মিলোয় নি, এমন সময় তুরীধ্বনি শোনা যায়।

আসগারী খোরাসানি বেলুচ সৈন্যদল আক্রান্ত হয়েছে, পাহাড়ের চারিদিক থেকে ওরা আক্রমণ সুরু করেছে সুলতানের বাহিনাকে। মিনাসর্দার আর ভীলের তীর কতখানি জোরালো তা আগেই মরুস্থলীতে টের পেয়েছে সুলতান।

আবার তারাই হাজারো তীর ছুঁড়ে চলেছে। সংখ্যায় অনেক বেশী, আর চারিদিকে পর্বতশ্রেণীর উপর থেকে তারা আক্রমণ করেছে, সুবিধাই পেয়েছে তারা।

সুলতান এবার পূর্ণবেগে সামনের পদাতিক সৈন্যের বূ্যহের দিকে অশ্বারোহী দল চালাবার মনস্থ করে।

কিন্তু ঢাল আর বর্শা দিয়ে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরী করেছে রাজা ধর্মগজদেব। দুএকবার সেই ব্যূহ ভেদ করবার চেষ্টা করে খোরাসানী সৈন্যরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

বিষাক্ত তীরের আঘাতে ঘোড়াগুলো পড়ে যায় ছটফট করে মৃত্যুযন্ত্রণায়। সৈন্যরাও নিহত হয়ে চলেছে।

এদিকে তীরন্দাজ সৈন্যরা পাহাড়ের দিকের আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত। হাসাম আলি তার সৈন্যদল নিয়ে আর একপাশে আক্রমণ চালাতে মনস্থ করে।

আজ সুলতান নিজে একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে শিরস্ত্রাণ বর্ম পরিহিত অবস্থায় সৈন্য চালনা করছে। এই যুদ্ধের উপরই তার ভাগ্য নির্ভর করছে।

কিন্তু নিরাশ হয়েছে সুলতান।

হিন্দুস্থানের সৈন্যদের এমনি বিরাট সমাবেশ আর এমনি যুদ্ধ কৌশল, বীরত্ব সে এর আগে দেখেনি। এর আগে ও বহুবার উত্তর ভারতে এসেছে সুলতান। কিন্তু অতর্কিতে হানা দিয়ে যা পেয়েছে লুটপাট করে নিয়ে ফিরে গেছে। এমনি যুদ্ধক্ষেত্রে কোনদিন মুখোমুখী দাঁড়ায়নি ওদের সামনে।

হর হর মহাদেব!

কলগর্জন ওঠে, এদের সৈন্যদের রণ কোলাহল তাতে চাপা পড়ে যায়। কাতারে কাতারে ওরা হানা দিয়েছে। ওপাশে হাসাম খাঁ ও আক্রমণ করেছে সৈন্যদল নিয়ে, নোতুন তেজি খোরাসানী সৈন্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বেলা দ্বিপ্রহর।

রোদের তেজে তাদের সারা শরীর জ্বলে উঠেছে, জল ও নেই পর্য্যাপ্ত। তবু কি এক উন্মাদনায় সুলতানের সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে।

ধর্মগজদেব কৌশলী যোদ্ধা. তিনিও এটা চেয়েছিলেন। মাহমুদের সৈন্যদের কৌশলে পাহাড়ের উপত্যকার মধ্যে টেনে আনতে চান পিছু হটে। উপত্যকার একপ্রান্তে সাবিত্রী এবং গায়ত্রী পর্বত মধ্যে ওই টুকুই বের হবার পথ।

দুর্বার গতিতে ওরা এগিয়ে আসছে, সুলতান মামুদ প্রত্যক্ষ করেছে জয় তার অবশ্যম্ভাবী,·· হঠাৎ জয় কোলাহল আর্তনাদে পরিণত হয়। মামুদের সৈন্যদল এমনি বিপদের সম্মুখীন হয়নি কখনও।

ধর্মগজদেব সৈন্যকে সুবিধার মধ্যে এনে এইবার সুশিক্ষিত হস্তীবাহিনীকে কাযে লাগিয়েছেন। কালো কালো পর্বত সমান প্রাণীগুলো কঠিন নিষ্পেষনে অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনীকে দলে পিষে চেপ্টে দিয়ে চলেছে।

ভীত অশ্বদল প্রাণভয়ে আরোহী ফেলে পালাচ্ছে, কারোও রেকাবে পা আটকে গেছে, সেই অবস্থাতেই ঝুলন্ত আরোহীকে পাথর ঠুকে থেঁতলে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে ঘোড়াগুলো।

মাহমুদকে আক্রমণ করেছে রাজপুত বাহিনী। তাদের তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে সুলতানী সৈন্যদল প্রাণদিয়ে চলেছে, কে একজন লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে সুলতানের দিকে। সেনাপতি মসুজদ এগিয়ে এসে ওর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তবু প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়ে সুলতান।

ঘোড়াটা সরে গেছে। সৈন্যদল সুলতানকে ঘিরে ফেলে কোনরকমে শত্রুব্যূহ থেকে বের করে আনে।

তাতেই নিহত হয় আরও অনেক সুলতানী সৈন্য।

রণক্ষেত্রে তখন মৃত্যুর তাণ্ডব চলেছে।

মুক্তির কোন পথ নেই। সুলতান মাহমুদ যে এমনি করে নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়বে ভাবতে পারেনি। দুই পাহাড়ের মধ্যে স্থানটুকুই একমাত্র বার হবার পথ, কিন্তু সেদিকে ওই হস্তী বাহিনী এসে হানা দিয়েছে।

হাসাম খাঁ ও আহত, মসজদ খাঁ ও আপ্রাণ চেষ্টা করে পলায়মান সৈন্য বাহিনীকে পিছু ফেরাতে পারে না। প্রাণভয়ে তারা এগিয়ে

চলেছে ওই মুক্ত জায়গাটার দিকে আর দলে দলে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে।

মসজদ খাঁ বলে।

—সন্ধির প্রস্তাব করতে রাজী হ'ন সুলতান।

—যদি ধর্মগজদেব রাজী না হ'ন ?

—ক্ষমা হিন্দুদের ধর্ম। ধর্মগজদেব খাঁটি হিন্দু, চৌহান রাজপুত। পরাজিত শত্রুকে তারা ক্ষমা করে।

সুলতান আর মুক্তির কোন পথ দেখে নি। মনে হয় এই বেড়াজাল থেকে আর মুক্তি পাবে না। কোনদিনই ফিরে যাবে না গজনীর সেই পপলার পাইনঘেরা উপত্যকায়। আপন মনেই বলে।

—পরাজিত হয়ে ফিরতে হবে ?

—তবু এ যাত্রা বেঁচে থাকলে পরে চেষ্টা করে দেখা যাবে। সন্ধির প্রস্তাবই পাঠান।

সুলতান পাঞ্জাছাপ দিয়ে সন্ধি পত্র তৈরী করে দেয়।

ধর্মগজদেব ইচ্ছা করলে শত্রুকে সেই পাহাড় ঘেরা উপত্যকার মধ্যে পিষে শেষ করে ফেলতে পারতেন। অপরাহ্নের ম্লান আলো নেমেছে পর্বত সানুদেশে। চারিদিকে অগণিত তুর্কী—খোরাসানী বেলুচ সৈন্যর মৃতদেহ। রক্তাক্ত মৃত্তিকা।

এই পরিবেশে সন্ধির প্রার্থনা আসতে ধর্মগজদেব জানান।

একমাত্র সর্ত হচ্ছে সুলতান এখান থেকেই দেশে ফিরে যাবেন। আমার সৈন্যরা কেউ তাকে বাধা দেবে না। এই একটি মাত্র সর্তে সন্ধি হতে পারে।

সুলতান মাহমুদের সামনে আর কোন পথ নেই। সুলতান তাতেই সম্মত হতে বাধ্য হয়েছে।

রাত্রি নেমেছে। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নেমে আসে একটা থমথমে ভাব। আহত সৈন্যদের কাতর আর্তনাদ শোনা যায়।

মাহমুদের সব আশা এখনি করে ব্যর্থ হয়ে যাবে কোনদিনই তা কল্পনা করেনি সুলতান।

মাথা নীচু করে দেশে ফিরতে হবে। সারা ভারতবর্ষ জানবে সুলতান মাহমুদ অনেক আশা নিয়ে এসেছিল ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করতে, মাথা নীচু করে বিতাড়িত কুকুরের মত ফিরে যেতে হয়েছে তাকে।

রাত্রি নেমেছে। ক্লান্ত সৈন্যদল ও আজ হতাশ হয়ে পড়েছে।

পথে যারা লুটের মালের বখরা পাখার জন্য জুটেছিল, সেই সব সখের সৈন্যরা অনেকেই সরে গেছে, অনেকে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে।

সুলতানকে কাল সকলেই এখান থেকে ছাউনি তুলে ফিরে যেতে হবে।

রাত গভীরে হঠাৎ কাকে আসতে দেখে মসজুদ খাঁ এগিয়ে যায়! কুনিশ করে ঢুকছে আলি ইয়াকুব। প্রথমে চেনা যায় না তাকে। মাথায় বিরাট এক রাজপুতদের ঢং এর পাগড়ী বাঁধা, কপালে রক্ত চন্দনের ছাপ; পরণে মেরজাই চোস্ত একেবারে গেঁইয়া রাজপুতের মতই, মেরজাই এর উপর ঝুটো মুক্তোর মালা। হাতের আঙুলে কটা পাথর বসানো আংটি।

আলিইয়াকুব এখানে অনেকদিন আছে। সুলতান মাহমুদের বিশ্বাসী অনুচর। সাপের চেয়েও ক্রুর আর শৃগালের চেয়ে হিংস্র আর শকুনির চেয়েও সন্ধানী।

সুলতানকে কি বলে চলেছে আলি ইয়াকুব।

সুলতানের দুচোখ জ্বলে ওঠে দুর্বার জ্বালায়। তার কাছে কোন কিছুরই দাম নেই। পশুর ও অধম সে।

ধর্মগজদেবের কার্য সিদ্ধ হয়েছে।

তিনি কারো রাজ্য দখল করতে চাননি, কোন অত্যাচারই করেন নি। শুধু চেয়েছিলেন সুলতান মাহমুদকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে। তার জন্য রক্তপাত যতটুকু করার দরকার হয়েছিল করেছেন মাত্র।

পরাজিত সুলতান ফিরে যাবে কাল প্রত্যুষে।

আবার শান্তি নামবে ভারতবর্ষে।

ভোর হতে আর দেরী নেই।

নিস্তব্ধ শিবির। সামান্য সৈন্য প্রহরায় রয়েছে। বাকী সকলে নিশ্চিন্ত বিশ্রামে রত।

ধর্মগজদেব ব্রাহ্মমুহূর্তে পুষ্কর হ্রদে স্নান পূজা সমাপন করতে চলেছেন, সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী।

হঠাৎ হ্রদের তীরের নিজন স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ছায়ামূর্তির মত এসে উপস্থিত হয় মূর্তিমান দানব সুলতান মাহমুদ। অতর্কিতে নিরস্ত্র রাজাকে আক্রমণ করে চকিতের মধ্যে তাকে নিহত করে। ওদিকে সুলতানী সৈন্য ও দুর্বার বিক্রমে রাজা ধর্মগজদেবের শিবির আক্রণ করেছে।

ভীত চকিত সৈন্যদল হাতের কাছে যা অস্ত্র পেয়েছে তাই নিয়েই আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ওদিকে শিবিরে আগুন জ্বলে ওঠে। আগুন দেখে ত্রস্ত হস্তী বাহিনী খোলা অবস্থায় উন্মত্ত হয়ে ইতঃস্তত ছুটোছুটি করতে থাকে।

চারিদিকে বিশৃঙ্খলা।

ধর্মগজদেবের মৃত্যুসংবাদ হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

সুলতানী সৈন্যের রণহুঙ্কারে প্রভাতের আকাশ কেঁপে ওঠে। হ্রদের নীলজলরাশি রক্তবর্ণ ধারণ করে ধর্মগজদেবের সৈন্যদের রক্তে।

সন্ধি তার সব সর্ত রাতারাতি উলটে দিয়ে দানব সুলতান মামুদ আজ উন্মাদ লোভে পৈশাচিক নৃশংসতায় জেগে উঠেছে। প্রভাতের প্রথম আলোর লাল আভা আজ সারা উপত্যকাকে রক্ত রাগে রঞ্জিত করে তোলে।

সুলতান আজ যুদ্ধে জিতেছে। রাতারাতি সে সবকিছু ধর্ম মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করে নোতুন উদ্যমে এগিয়ে চলে পর্বতসীমা পার হয়ে আজমীরের দিকে।

মাত্র কয়েক ক্রোশ পথ, বনসীমার পর পাহাড় শ্রেণী, তার ওপারে আজমীরের সুজলা সুফলা উপত্যকা। পর্বতের গায়ে সমৃদ্ধ প্রাকার নগরী আজমীর। পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ধর্মগজদেবের দুর্গম গড়। তার নীচেই পীরের সমাধি

আজমীরেও সংবাদ এসে পৌচেছে, ধর্মগজদেবের মৃত্যুসংবাদ। সৈন্যদল পরাজিত ছত্রভঙ্গ। সহর রক্ষার ভার ছিল সৌদল চৌহানের উপর। সৌদলের পিতা ছিলেন ধর্মগজদেবের মন্ত্রী, সেই জন্য সৌদলের সঙ্গে ধর্মগজদেবের নিবিড় পরিচয়। সৌদলের মনে মনে একটা লোভই ছিল। কৌশলে ধর্মগজদেবকে সরিয়ে নিজেই সে রাজা হবে। আজ সেই সুযোগ সমাগত।

সৌদল জানে সুলতান মুহামুদ এখানে থাকবে না। তার লক্ষ্য অর্থ আর সম্পদের দিকে। আজমীরের সিংহাসন তারই থাকবে।

তাই খুশীমনে সেদিন সুলতান মাহমুদের সম্বর্দ্ধনা জানাবার আয়োজন করে সে, তাকে বাধা দেবার কোন ইচ্ছাই তার নেই।

উদ্ধত লুব্ধ সুলতানী সৈন্য আজ উন্মাদ কলরবে সমৃদ্ধ সহর আজমীরে প্রবেশ করে যথেচ্ছা লুণ্ঠনপর্ব আর অত্যাচার চালাতে থাকে বিনা বাধায়।

সুলতান মাহমুদ ও এমন সমৃদ্ধশালী নগরী দেখেনি, রাজকোষে প্রভূত অর্থ স্বর্ণ মণি মুক্তা, সৌদল ও করযোড়ে তাকে সমর্দ্ধনা জানায়।

আলি ইয়াকুবের জন্যই এই যুদ্ধে জিতেছে সুলতান। তাকে পুরস্কার দিতে হবে। অথচ আজমীরের সিংহাসন মাত্র একটি। তাই সুলতান মাহমুদই এই সমস্যার সমাধান করে অতি সহজেই।

সৌদলের সব আশা নিশেষ হয়ে যায়। সুলতানের তরবারির আঘাতে তার ছিন্ন মুণ্ড মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আজমীর সহর সুলতান মামুদের দখলে এল। সহরে তখনও উন্মাদ সৈন্যদলের লুণ্ঠন পর্ব চলেছে।

গ্রন্থাগার রাজার প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র পাঠশালা তারা ধ্বংস করে তার উপরেই গড়ে তোলে এই জয়ের চিহ্ন স্বরূপ নোতুন মসজিদ। সুন্দর কারু কার্য করা থাম দেওয়াল গুলো ভেঙ্গে ফেলা হল. ছাদ ফেলে তৈরী হল আড়াইদিনের মধ্যে মসজিদের মিনার।

আজমীর সহরের রূপ বদলে যায় ক'দিনের মধ্যেই।

সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছিল মিনাবাঈ।

পুষ্করের সেই যুদ্ধশিবিরে দেখেছিল সুলতান মামুদের কোণঠাসা অবস্থা, মনেমনে খুশীই হয়েছিল সে।

তবু একটা দানবকে ভারতবর্ষের একজন নরপতিই শায়েস্তা করেছে। কিন্তু এমনিকরে যে পাশার দান উলটে যাবে ভাবেনি।

কদিন মরুভূমির বুকে ওই রোদের তাপেই কেটেছে, আহার্য যা জুটেছিল তা বিজাতীয় খাদ্য। মিনাবাঈ শুধু তন্দুরের রুটি আর শক্কর চিবিয়ে দিন কাটিয়েছে।

তবু এদের সঙ্গেই এসেছে সে। মনে মনে খুশী হয়েছিল ওই রক্তাক্ত পরাজয় দেখে।

আজমীরের কৃত্রিম সরোবরের তীরে পর্বত শিখরের রাজপ্রাসাদে আজ মিনাবাঈ আশ্রয় পেয়েছে। এত গ্রীষ্মেও ওই বিস্তৃত সরোবরের জল কণা সিক্ত আর্দ্র বাতাস তৃপ্তির আভাস আনে। ওদিকে পাহাড়ের গায়ে জনপদে তখনও আগুন জ্বলছে।

নীল আকাশছোয়া পর্বত শ্রেণীর বুক যেন ব্যর্থ জ্বালায় জ্বলছে দিন রাত্রি, আকাশ বাতাসে ভেসে আসে দূরাগত কাতর আর্তনাদ আর বিলাপের সুর।

হাসির শব্দে চমকে চাইল মিনাবাঈ।

সুলতান মাহমুদ ঢুকছে ওই সুন্দর জাফরি ঘেরা শ্বেতপাথরের কক্ষে। বাতাস অগুরুর গন্ধে আমোদিত।

সরোবরেব নীলজলে দিনের শেষ আলোয পাখীগুলো কলরব করছে, ডানা মেলে তারা উড়ে চলেছে আকাশে।

মিনাবাঈ ওর দিকে চাইল। দুচোখে তার ঘৃণা আব জ্বালার চিহ্ন পরিস্ফুট।

—খুব খুশী হওনি বাঈ?

মিনাবাঈ জবাব দেয়।

—মানুষের পশুত্ব দেখলে ঘৃণাই জন্মে সুলতান।

—তাই আমাকে ঘৃণা করো?

—কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

হাসছে সুলতান।

—তোমার সাহস দেখে খুশী হয়েছি। ভয় করোনা তুমি আমায়? সারা ভারতের ত্রাস আমি—

মিনা জবাব দেয়।

—তারা সুলতানের অন্তরটিকে চেনেনা। আমি দেখেছি—জেনেছি। হৃদয় বলে তার কোন বস্তুই নেই। খড়গোঁজা একটা মানুষ, তার মনে শুধু লোভ আর হিংসাটাই আছে।

ভালবাসা—মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম-কিছু তার নেই। তাকে আমি ভয় করি না, অনুকম্পা বোধকরি তার জন্য।

—অনুকম্পা কর তুমি!

—হ্যাঁ। ভগবানকে বলি এতকিছু দিয়েছো তাকে, ওর অন্তরে একফোঁটা ভালবাসা দিও, ও সম্পূর্ণ মানুষ হবে। নইলে ও তোমার অসমাপ্ত সৃষ্টিই থেকে যাবে।

—খোদাতালার অসমাপ্ত সৃষ্টি আমি!

সুলতান মাহমুদ নিজের মধ্যে নিজেকে পাবার কোন চেষ্টাই করেনি। চেয়েও দেখেনি মানুষ কি চায়—কি নিয়ে বাঁচতে পারে। তার চাই নাম, ধন দৌলত খ্যাতি। জগতের কাছে সে হবে ত্রাসের বস্তু। কিন্তু মিনার মত একটী মেয়ের মুখে এসব কথা শুনে অবাক হয় সে।

হাসতে থাকে, উদ্দাম পৈশাচিক হাসি। হাসি থামিয়ে বলে।

—উত্তম, খোদাতালার কাছে ওই দোয়াই মাগো মিনা। আমার সময় নেই। তোমাদের ভগবানের সঙ্গে অবশ্য আমার সাক্ষাৎ হবে।

—কোথায়! অবাক হয় মিনাবাঈ:

—সোমনাথ মন্দিরে। সেদিন তোমার ভগবানকে এই বান্দা বলবে নিজেকে বাঁচাও তুমি। তারপর দুনিয়ার লোকের কামনা পূর্ণ করো।

—সুলতান! মিনা চমকে ওঠে।

হাসছে একটী দানব। কঠিন কণ্ঠে বলে।

—সেদিন সে নিজেকে বাঁচাতে পারবেনা। তোমার সব বিশ্বাসভঙ্গের জবাব দোব সেই দিন বাঈ! ততদিন তোমাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে আমারই সঙ্গে। দেখবে যে বিশ্বাসের উপর

তোমাদের ইমারৎ গড়ে তুলেছো তা ঝুট। বিলকুল ঝুট। দৌলত। দৌলতই দুনিয়ায় সার বস্তু। এই দৌলত দিয়ে আমি তামাম হিন্দুস্থানের লোকদের কিনে নোব। তারাই আমাকে পথ দেবে, সোমনাথে যাবার পথ। তোমার ভগবানও আমাকে রুখতে পারবে না।

—শয়তান!

মিনা অসহায় রাগে ফুলছে। সুলতান হাসি থামিয়ে বলে,—রাগ করলে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায় বিবি। তুমি সত্যই সুন্দর তবে বিলকুল বেয়াকুফ্।

বালুকারাম সেই বুদ্ধিটা বের করে।

চামুণ্ডারায়কেও হাতে করা দরকার, তার জন্য বখরা তাকেও কিছু দিতে হবে সত্যি, কিন্তু কায করা সহজ হবে।

চামুণ্ডা রায় নিরীহ লোক। সারা জাবন ওই পদেই কায করে এসেছে। তবু সিংহাসনের দিকে তার দৃষ্টিছিল, কিন্তু ক্ষমতা নেই বলেই ওটার দিকে বিশেষ লোভ করেনি।

বালুকারাম জানে চামুণ্ডারায়কে লোভ দেখালে সে রাজী হবে, শেষকালে সময় এলে চামুণ্ডারায়কে সরাতে তার বেশী সময় লাগবে না। নিজেই তখন গুর্জর সিংহাসন দখল করে নেবে।

রাত্রি গভীর।

স্তব্ধ রাত্রি। বিরাট প্রাসাদের উদ্যানে রাতের অন্ধকার নেমেছে, বাতাসে জাগে রাতজাগা ফুলের সুবাস।

চামুণ্ডা রায় স্তব্ধ হয়ে বালুকারামের কথাটা শুনে চলেছে।

কি যেন স্বপ্ন দেখছে সে। ভীমদেবকে পরাজিত করে সরিয়ে দিয়ে সে নিজে বসেছে সিংহাসনে। মাথায় রাজ মুকুট—হাতে রাজদণ্ড। ছবিটা মনেমনে কল্পনা করেও তৃপ্তি পায় চামুণ্ডা রায়। কিন্তু পরক্ষণেই ভীরু মন শিউরে ওঠে।

—যদি এসব কথা প্রকাশ পায় বালুকারাম?

ধূর্ত বালুকারাম ওই অর্দ্ধস্থবির লোকটার মুখচোখে লালসার ছায়া দেখেছে। ওর লোভীমনের মাঝে ঝড় তুলেছে সে।

বালুকারাম অভয় দেয়।

—কাকপাখীতে টের পাবেনা।

তবু চামুণ্ডারায় বলে,

—এ অন্যায়। বিধর্মীকে সাহায্য করবো আমার মাতৃভূমি আক্রমণ করতে?

হাসে বালুকারাম।

—নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন অনেক কিছুই করতে হয়। তাছাড়া এতো যুদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় বোধ রাখলে সৈনিকের চলেনা। পরে রাজা হয়ে দেশে দান ধ্যান কিছু করবেন—আবার নোতুন করে মন্দির গড়ে তুলবেন, লোকে ধন্যি ধন্যি করবে।

চামুণ্ডারায় জানে সুলতানের আক্রমনের উদ্দেশ্য।

—কিন্তু সেই দানব ওই সোমনাথদেবের মন্দির ধ্বংস করতে আসছে। বালুকারাম জবাব দেয়।

—আসুক না, পারেন তো সোমনাথদেবই তাকে হটাবেন। না পারেন মন্দির ধ্বংস করে কিছু লুটপাট করেই সে আবার দেশে ফিরে যাবে। এই সুযোগে সিংহাসন নিষ্কণ্টক করে আমরা ভবিষ্যতে এই দেশের সর্বময় কর্তা হবো। আপনি হবেন গুর্জররাজ—

—সত্যি। চামুণ্ডা রায়ের কণ্ঠে লোভ আর লালসার সুর।

রাতের অন্ধকারে কোথায় একটা পেচক ডেকে উঠল। সুপ্ত চারিদিক। তারই ফাঁকে জেগে আছে দুটি প্রাণী, তাদের চোখে মুখে জৈবিক নিষ্ঠুর লালসা।

চারিদিকে সাহায্যের জন্য আবেদন নিয়ে দূত চলেছে।

অবন্তীরাজ ভোজ, অবুদপর্বতের পারমার রাজ, অনহীলহারা পত্তনের যুবরাজ, ভৃগুকচ্ছের সামন্তরাজ সকলের কাছেই।

রাজা ভীমদেব নিজের স্বাক্ষরিত চিঠি দিয়েছেন তাঁদের। তারা এই বিপদকালে যে যেভাবে পারেন যেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে এইখানে সমবেত হন।

তীর্থ যাত্রী—পথিক—শ্রেষ্ঠির দল ও গুজরাট-জুনাগড়-রাজস্থান মহাসেনার দিকেদিকে এই আবেদন জানিয়ে চলেছে।

মরুপ্রান্তর ভেদ করে চলেছে অশ্ব। চারিদিকে গুল্ম বিহীন প্রান্তর, মাঝে মাঝে ভেরেণ্ডা আর কাঁটা গাছের বন। কতকাল এ প্রান্তরে বৃষ্টি নামেনি কে জানে, লাল ধুলোর পুরু আচ্ছাদন জমেছে ওই কাঁটাগাছ আর পাতাগুলোর উপর। ওরই আশপাশে বন্যময়ুরের দল ঘুরে বেড়ায় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে খাবারের সন্ধানে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে তারা সচকিত হয়ে এদিক ওদিক উড়ে গেল। একটি তেজী ঘোড়া পড়ে দাপাচ্ছে, কোনরকমে উঠে পড়ল সে। কিন্তু তার আরোহী আর উঠল না।

তার বুকথেকে তাজা রক্ত বের হচ্ছে, উষর মৃত্তিকা ভিজে গেল!

একদল লোক সেই কাঁটাগুল্মের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে নিহত লোকটার বগলবন্দী পিরানের ভিতরের পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে নেয়।

অবন্তীরাজ ভোজের কাছে উনি চলেছিলেন গঙ্গাসর্বজ্ঞ এবং ভীমদেবের স্বাক্ষর করা আবেদন পত্র নিয়ে।

ধূ ধূ প্রান্তরে শূন্যতা নামে। বালুকারাম ওই একখানা রক্তাক্ত চিঠি হাতে নিয়ে শাসায় সেই অনুচরকে।

—মাত্র তিনজন দূতকে হত্যা করতে পেরেছিস? বাকী গুলো? লোকটা জবাব দেয়।

—তাদের কাছ থেকেও সব মাল ফেরৎ পাবেন সেনাপতি। বালুকারাম গোপনে গোপনে ভীমদেব আর গঙ্গাসর্বজ্ঞের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে চায়। অবন্তীরাজ ভোজদেবকে সকলেই সমীহ করে। তাঁর পরাক্রম ভারতের মধ্যে সুবিদিত। তিনি যদি যথাসময়ে সংবাদ পেয়ে এগিয়ে আসেন সুলতান মাহমুদকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে।

এই পত্রখানা পাবার জন্যই তারা উদগ্রীব ছিল। বালুকারাম মনে মনে খুশীই হয়েছে। এইবার তৈরী হতে হবে তাকে। চামুণ্ডারায়কে ও কথাটা জানানো দরকার। তাছাড়া ভীরু লোকটাকে হাতে রাখার জন্য বালুকারাম এখন তার সঙ্গে নিয়মিত দেখা করছে। অবশ্য তা ছাড়াও মনের কোনে একটা গোপন আশা তার রয়ে গেছে। একটা স্বপ্ন।

গুর্জরের সিংহাসন আর ওই চামুণ্ডারায়ের কন্যা গোপাবতী। জীবনে তার এই দুটো কামনা।

কোন অতল থেকে উঠেছে সে, সামান্য সৈনিকরূপেই সে গুর্জররাজ ভীমদেবের কাছে চাকরী পায়। নিজের অতীত পরিচয় সে জানে না, সকলের অবজ্ঞা আর দয়া কুড়িয়ে মানুষ।

আজ বালুকারাম নিজের বুদ্ধি আর সাহসের জন্য এই পদোন্নতি করেছে। কিন্তু এই নিয়েই তৃপ্ত থাকতে চায়না সে।

আরও কিছু কামনা করে।

.

সোমনাথ পত্তনের মানুষের মুখে ওই এক কথা। যাত্রীদলের ভিড় ও কমে আসছে, প্রাকার বেষ্টিত সারা প্রভাসপত্তনের বুকে নেমেছে স্তব্ধতা।

শ্রেষ্ঠীর দল বিপনী খুলেছে—যাত্রীদল ও পথ চলে। মন্দিরের

ঘণ্টা ধ্বনি শোনা যায়, সব কিছুর আড়ালে একটা বুকচাপা আতঙ্ক জেগে আছে।

মরুস্থলীর দুর্গের পতন ঘটেছে। সবচেয়ে বিপদের কথা আজমীরের রাজা ধর্মগজদেবের পরাজয় এবং মৃত্যু।

সুলতান মাহমুদ যেন শয়তানের দূত। কোন কঠিন কাযই তার কাছে কঠিন নয়। রাতের অন্ধকারে সে মিলিয়ে যায়—আবার দিনের আলোয় দেখা যায় তাকে।

নানা আজগুবী সংবাদ লোকমুখে ছড়াতে থাকে।

রাজপথে ওরা বালুকারামকে যেতে দেখে সরে দাঁড়াল। ব্যস্ত হয়ে বালুকারাম তেজী ঘোড়াটা দাবড়ে এগিয়ে গেল মন্দির প্রাকারের দিকে।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ, ভীমদেব, মহানায়ক চামুণ্ডারায় জুনাগড় রাজ নবঘনদেব ও আছেন। আজমীরের ধর্মগজদেবেব দুঃসংবাদ তাদের চিন্তিত করে তুলেছে।

এইবার যদি পারমার রাজ এবং ভোজরাজের সাহায্য না আসে, তারা এগিয়ে আসবে।

ক্লান্ত বালুকারামকে প্রবেশ করতে দেখে গঙ্গাসর্বজ্ঞ ওরদিকে চাইলেন। রাজা ভীমদেব কিছু বলবার আগেই বালুকারাম আর চামুণ্ডারায়ের মধ্যে ওদের অলক্ষ্যে একবাব দৃষ্টি বদল হয়ে যায়।

বালুকারাম নিবেদন করে।

—এদিকের সব ব্যবস্থা করে রেখেছি সর্বজ্ঞ। আমার অনুমান দূত বোধ হয় এতক্ষণে বিভিন্ন রাজ্যে পৌঁছে গেছে। তবু ভাবছি নিজেই একবার পারমাররাজ এবং অর্বুদরাজের সভায় যাবো। সুলতান মামুদ ওই পথেই আসছেন। জনসাধারণকেও উত্তেজিত করে সেই গতি রোধ করার চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য আমাদের যাওয়া উচিত। যদি অনুমতি করেন আমি যেতে রাজী আছি।

বালুকারাম ভগবান সোমনাথের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে ধন্য হতে চায়। সাধু! সাধু!

প্রশংসাবাক্য বের হয় গঙ্গা সর্বজ্ঞের মুখ থেকে।

একটা যুক্তিযুক্ত কথা। চারিদিকে এখন সকলকেই এই বিপদের কথা জানানো দরকার। তাই বালুকারাম যখন স্বেচ্ছায় এই কঠিন কায নিতে চায় ওঁরা আপত্তি করেন না।

বালুকারাম মন্দির চত্বরে নেমে আসে। সারা প্রাকার নগরীতে যুদ্ধের আয়োজন চলেছে। পরিখায় এখন সমুদ্রের জল, গভীর খাদ পরিপূর্ণ। কোথাও কামার শালায় রাশি রাশি তীর বল্লম প্রস্তুত হচ্ছে। মাঝে মাঝে ভারি কাঠের উৎক্ষেপন যন্ত্র বসানোর কায চলেছে। নগরের বাইরে বহিরাগত বহু রাজপুত গুজরাট সৌরাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীর পট্টাবাস পড়েছে।

কোথাও কোনস্থান নেই।

মন্দিরের ওপাশে একটা উদ্যানে দেবদাসী সেবাদাসী—সেবিকা পরিচারিকাদের ও সমবেত করেছে গোপা। এই আগত বিপদের দিনে চারিদিকে যখন জীবন মরণ প্রস্তুতি চলেছে, তখন নারীকেও তার কাযের ভার নিতে হবে।

গোপার এখানে অবাধ আনাগোনা। সেইই প্রথম শুভাকে এখানে দেখে। দুজনের সেই পরিচয় প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। গোপা ও শুভার মত একটি মার্জিতা তরুণীকে দেখে বিস্মিত হয়।

—তুমি এখানে কেন এলে?

শুভা মিষ্টিহাসি হেসে জবাব দেয়।

—আমরা সবাই ভগবান সোমনাথের সেবিকা।

গোপা মাথা নীচু করে জানায়—ভগবান সোমনাথের জয় [illegible]ক। তবু মনে হয়েছে কোথায় একটা বেদনা তার মনের অতলে

রয়ে গেছে। তাই সব ছেড়ে সে আজ তার জীবন উৎসর্গ করেছে সোমনাথের চরণে।

গোপা এ নিয়ে আর কথা বাড়ায় নি।

ক্রমশঃ মেলামেশায় জেনেছে তার মনের কথা। শুভা ও জানে গোপাকে। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে আসে গোপা। প্রায় পুরুষের সাজে। সুন্দর সুঠাম চেহারা। দুচোখে কি নিবিড় প্রীতির আবেশ। বলে শুভা

—এমনি করে পুরুষ সেজে থাকলে জীবনে যে কেউ আসবে না গোপা।

গোপা হাসে—যদি কেউ আসে তাকে আসতে হবে আমায় জয় করে।

গোপা নিজে থেকে এগিয়ে এসেছে। সেবিকা বাহিনী গড়ে তুলছে সে। যুদ্ধের সময় এত লোককে সেবা করার প্রয়োজন, তাদের আহার্য যোগানো সে ও এক মহাদায়িত্ব।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ প্রথমে দেবদাসী পরিচারিকাদের এ কাযে নিয়োজিত করবেন কিনা ভেবেছিলেন। গোপাবতীর কথায় সর্বজ্ঞ বিস্মিত হন।

—দুস্থ মানুষের সেবা করা ও কি ধর্মের বাইরে সর্বজ্ঞ?

গঙ্গাসর্বজ্ঞ ওর প্রশ্নের জবাব দেন নি। মত দিয়েছিলেন ওর কাযে।

গোপাবতী বলে—'সেবা করা ছাড়াও, প্রয়োজন হলে নারী আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রও ধারণ করবে। দেবতার জন্য যারা উৎসর্গীকৃত। দেবতার সম্মান রক্ষার দায়িত্ব তাদের আছে।

তাই নারী সেবিকাবাহিনীকেও গোপা যোগ্য করে তুলতে চায়। ক'দিন কঠিন পরিশ্রম করে চলেছে সে।

ক্লান্ত দেহ। ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে আসছে মন্দির চত্বর থেকে সিংহদ্বার পার হয়ে প্রাসাদের দিকে। একপাশে সরস্বতীর জলধারা বয়ে চলেছে, নারকেল গাছ আর ঝাউগাছগুলো বাতাসে মাথা নাড়ে। সবুজ একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ।

হঠাৎ বালুকারাম এই পথে গোপাকে আসতে দেখে একটু অবাক হয়। ওর ঘোড়াটা বাড়িয়ে দিয়ে গোপার তেজী ঘোড়াটার পথ আগলালো সে।

—তুমি!

গোপার মুখে একটু হাসির আভা। বালুকারাম বলে।

—তবু যাবার আগে দেখা হ'ল।

গোপা আজ বালুকারামকে একটু অন্য চোখে দেখে।

গঙ্গাসর্বজ্ঞের মুখে শুনেছে বালুকারামও এই আক্রমণের বাধা দেবার জন্য অনেক কিছু করছে।

বালুকারাম যোগ্য সেনাপতির মতই আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে দূর দুর্গম মরু পর্বত অঞ্চলে। বিভিন্ন রাজ্যের সৈন্যদের একত্রিত করে সে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

বালুকারাম গোপার মুখে আজ হাসির আবেশ দেখে, ওর কথায় শোনে আন্তরিকতার সুর। গোপা বলে।

—ভগবান সোমনাথ তোমায় সব বিপদে রক্ষা করবেন, তোমার উদ্দেশ্য সফল হোক সেনানায়ক।

—আর সেদিন আমার পুরস্কার?

গোপাবতী কল্পনা করে গুর্জর রাজ্যে, সারা ভারতে আবার শান্তি ফিরে এসেছে। কালো ঝড়ের মেঘটা সরে গেছে ভারতের আকাশ থেকে। সফেন নীল সমুদ্র এসে আছড়ে পড়বে সোমনাথের পদপ্রান্তে।

ওর গুঞ্জনে উঠবে একটি মহাসুরের রেশ, বিহগকাকলী মেশা এই ছায়াকুঞ্জে তারা দাঁড়িয়ে আছে দুজনে; ব্যাতান্দোলিত নারিকেল বীথির বুকে লেগেছে চাঁদের মাদকতাময় আলোর আবেশ।

একটি শুভলগ্ন—কল্পনার রামধনুরং এর গভীরে কোথায় হারিয়ে যায় গোপা।

—গোপা।

গোপার হাতখানা বালুকারামের হাতে। সারা দেহ মনে একটি বিচিত্র সুর। গোপা সচকিত হয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়, সলজ্জভাবে বলে।

—সব দুঃখের কালোমেঘ কেটে যাক বালুকারাম, ততদিন আমরা সকলেই ভগবান সোমনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। সব বিপদ বাধা উত্তীর্ণ হবার পর তোমার পুরস্কারের কথাটা স্মরণ করবো। তার আগে নয়।

গোপা ঘোড়াটাকে ইশারা করতেই সে কদমে লাফ দিয়ে বের হয়ে গেল, বালুকারাম হাসছে।

তার মনে ধীরে ধীরে সেই লোভটা বড় হয়ে ওঠে।

সেনানায়ক....সেনানায়ক আর সে থাকবে না। হবে গুর্জর পতি আর গোপাকে সেদিন মাথা নীচু করে তার কাছে আসতে হবে।

প্রেম! হাসি আসে বালুকারামের।

গোপা আজ ওকে সমীহ করে, হয়তো শ্রদ্ধা করে। বালুকারামের সব কথা যেদিন প্রকাশ পাবে—সেদিন সাধারণ মানুষের নাগালের উর্দ্ধে থাকবে সে! গুর্জরের সিংহাসনেই বসবে, আর গোপা যদি ঘৃণা করে তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে, সে ঘৃণাকে সে শাসনের কাঠিন্যে ডুবিয়ে দিয়ে, সব শক্তি প্রয়োগ করে ছিনিয়ে আনবে তাকে।

এই প্রেম—ভালবাসা কি এর দাম? সবচেয়ে বড় ওই প্রতিপত্তি আর প্রতিষ্ঠা। বালুকারাম যে কোন মূল্যে সেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে।

বালুকারাম কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে চলেছে মরু অঞ্চল কচ্ছের রণভূমি পার হয়ে রাজস্থানের শেষ সীমানা অর্বুদ পর্বতের দিকে।

মাটি এখানে কৃপণ। জলের সঞ্চয় নেই।

যদিও বা কোথাও জল মেলে তাও নোনা। মিষ্টি জল নেই, সে জল পান করা যায় না। মাঝে মাঝে তুলার ক্ষেত। তাও জল অভাবে শুষ্ক বিবর্ণ। গাছগুলো এইটুকু হয়েই বহুকষ্টে ক'টি পাতার প্রান্তে এতটুকু সাদা তুলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফসল তোলবার ও লোক নেই। সারা জনপদ বসতি শূন্য।

পথে কাতারে কাতারে লোক চলেছে, উট খচ্চর না হয় বয়েল গাড়ীতে করে সামান্য সঞ্চয় তুলে নিয়ে সোমনাথ পত্তনের দিকে।

পথে বালুকারাম আর সহচরদের দেখে তারা ভয়ে রাস্তার এদিকে ওদিকে সরে যাবার চেষ্টা করে। কোন নারী আতঙ্কে চিৎকার তুলে কান্না সুরু করে।

ওদের ভেবেছ বোধ হয় আক্রমণকারী সুলতানের সৈন্য। পরে ভুল ভাঙ্গলেও তাদের সাহস ফেরে না।

--কোথায় চলেছো তোমরা?

ভীত আর্তকণ্ঠে তারা জানায়—বাবা সোমনাথের চরণেই শেষ আশ্রয় নোব।

অন্যান্যরা বলে।

—ওখানে তবু আশ্রয় পাবো, আহার্য পাবো। শুনছি নাকি ম্লেচ্ছ সৈন্যরা যাকে দেখেছে কচু কাটা করছে, গ্রামকে গ্রাম

জ্বালিয়ে দিচ্ছে। গো হত্যা প্রাণীহত্যা তাদের কাছে খেলা মাত্র। কে জানে কখন এসে হানা দেবে?

ওরা দাঁড়াল না। প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে ওরা।

সারাদেশে একটা অরাজকতা। সন্ত্রাসের রাজত্ব নেমেছে সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের সর্বত্র

আবার নিশ্চিন্ত হন ভোজরাজ। সুলতান মাহমুদ আজমীর রাজ্য জয় করে সেখানে তার দখল কায়েম করেনি। আবার বের হয়ে পড়েছে সেই দস্যু সর্দার নোতুন লুটের মালের সন্ধানে।

ওদিকে ভোজরাজের দৃষ্টি কোনদিনই ছিল না। শুধু নিজের রাজ্য রক্ষার ব্যাপারেই ওদিকে যতটুকু সুরক্ষিত করার প্রয়োজন তাই করেছিলেন। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পূর্বদিকে।

গৌড় বাংলা—কলিঙ্গের উর্বরা মৃত্তিকা রাজাভোজকে লুব্ধ করেছিল। তাই তিনি ভেবেছিলেন রাজ্য বিস্তার করার বাসনা হলে এই দিকেই হাত বাড়াবেন।

কিন্তু কোন উপলক্ষ্য না পেয়ে চুপ চাপই ছিলেন। এইবার সেই উপলক্ষ্যই জুটে যায়।

দাক্ষিণাত্যের পল্লব রাজারাও কলিঙ্গ এবং বঙ্গদেশের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ও আশা করেছিলেন উত্তর ভারতে এই বিদেশী সুলতানের আক্রমণে রাজা ভোজদেবও ব্যস্ত থাকবেন তাঁর রাজ্যের উত্তর সীমান্ত রক্ষায়। সর্বশক্তি সেইখানেই নিয়োজিত থাকবে।

এই সুযোগে তাঁরা এগিয়ে যাবেন কলিঙ্গ এবং গৌড়ের দিকে। অবন্তীনগরে ও নানা সংবাদ আসছে।

দস্যু সুলতান মাহমুদ প্রচুর সৈন্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে রাজস্থানের মরু এবং আরাবল্লী পর্বতভেদ করে সৌরাষ্ট্রের দিকে। তার

নিঃশ্বাসে আছে বিষ বাষ্প। যেদিকে চাইছে সেই দিকেই শুধু ভষ্ম আর অঙ্গার। গ্রাম জনপদ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

লুট পাট—অগ্নিকাণ্ড অত্যাচার তার স্বভাবজাত।

একটি লোক এই নিয়ে ভাবনায় পড়েছে, সে সেনাপতি দেবশর্মা।

তাঁর বিশ্বস্ত সৈন্যদলের সকলেই ভেবেছে রাজ ভোজদেব এই আক্রমণ প্রতিহত করে জানিয়ে দেবেন ভারতবর্ষ বীরশূন্যা নয়। বিদেশীর কোন আক্রমণ তারা নীরবে প্রত্যক্ষ করবে না।

দেবশর্মা ও আশা করেছিলেন সোমনাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে—গুর্জর রাজ ভীমদেবের নিকট থেকে কোন আমন্ত্রণ আসবে, এই ধর্মযুদ্ধে তিনি দুর্বার তেজ নিয়ে হানা দেবেন।

সুলতান মাহমুদ এগিয়ে চলেছে।

রাজা ভোজকে দেবশর্মাই কথাটা জানান।

—নীরব দর্শকের মতই এই চরম অপমান আমাদের দেখতে হবে?

রাজা ভোজ জবাব দেন।

—পারমার রাজ—অর্বুদরাজ আছেন, তাছাড়া গুর্জররাজ ভীমদেবও পরাক্রান্ত নরপতি। তাঁর সৈন্যবলও কম নয়। এরা নিশ্চয়ই জানেন যে সুলতান মাহমুদকে তাঁরা বাধা দিতে পারবেন। তাই আমার মত ক্ষুদ্র একজন নরপতির কোন সাহায্যেই তাদের প্রয়োজন নেই।

দেবশর্মা বলেন।

—এ সময় মান অভিমানের প্রশ্ন বড় নয় মহারাজ।

ভোজদেব জবাব দেন।

—কোন সংবাদ যখন আসেনি, তখন বিনাপ্ররোচনায় আমার সৈন্য অন্য রাজ্যে নিয়ে যাবো কি করে? সুলতান মাহমুদ তো আমার

রাজ্যে কোনদিনই প্রবেশ করে নি। একজন দস্যুকে শাস্তি দিতে ওই রাজাদের যথেষ্ট শক্তি আছে। তা ছাড়া সামনে আমাদের অন্য কায রয়েছে সেনাপতি।

দেবশর্মা মহারাজার দিকে চায়।

—গৌড় কলিঙ্গের দিকে অভিযান সুরু করেছে দাক্ষিণাত্যের পল্লব রাজবংশ। তাঁরা ওই অঞ্চল অধিকার করতে চান। তাদের পরাস্ত করে আমরা ওই গৌড় আর উড়িষ্যা নিজেরাই দখল করবো। রাজা ভোজদেব সীমানা বিস্তার করতেও জানে—শাসন করতেও জানে, পারেও। তুমি তার জন্যই তৈরী হও দেবশর্মা!

—মহারাজ!

দেবশর্মা সচকিত কণ্ঠে শুধু অস্ফুট আর্তনাদ করে। বলে চলেছে সে এবার স্পষ্ট তেজস্বী কণ্ঠে।

—বিদেশী ওই দস্যু সুলতান মাহমুদকে চেনেন না মহারাজ। দস্যুর লোভ করাল, সোমনাথ আক্রমণ করে সে যদি ভোজরাজকেও আক্রমণ করে তবে সে আক্রমণ আরও দুর্বার হবে।

ভোজরাজ সদম্ভে বলেন।

—সে আক্রমণ বাধা দেবার ক্ষমতা ভোজরাজের নিশ্চয়ই আছে সেনাপতি। গৌড় কলিঙ্গ বিজয়ে তোমার কি কোন অনিচ্ছা আছে?

দেবশর্মা স্তব্ধ হয়ে যায়। এ যেন তার রাজভক্তির প্রতিই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন স্বয়ং মহারাজা। দেবশর্মা বলেন।

—মহারাজের নির্দেশ নতমস্তকে আমি মানতে বাধ্য।

—তবে গৌড় কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য তৈরী হও সেনাপতি। আয়োজন সম্পূর্ণ কর। নির্দেশ করলেই যাত্রা সুরু করতে হবে।

দেবশর্মা মাথা নীচু করে বের হয়ে এল। তবু মনের মাঝে একটা দ্বিধা জাগে। অবন্তীর রাজপথে সহজ জীবন যাত্রা চলেছে। কোথাও কোন উত্তেজনার সাড়া নেই।

এই জীবন যাত্রায় এসে মিশেছে কিছু ছন্নছাড়া গৃহহারা মানুষ। তাদের মুখে আতঙ্ক আর অভাব জড়ানো। রাজপথে নগরীতে অবন্তীরাজ্যের জনপদে এসে আশ্রয় নিচ্ছে ওরা।

সুলতান মামুদের আক্রমণে ওরা পালিয়ে এসেছে। দুর্বার ধ্বংসের মত চলেছে সেই দস্যু। কান্নার সুর ওঠে।

অবন্তীর শান্ত সারলো সেই সুর অনেককেই আকৃষ্ট করে। কৌতুহলী জনতার ভিড় জমে।

কোন বিদেশী আজ সব হারিয়ে কাঁদছে। সেই দস্যু তাদের জনপদকে অগ্নিদগ্ধ করেছে, তার স্ত্রী কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তাদের কোন সংবাদই জানে না সে। নিজে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

সহরের এই ভিড়ে অনেকেই এমনি সবহারিয়ে এসেছে।

দেবশর্মা স্তব্ধ হয়ে শোনে এই কান্নার শব্দ। চারিদিকে অত্যাচারীর পদধ্বনি, অগ্নির লেলিহান শিখা। এসময় সবশক্তি দিয়ে বীর সেই নিপীড়িত মানুষের সাহায্য এগিয়ে যায়, কিন্তু দেবশর্মা ভোজ রাজের আদেশে চলেছে আর একটি শান্ত দেশে রক্তপাত ঘটাতে। দেবশর্মার মনে পড়ে একটি নারীর কথা।

রাজনটী শুভা। তার দুচোখের সেই চাহনি আজও ভোলেনি সে। করুণ সেই জলভরা দুচোখে সে মিনতি জানিয়েছিল।

সেও একটি পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। দেবশর্মার জীবনে সেই প্রথম নারী যাকে সে ও অস্বীকার করতে পারেনি। ভীরুমন তবু বাধা দিয়েছিলেন তার কর্তব্যের অজুহাতে। কিন্তু সে কর্তব্যও সে করতে পারেনি।

খণ্ড দ্বিধাবিচ্ছিন্ন ভারতের নরপতিদের একত্রিত করে সে এই দুর্যোগের দিনে বিদেশীকে বাধা দিতে পারে না, শুধু তাই নয় নিজেই চলেছে আর একটি স্বাধীন দেশকে রাজা ভোজের পদানত করতে।

শুভা চলে গেছে সব বিষয় বৈভব ছেড়ে।

দেবশর্মা তবু প্রতিষ্ঠা আর অর্থের মোহে পড়ে আছে সেইখানে। কি এর দাম তা জানে না সে।

সৈন্য সমাবেশ চলেছে। অশ্বারোহী রথ হস্তিবাহিনী ও সুগঠিত করছে দেবশর্মা। এত সৈন্যের উপযুক্ত রসদ পত্র সংগ্রহ অস্ত্রশস্ত্র ও তৈরী করাতে সময় লাগবে। দেবশর্মা তারই আয়োজন করতে থাকে।

কিন্তু নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়।

চোখের সামনে দেখেছে বিতাড়িত ওই দেশছাড়া মানুষদের। তাদের প্রতি এই অত্যাচারের কোন প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা তার নেই।

দেবশর্মা এমন সমস্যায় এর আগে কখনও পড়ে নি। দুর্বার শক্তি নিয়ে সে বের হতে চায়, মনে হয় অবন্তী নগরে কে যেন তাকে বন্দী করে রেখেছে। শুভার কথা মনে পড়ে।

এর চেয়ে সামান্য চাওয়া নিয়েই সব ভুলে থাকতো সে। এতটুকু আশ্রয়, একটি আপনজন ভালবাসায় ভরা একটি ছোট্ট নীড়।

সবকিছুকে সে অতীতে নির্মমভাবে উপেক্ষা করেছে।

তাই বোধ হয় এই অন্তর্জালা, এই বুকজোড়া হতাশা।

আজমীরে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে সুলতান মামুদ আবার নোতুন উদ্যমে এগিয়ে চলার সঙ্কল্প করে। এখানে তার থাকা চলবে না।

পরপর জয়ের নেশা তাকে উন্মাদ করে তুলেছে। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

আজমীরের প্রভূত ধনসম্পদ তার হাতে, নোতুন সৈন্য বাহিনীকে এনে গড়ে তুলেছে। মরুভূমির উপর দিয়ে এগোতে হবে। তাই জলের সঞ্চয় নিয়ে চলেছে উটের দল।

বিরাট সৈন্যদল চলেছে এবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মরুপ্রান্তর ভেদ করে দুর্বার গতিতে।

দিক নেই দিশা নেই এই মরুভূমির।

যতদূর চোখ যায় ধূ ধূ শূন্য বালুকাভূমি। বাতাস এখানে অগ্নিময়।

বালি উড়ছে, সেই বালুঝড়ে ঢেকে যায় পথের রেখা। দৃষ্টি এখানে উড়ন্ত বালুকার যবনিকায় আবৃত। ওই মরুপ্রান্তর পার হয়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সৈন্যদল চলেছে।

আজমীরের পরাজয়ের পর মরুস্থলীর সেই সামন্তরাজের পুত্র সংগ্রামসিংহ বেশ কিছু সৈন্য এবং রাজপুত যোদ্ধাদের নিয়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে সরে যায়। বেশ বুঝেছিল সংগ্রামসিং বাধা দেবার কোন অর্থ আর নেই। পুষ্করের সেই অতর্কিত আক্রমণে জয়ী হয়েছে ধূর্ত সুলতান মাহমুদ। এই জয়ের নেশায় সে এগিয়ে যাবে দুর্বার বিক্রমে মরুপ্রান্তব পার হয়ে সৌরাষ্ট্রের দিকে।

দুর্গম মরুপ্রান্তর পার্বত্য বনভূমি ঢাকা পথ, এ পথ রাজপুতদের নখদর্পণে, তাই তারা সম্মুখ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে অন্যপথ নেবার চেষ্টা করছে।

সংগ্রাম সিং প্রকৃত যোদ্ধা, রাজপুত রক্ত তার ধমনীতে। সে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেই, তাই মরীয়া হয়ে তার সৈন্য সামন্ত এবং অনুচরদের নিয়ে তৈরী হয়েছে।

আনন্দের সুর তুলে চলেছে সুলতানের বিজয় বাহিনী। রণবিজয়ের আনন্দ তাদের মনে, দুচোখে রাজ্যজয়ের নেশা। কোন সেনানী খুশিমনে গজল গাইছে।

খর রোদের তাপে ক্রমশঃ সেই উৎসাহ তাদের নিঃশেষ হয়ে আসে। চারিদিকে শুধু ধূ-ধূ মরুভূমি, বহুদূরে একপাশে নীল আরাবল্লীর পর্বত রেখা, পথ নেই।

এপথে কোন মানুষ বোধহয় আসেনি কোনদিন, ওরাই প্রথম চলেছে। কোন জলের সঞ্চয় নেই। কোথাও কোন ছায়া নেই।

মাহমুদের কেমন সন্দেহ হয়। দুদিনের পথ পার হয়ে এসেছে তারা, কোন বসতি নেই, অন্তহীন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় শুধু হাওয়ায় জেগেওঠা বালুকার ঘর্ষণে আর ওদের ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর খুরে খুরে।

—ছাউনি লাগাও।

সেনাপতি আলি মসজদের কেমন বিচিত্র ঠেকে। আর বেশীদূর এগোনো নিরাপদ হবে না। ইতিমধ্যে ছাউনিতে জলের অভাবও দেখা দিয়েছে। ওরা আশা দিয়েছিল একদিনের পথেই পড়বে জলভরা বানাস নদী, তবু কিছু জল বেশীই ছিল ওদের সঙ্গে। তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মাহমুদও উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করছে।

—কোথায় তোমার পথ প্রদর্শকের দল ?

সারি সারি ছাউনিতে সন্ধ্যা নামছে, শূন্য মরুভূমির পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে রয়েছে তখনও, ধীরে ধীরে সেই সীমাহীন প্রান্তরে রাত্রির স্তব্ধতা নামে।

সেই পথপ্রদর্শক সৈন্যদের আর সন্ধান মেলেনা। চারিদিকে তারা অন্বেষণ করে, বৃথা সে অন্বেষণ। সুলতান অসহায় রাগে উন্মাদের মত গর্জন করে ওঠে।

—বেকুফের দল! কোথায় এসে পড়েছো তা জানোনা? হাসামখাঁও নেই, সে কিছু অনুচর নিয়ে পারমার রাজের রাজ্যে গেছে। সেখানের কেউ যাতে বাধা না দেয়—তারই সুযোগ সন্ধানে।

সালার মসজিদ খাঁ আর ইব্রাহিমখাঁয়ের উপর এই বাহিনীর দায়িত্ব। এতদূর এগিয়ে এসে এমনি করে তাদের ভুলপথে এনে গহিন মরু প্রান্তরে ফেলে দেবে ওই হিন্দুস্থানী শয়তানের দল তা কল্পনাও করেনি।

সুলতান গর্জন করছে।

—হিন্দুস্থানের প্রতিটি মানুষ, মাটি, বন, পাহাড় অবধি বেইমান। এখানে বাঁচার কোন রাস্তা তারা রাখতে চায় না।

ধ্রুবতারা উঠছে আকাশে।

আলবেরুনীর কথা মনে পড়ে। সে সব গ্রহ নক্ষত্র চেনে। তাদের অবস্থিতি দেখে দিক নির্ণয় করতে পারতো। এই অন্তহীন মরুভূমিতে দিক নির্ণয়েরও কোন পথ নেই একমাত্র সূর্য ছাড়া।

রাতের স্তব্ধতা নামে ছাউনিতে। মরুভূমির উষ্ণতা কমে গিয়ে হিমেল হাওয়ার আবেশ নামছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সৈন্যদল নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন। হঠাৎ কোলাহল কলরব জাগে।

সারা তাবু পত্তনে অতর্কিত ঝড়ের বেগে এসে হানা দিয়েছে রাতের অন্ধকারে কারা। শাণিত তরবারি আর বর্শার আঘাতে ছিটকে পড়ে সৈন্যদল। ওদিকে আগুন জ্বলছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে সেই শূন্য মরুভূমির মাঝে কিছু ঘোড়া পালাবার চেষ্টা করে, ওইগুলো ছুটছে প্রাণভয়ে। বেসামাল তারা—যে যেদিকে পারল দৌড়ল।

নিমেষের মধ্যে সেই সুপ্তিমগ্ন ছাউনিতে একটা ধ্বংসের ঝড় তুলে, অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে কারা আবার রাতের আঁধারেই ছায়ামূর্তির

মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পট্টবাস জ্বলছে, রসদ গুদামে বোধহয় অগ্নি লেগেছে, আগুনের লেলিহান শিখায় ওদের খাদ্যসম্ভার পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। জলের সঞ্চিত জালাগুলো ছিটিয়ে পড়েছে। উষ্ণ মরুভূমি সে জলটুকু নিঃশেষ করে দিয়েছে এক নি[illegible]ষে।

সুলতান মাহমুদ গর্জন করে চলেছে

—বেকুবের দল,

এমনি একটা গুপ্ত আক্রমণ আসবে তা কল্পনাও করেনি তারা এইবার বুঝতে পারে সুলতান এসবই পূর্ব-পরিকল্পিত, ইচ্ছা করেই তাকে এই মরুভূমির বুকে ভুলপথে এনে ফেলেছে তারা, আজকের আক্রমণ তারই প্রস্তুতিমাত্র।

তবু এগিয়ে যেতে হবে তাকে। এখানে থাকা মানেই মৃত্যু। সামনে দক্ষিণের দিকে গেলে জনপদ পাবে, শস্যশ্যামলা লোকালয় মিলবে। জলের সঞ্চয় আছে সেখানে। তাই চলতেই হবে তাদের।

রাত্রি শেষ হতে দেরী নেই।

ছাউনি তুলে তারা এগিয়ে চলে, মুক্ত প্রান্তরে থাকা নিরাপদ নয়। চারিদিকে সাবধানী দৃষ্টি, কোথাও এই বিশাল প্রান্তরে কোন সৈন্যদল তো দূরের কথা কোন মানুষই চোখে পড়েনা। দূরের পাহাড় বনসীমা এগিয়ে আসছে। ওই দিকেই চলেছে তারা। তবু জলের সন্ধান পাবে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তেজ বেড়েই চলেছে। তৃষ্ণায় কাতর সৈন্যদল! চারিদিক শুধু ওই এক কথা।

পানি!

তবু তারা এগিয়ে চলেছে ওই জলের সন্ধানে। রাজ্য নয় সম্পদ নয় তাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ওই একবিন্দু পানীয়।

সবুজ বনসীমা এগিয়ে আসছে, প্রাণের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে তারা চলেছে। চোখের সামনে ফুটে ওঠে অজস্র সাদা কালোর ফুটকি, কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসছে। টলে পড়ল ঘোড়া থেকে স্থির প্রাণহীন দেহটা, বালুর উপর পড়ে দুবার স্পন্দিত হয়েই থেমে গেল। বাহিনীর এমন দু চারশো জন যদি এভাবে পড়ে যায় তবু বাহিনীর গতি থামেনা।

সামনেই একটা জলাশয়, নদীর খাত থেকে জলধারা এখানে এসে জমেছে, না হয় কোথাও কোন ঝরনা থেকে ওই জল জমে রয়েছে। কাদা গোলা জল। তবু এই তাদের কাছে মহা মুল্যবান।

কে কার নিষেধ শোনে, ওই তৃষ্ণার্ত সৈন্যদল অশ্ব সব কাড়াকাড়ি করে সেই জলই পান করতে থাকে, নিমিষে যেন সেই জলাশয়ই শূন্য হয়ে যাবে।

দুপুরের রোদ তখন ঢলে পড়েছে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রমে আর নীরব একটা আতঙ্কে সবাই কেমন ত্রস্ত। কোন এক অজানা বিভীষিকার রাজ্যে তারা হারিয়ে গেছে।

আজকের মত এইখানেই বিশ্রাম নিয়ে কাল বনপথ পার হবে। কিছু দূরেই একটা পার্বত্য ছোট নদীরও সন্ধান পায় তারা, প্রবহমান সেই জলের স্বাদ ও মিষ্টি তৃপ্তিকর।

মিনাবাঈও দেখছে এই মরুভূমিকে। উত্তর ভারতের নদীমাতৃকা দেশের মেয়ে সে। কি দুর্বোধ্য বিধিলিপি তার। এক বিদেশী দানবের সঙ্গে বিচিত্র বন্ধনে সে বন্ধ।

মনে হয়েছে এ জীবনের কি সার্থকতা? যে মানুষটাকে কোনদিন ভালবাসেনি, যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে কোন অনিশ্চিতের পথে কোথায় চলেছে।

অন্তহীন প্রান্তর। নিঃস্ব রিক্ত-শূন্য।

শুধু মৃত্যু আর হাহাকার এখানে।

সুলতানকে দেখছে মিনাবাঈ। রোদের তাপে ফর্সা রং তামাটে হয়ে উঠেছে, দুটো চোখ লাল টকটকে জবাফুলের মত।

নীরব রাগে ফুলছে।

মিনাবাঈ বলে—হিন্দুস্থান কেমন লাগছে জনাব?

সুলতান কথা বললো না। বন্দী সিংহের মত গজরাচ্ছে, তালুতে হাতের মুষ্টি ঠুকে সহসা গর্জে ওঠে।

—হিন্দুস্থান আমাকে রুখতে পারবেনা মিনাবাঈ।

মিনাবাঈ রাজনীতির মার প্যাঁচ বোঝে না, সে শুনেছে ভারতবর্ষের বড় বড় রাজার কথা। তারা কি এখনও এই দস্যুকে বাধা দেবেন না?

এর দর্পের জবাব দেবার মত কেউ কি নেই?

সুলতান ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে।

—জবাবে খুব খুশী হও নি? এখনও হিন্দুস্থানের উপর, এখানের মানুষের উপর তোমার মায়া? কি উপকার করেছে তারা তোমার? বন্দীদশা থেকে কেউ মুক্ত করতেও আসেনি, তোমার ইজ্জত ও রক্ষা করতে কোন হাত ওঠেনি, অথচ আমি ইচ্ছা করলে তোমার ঝুটো ইজ্জত ধূলোয় মিশিয়ে দিতে পারি। দিই নি।

—জনাব মেহেরবান!

মিনা নিদারুণ ব্যঙ্গ ভরে কথাটা ওর দিকে ছুঁড়ে দেয়। মিনা বলে চলেছে

—শুধু হিন্দুস্থানের বাইরের খোলশটাকেই দেখেছেন সুলতান, এর অন্তরের সম্পদকে দেখেন নি, দেখার চোখ ও নেই। তাই আপনার এত দর্প।

—আলবেরুণী ভারতের সেই সম্পদ খুঁজছে, সে খুঁজে জড়ো করবে, আমি তাহা লুট করে নিয়ে যাবো।

মিনা ঘৃণাভরে জবাব দেয়।

—জীবনে শুধু লুট করতেই শিখেছেন সুলতান। যার কিছু নেই সে লুট করে—যার অনেক আছে সে বিদ্বেষী, তাই ভারতবর্ষ স্বার্থপর নয়; সে ক্ষমাশীল।

—তার প্রতিরোধের শক্তি কোথায়? সে দুর্বল হীনবল।

··হঠাৎ কাদের কোলাহলে বের হয়ে গেলো সুলতান। এখানের মাটি অবধি শয়তান। কিছু সৈন্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে; ওই জলাশয়ের জলে কারা তীব্র বিষ মিশিয়ে দিয়ে গেছে, তৃষ্ণায় সেই জলই উন্মাদের মত পান করেছে তারা।

অশ্ব—সৈন্য সেই বিষক্রিয়ায় ঢলে পড়ে।

কোন প্রতিকারই করা যায় না। চোখের সামনে সৈন্য দলের মৃত্যু ঘটে চলেছে দুঃসহ যন্ত্রণায়। এমনি করে অসহায় মৃত্যুর অন্ধকারে ঢলে পড়তে দেখেনি হাজারো মানুষকে।

সুলতান অসহায়ের মত পায়চারী করছে।

—এ শত্রুর কারসাজি জনাব।

—কিন্তু শত্রু কোথায়? সেই দুষমনের দল!

তাদের চোখে দেখা যায় না, তারা তবু এখানের মাটিতে মিশিয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে মাথা তুলবে। সাপের মত ছোবল মারবে মৃত্যুর কালিমা নিয়ে।

তাই এপথ পার হয়ে চলে যেতে চায় তারা।

সামনের পাহাড় বনসীমা পার হলে পাবে শস্য শ্যামল লোকালয় পারমার রাজ্য, তারপরই সেই গুজরাট—সৌরাষ্ট্র।

সুলতান মাহমুদ এই ক্ষয় ক্ষতি আর অসহায় মৃত্যুর জবাব দেবে।

ছায়ার মত সংগ্রামসিংহ দল বল নিয়ে চলেছে ওর আশেপাশে, যখনই সুযোগ পাচ্ছে সুলতানের সৈন্যদলের উপর অতর্কিত আঘাত হেনে নিদারুণ ক্ষতি করে চলেছে।

সংগ্রাম সিংহ জানে সুলতান যদি এই মরুভূমি, বনপর্বত সীমা পার হয়ে গুজরাটে প্রবেশ করে আর তাকে কোন বাধাই সে দিতে পারবে না। তখন ও তার কর্তব্য স্থির করেই ফেলেছে।

তার অনুচর সৈন্যদল নিয়ে সে চলে যাবে সোমনাথ পত্তনে। সেখানেই শেষ দেখা হবে সুলতানের সঙ্গে। জবাব সেদিনও দেবে রাজপুত সংগ্রাম সিংহ।

সে জানে এই ক্ষয় ক্ষতির পর সুলতান উন্মাদের মত হয়ে উঠবে, তবু এ উন্মাদনাই তার ধ্বংসের কারণ হবে। তাই পিছু ছাড়েনি সুলতানের।

দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই সুলতান ছাউনি তুলে এই অভিশপ্ত রাস্তাটুকু পার হতে চায়। রৌদ্রতপ্ত মরুভূমি থেকে এবার পর্বত বনঘেরা পাহাড়ী পথ দিয়ে চলেছে তার সৈন্যদল। আরাবল্লীর বুক এখানে সজীব শ্যামল।

চারিদিকে পর্বত সীমা আর নীচে ঘন বনের প্রহরা। কোথাও এতটুকু শূন্যতা নেই। দুপুরের রোদ ও এখানে প্রবেশ করে না।

এই বন কতটা দীর্ঘ কিছুই জানেনা সুলতান, তবু এই পথে চলেছে। এ যাত্রার শেষ হোক।

হঠাৎ বনের মাঝে একটা বিচিত্র সাড়া জাগে।

আকাশে আকাশে কলরব করে ওঠে পাখীর দল, ওরা আর্তনাদ করছে। ভীত ত্রস্ত হয়ে দৌড়াচ্ছে হরিণ বন্য বরাহের দল। কোনদিকে দৃষ্টি নেই তাদের।

প্রাণভয়ে পালাচ্ছে তারা। বাতাসে ওই শব্দটা এগিয়ে

আসছে। প্রচণ্ড বন্যার আবর্ত যেন এই দিকে ধেয়ে আসছে, বাতাসে একটা গুমোট ভাব।

চারিদিকে আর্তনাদ ওঠে।

দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে অরণ্যে। বাতাসের বেগে সেই আগুনের লেলিহান শিখা সারা বনকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। বনস্পতিগুলো জ্বলছে দাউ দাউ করে।

সেই আগুনে ঝলসে ওঠে সৈন্যদল অশ্ব উট পদাতিক বাহিনী। যে যেদিকে পারছে প্রাণভয়ে ছুটছে! কেউ বা জ্বলন্ত আগুনেই গিয়ে পড়ে। কেউ দমবন্ধ ধোয়ায় আটকে পড়ে পথহারিয়ে ছটফট করে আগুনেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ছত্রভঙ্গ বাহিনী।

ভীত ত্রস্ত তারা। পালাচ্ছে বন ছেড়ে। এ বনের শেষ কোথায় জানে না। অশ্বারোহী বাহিনী, উটসোয়ারের দল প্রাণভয়ে পালাচ্ছে।

সুলতান বিপদে পড়েচে আবার।

সংগ্রামসিংহ বাধ্য হয়েই এই পথ নিয়েছিল। যে কোন রকমে ওই সুলতানকে ধ্বংস করাই তার ব্রত। তাই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ওদের পেয়ে তারাই এই অগ্নিকাণ্ড বাধিয়েছিল।

পথ হারিয়ে প্রাণ নিয়ে কোনমতে ধ্বংসপ্রায় বাহিনী সমেত যখন বের হ'ল সুলতান ; সারা বাহিনীর সর্বাঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের ছাপ।

বনভূমি পাহাড় পর্বত পার হয়ে তারা এসে পৌছল বাইরে বানাস নদীর তীরে, এই সেই বানাস—তারা পথভুলে কোন জাহান্নামে ক'দিন পচে মরেছে, কোনমতে সেই নরক থেকে প্রাণনিয়ে সুলতান বের হয়ে এসেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে প্রান্তরে।

সবুজ উর্বর এ মৃত্তিকা।

কোথায় দূরে লোকালয় দেখা যায়, কিন্তু সব শূন্য। দস্যুদলের আগমণের সংবাদে গ্রামবাসীর দল সব ছেড়ে পালিয়েছে। খাদ্য নেই। পশু প্রাণীও নেই। তারাও পালিয়েছে বোধ হয়। জনপদে সুলতানের বিধ্বস্ত বাহিনী ঢুকছে, তারা ও শ্রান্ত ক্লান্ত; আহার্য পানীয় চাই তাদের। আর চাই বিশ্রাম।

তখনও বন থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পলাতক সৈন্যদল আসছে। তারাও সংগ্রামসিংহের আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি।

অনেকেই বিষাক্ত তীরের আঘাতে না হয় বর্শা বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে, কেউ বা সেই সংবাদ দিতে আসে ছাউনিতে।

অদৃশ্য শত্রুর এই আক্রমণ সুলতানের বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করে চলেছে। কে জানে তারা আর ফিরতে পারবে কি না।

পথের যা নমুনা দেখে এসেছে তাতে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নয়।

পিছনোও অসম্ভব, সেখানে অপেক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যু। যে মূহূর্তে ওরা জানবে সুলতান ভীত হয়ে পালাচ্ছে ওরা অন্তরাল থেকে সবশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে নেকড়ের মত; নির্মম আক্রোশে টুঁটি ছিড়ে ফেড়ে দেবে।

তাই মরতে হলেও বীরের মত লড়েই মরতে হবে।

সুলতান জানেনা তার জন্য আর কি অপেক্ষা করছে। আজ ওই ছিন্ন ভিন্ন বাহিনীর একক নায়ক তাই আল্লার কাছে দোয়া প্রার্থনা করে। ওয়াক্তের নামাজ পড়ে সুলতান মাহমুদ।

বালুকারাম চলেছে মহাসেনা অধিপতির গুর্জর রাজ এর সীমানা পার হয়ে পারমার রাজধানীর দিকে।

আকাশ ছোঁয়া পাহাড় গুলো এখানে সবুজ।

বানাস নদীর জলধারায় এর প্রান্তর শ্যামল উর্বর। কিন্তু সারা দেশে আজ হাহাকার।

ভীত ত্রস্ত অধিবাসীরা প্রানভয়ে পালাচ্ছে।

পারমার রাজার রাজধানীতে পৌঁচছে বালুকারাম।

সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ের শিখরদেশে পথটা উঠে গেছে এঁকে বেঁকে। পথে কোথায় পার্বত্য ঝরনা পাথরে ঘা খেয়ে চলেছে কলধ্বনি তুলে।

দুর্গম পর্বত শ্রেণীর ঘাট পার হয়ে উঠে চলেছে বালুকারাম।

মহাসেনার সামন্তদেব, নগরকোট-এর শাসনকর্তা সকলেই এই দুর্যোগে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চায়, তার আগেই মাহমুদের সেনাপতি হাসাম খাঁকে তারা কথা দিয়েছে, তারা পথ দেবে। শুধু তাই নয় আহার্য্য দ্রব্য সম্ভারও ইতিমধ্যে তারা বানাস নদীর তীরে ছাউনির দিকে পাঠিয়েছে।

বালুকারাম ও শুনে নিশ্চিন্ত হয়।

আবু পর্বত শিখরের রাজা বুন্ধুরাজ ও এসব অশান্তি চান না। তার মন্ত্রী বিমল শাহ ও চতুর। রাজকার্য সেই চালায়। এমনিতে ধর্মভীরু তিনি।

তার কাছে এ সব যুদ্ধ ভালো লাগে না। নিজের নাম ভবিষ্যতের বুকে লিখে রাখবার জন্য তিনি তখন পর্বতশিখরের জৈন মন্দির তৈরী করাতে ব্যস্ত। দক্ষ শিল্পীরা শ্বেত পাথরের বুকে অপরূপ কারুকার্য গড়ছে যা দেশের একটি স্থায়ী সম্পদ বলেই গণ্য হবে। বিমলশাহ সেই ধ্যানে মগ্ন।

তিনিও এই যুদ্ধ বিগ্রহ চান না। তা ছাড়া সুলতান মাহমুদ এই দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত চূড়ায় কোনদিন আক্রমণ হানতে আসবে না।

বালুকারাম নিশ্চিন্ত হয়। ওরা বাধা দেবেনা সুলতানকে।

তারই স্বার্থ সবচেয়ে বেশী।

সুলতান এবার চিন্তায় পড়েছে। আজ সামনে তার অজানা দেশ। যতই এগোবে প্রতিরোধ ততই দৃঢ়তর হবে। এতবড় বাহিনীর রসদপত্র যোগানোই দায়।

রাত্রির অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারিদিক। সামনে কোথাও কোনপথ নেই। মিনা কি ভাবছে।

বলে ওঠে—লুণ্ঠন পর্বের শেষ কি এইখানে হবে সুলতান?

সুলতান কথার জবাব দিল না। ওর তীক্ষ্ণ কথাগুলো সুলতানের মনে একটা বিরক্তি আনে। কি এক দুর্বার নেশায় ওকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে। ভারতের ওই যেন প্রতীক। তাকে দেখাতে চায় সুলতান তার বীরত্বের পরিচয়।

কিন্তু বার বার আঘাত খেয়ে আজ চিন্তায় পড়েছে সে। ফিরতেই হবে তাকে। মিনা বলে চলেছে।

—ভারতবর্ষকে চেনেন নি সুলতান, এর বুকে আগ্নেয়গিরির তেজ। সেই তেজ যদি জেগে ওঠে সব কিছু অন্যায়কে এরা ধূলিসাৎ করে দিতে পারে।

হঠাৎ ছাউনির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগে। অন্ধকার রাতে কারা মশালের আলো নিয়ে আসছে, ওই আলোতে দেখা যায় অনেক লোকজন রসদ বাহী শকটে কি সব বয়ে আনছে, সঙ্গে রয়েছে সুলতানের সৈন্যরা।

অশ্বপৃষ্ঠে আসছে হাসাম খাঁ—সঙ্গে আর একজন অশ্বারোহী। পরণে ভারতীয় সেনানায়কের পোষাক।

সুলতানও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

হাসামখাঁ কুর্ণিশ করে এগিয়ে আসে। বালুকারাম চারিদিকে দৃষ্টি মেলে সুলতানের পট্টাবাস দেখছে। মাটিতে পা দেবে যায়। নরম কালান্ আর গালিচা পাতা।

পট্টাবাসের চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী। হাসামর্থাই পরিচয় করিয়ে দেয়।

—ইনি বালুকারাম, গুর্জরের সেনানায়ক।

সুলতান সব সংবাদই পেয়েছে। দেখেছে রাশিকৃত রসদ্ পত্র ভারতীয় বাহকরাই এনে মজুদ করেছে। আর কোন বাধা নেই। রসদের ও অভাব হবে না। পথ পরিষ্কার।

বালুকারাম সুলতানের কর চুম্বন করে জানায়।

—ভারতভূমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে!

সুলতান জীবনে অনেক বেইমানি করেছে। কপট সন্ধিও করেছে।

জানে এর কূট রাজনীতির অনেক মার প্যাঁচ। তাই ওই সেনানায়কের দিকে ধূর্ত সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। ভারতের স্বাগত জানাবার নমুনা ইতিপূর্বে যা সে দেখেছে তাতে তার তেমন আস্থা নেই।

বালুকারাম জানায়।

—পারমার মহাসেনা—গুর্জর রাজ্যের তরফ থেকে আমি জানাচ্ছি আপনাদের প্রত্যক্ষ বাধার সম্মুখীন হতে হবে না।

—সোমনাথ মন্দিরে তাহালে কোন বাধাই পাবো না আমি?

বালুকারাম সুলতানের দিকে চাইল, ওর দুচোখ জ্বলছে।

বালুকারামের সারা দেহে ওই চাহনি যেন তীরের ফলার মত বিঁধছে, বলে চলেছে বালুকারাম।

—মন্দির কর্তৃপক্ষ বাধা দেবে। সাধারণ মানুষ কিন্তু এই সৈন্যবাহিনী আর আপনাকে সোমনাথ পত্তন অবধি পথ দেবে। নাগরকোট মহাসেনা—পারমার রাজ আপনাকে বাধা দেবেন না।

সুলতান চিন্তিত ভাবে পায়চারী করছে! মনে হয় এ যেন কোন ছল চাতুরী। আশ্বাস দিয়ে ভিতরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সুযোগ বুঝে চরম আঘাত হানবে। প্রশ্ন করে সুলতান!

—প্রমান!

বালুকারাম জবাব দেয়।

—গুপ্ত সাহায্যের প্রকাশ্য কোন প্রমাণ দেওয়া কঠিন সুলতান। তবে হাসামখাঁ ও জানেন এসব তথ্য।

সুলতান আর হাসামখাঁয়ের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়।

—সর্ত কিছু আছে নিশ্চয়?

বালুকারাম এই কথাটাই জানাতে চেয়েছিল, কিন্তু এতক্ষণ কোন সুযোগ পায়নি। এইবার সুযোগ পেয়ে বলে।

—সর্ত, আমাকে গুজরাটের সিংহাসন দিতে হবে। আপনি যুদ্ধ শেষ করে ফিরে যাবেন, তারপর গুজরাট আসবে আমার হাতে।

হাসতে থাকে সুলতান, কঠিন সেই হাসির শব্দ সারা পট্টাবাসে একটা পৈশাচিক বিভাষিকার সৃষ্টি করে।

বালুকারাম বিস্মিত ভীত চাহনি মেলে দেখছে দীর্ঘ দেহী ওই দানবকে, দুচোখে একটা জ্বালার বিচ্ছুরণ।

হাসি থামিয়ে বলে সুলতান।

—আমি কসাই আর তুমি তারও অধম, শকুন। আমি গোশ্ত নিয়ে যাবো—আর মরা হাড় চুষেই খুশী থাকবে তুমি?

বালুকারাম অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। এ কথা তাকে সইতেই হবে। সুলতান এর সাহায্য না পেলেও সোমনাথ, গুর্জর রাজ্য লুণ্ঠন করবে। সেই সুযোগে তার যদি কিছু বখরা আসে তার জন্য বালুকারাম এসব কথা শুনতে রাজী।

সুলতান বলে চলেছে।

—এই মাত্র সর্ত ?

—হ্যাঁ !

—মঞ্জুর !

ইঙ্গিতে বালুকারামকে নিয়ে হাসাম খাঁ বের হয়ে গেল। সুলতানের মুখে একটা তীব্র হাসির ঝলক ওঠে, পট্টাবাসের ওদিকেই মিনাবাঈ এর মহল।

সেও কথাগুলো শুনেছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিষ্ঠুর কোন বিশ্বাসঘাতকের কালো একটা মুখ, ওরা চলে যেতেই মিনাবাঈ এদিকে আসে।

সুলতান খুশীভরা কণ্ঠে বলে।

—তোমাকেই খুঁজছিলাম মিনাবাঈ !

মিনা চুপ করে থাকে! সুলতান তীব্র পরিহাস ভরা কণ্ঠে বলে চলেছে

—বলেছিলে ভারতভূমি তাজ্জব ঠাই। তা বিলকুল সত্যি ! তাজ্জব এই হিন্দুস্থান। যে মূহূর্তে ভাবছিলাম হেরে গেছি, ফিরেই যেতে হবে বোধ হয়। সেই মূহূর্তে ওরা এসে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। রাজারা পথ দেবে—রসদ দেবে সাহায্য দেবে। বুঝলে—এইবার তোমাদের ধর্মদেবতা সোমনাথ দেবকে আমি চূরমার করে দোব।

—সুলতান! মিনাবাঈ চমকে ওঠে। ভীত কণ্ঠে আর্তনাদ বের হয়। হাসছে সুলতান।

—হ্যাঁ তোমাদের বিশ্বাস আমি ধুলোয় মিশিয়ে দোব। ডাইনে বায়ে—মর্মস্থলে সেই চরম পদাঘাতের লাঞ্ছনা এঁকে দিয়ে বলে যাবো তোমরা কাপুরুষ—বেইমান, আর তোমাদের নারীর ইজ্জৎ ?

সে তো আমার হাতের মুঠোয়।

মিনাবাঈ জেনেছে সেই চরম অপমানের কথা। আর্তনাদ করে সে।

—আমাকে হত্যা করুন সুলতান। এ অপমান আমার অসহ্য হয়ে উঠছে। হত্যা করুন।

—হত্যা আমি করি না বাঈ, তিলে তিলে মানুষের বিবেক—সত্যকে নিঃশেষ করে তাকে শয়তানের পায়ে বিকিয়ে দিতে বাধ্য করাই হত্যার চেয়ে অনেক বড়। তোমাকে, তামাম হিন্দুস্থানকে আমি তেমনি করে নিঃশেষে পরাজিত করে যাবো। ইতিহাসের পাতায় সেই কথা লেখা থাকবে, ভবিষ্যৎ মানুষ যদি শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে—তবে আবার আমারই মত কোন দানবের পায়ে তারা আবার মাথা বিকিয়ে দেবে।

ভারতবর্ষ! সত্যি তাজ্জব দেশ বাঈ!

মিনাবাঈ কাঁদছে কি দুঃসহ অপমান আর বেদনায়। রাতের অন্ধকারে সারা ধরিত্রী যেন কাঁদছে ওই অসীম বেদনা আর অপমানের গ্লানিতে।

সারা সোমনাথ প্রাঙ্গন অসহায় জনতার ভিড়ে ভরে উঠেছে। দূর দূরান্তর থেকে বিতাড়িত অগণিত নারী পুরুষ শিশু আসছে তাদের গ্রাম জনপদ শস্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করে। কোন প্রতিরোধ নেই!

দুর্বার বেগে এগিয়ে আসছে সুলতান মাহমুদ। পারমাররাজ পথ দিয়েছে। সুলতানী সৈন্য প্রবেশ করেছে গুজরাটে। জুনাগড়ের নবঘনদেব তবু প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়।

কিন্তু কোন সংবাদই নেই সাহায্যের।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ ভেবেছিলেন চারিদিকে দূত পাঠানো হয়েছে, কিন্তু ভারতের রাজারা কি নিরুপায়, নিরাসক্ত। তারা চান না কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি হোক।

ভৃগুকচ্ছ থেকে রাজা দৌলত রায় এসেছেন মাত্র, তাঁর সৈন্যদল নৌবাহিণী ও এসেছে প্রভাসপত্তনে। রাজা ভীমদেব তবু সাহস পান। ভৃগুকচ্ছ তখনকার দিনে সমৃদ্ধ বন্দর। এখান থেকে দেশ বিদেশে বানিজ্য তরী যাতায়াত করে। তাঁদের নৌবাহিণী নির্ভর যোগ্য, তাঁরা এসে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হন। নাগরকোট নাডোলের সামন্তরাজারাও এসেছেন সৈন্য নিয়ে।

পথে ওই বিরাট বাহিণীকে বাধাদেবার সামর্থ তাঁদের নেই। শত্রুকে একজায়গায় সমবেত করে তারা আক্রমণ হানতে চায়। রাজা নবঘন তাই জুনাগড় পরিত্যাগ করে এসেছে সোমনাথ পত্তনে।

ভীমদেবের এটা নিরাপদ মনে হয় না, ওদের গতিপথ রুদ্ধ করার প্রয়োজন, কিন্তু সে প্রতিরোধ নেই।

মরুস্থলীর সংগ্রামসিংহ তার দুদ্ধর্ষ কৌশলী বাহিণীনিয়ে শেষকালে সোমনাথ পত্তনে এসে হাজির হয়।

ভীমদেব বলিষ্ঠ কঠিন ওই সংগ্রামসিংহের দিকে চেয়ে থাকেন। তামাটে রং, দীর্ঘ দেহ, দুচোখে নীল একটা আভা।

সারা রাজস্থানে সে সুলতান মাহমুদকে বিধ্বস্ত করেছে বারবার।

—ভগবান সোমনাথ তোমার মঙ্গল করবেন।

সংগ্রামসিং গঙ্গাসর্বজ্ঞের পদধূলি নেয়।

—সোমনাথদেবের সেবায় আমি আত্মোৎসর্গ করেছি প্রভু। আশীর্বাদ করুন সে আত্মত্যাগ যেন সার্থক হয়।

সংগ্রামসিংহকেই নগরীর মূল তোরণ দ্বারিকাদ্বার রক্ষার ভার দেওয়া হল, ওই বাহিণীর সবাধিনায়ক নিযুক্ত হল সংগ্রাম সিংহ।

চামুণ্ডা রায় চিন্তায় পড়েছে। বালুকারাম সে বের হয়েছে সাহায্যের আশায়, মনেহয় সবৈব মিথ্যা। সে নিজের কাব সিদ্ধি করার জন্যই সুলতানের কাছেই গেছে বোধহয়।

নইলে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে সুলতান বিনাবাধায়, বালুকারামের কোন সংবাদ নেই।

গোপার সময় নেই, সে ও সেবিকাবাহিনী নিয়ে ব্যস্ত। এবার আক্রমণ হবেই, তাই তার ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। নগরে হাজারো মানুষ এসেছে আজ সোমনাথদেবের আশ্রয়ে।

তবু কাযের ফাঁকে ফাঁকে গোপার মনেপড়ে বালুকারামের কথা। সেই কতদিন আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই ছায়াস্নিগ্ধ পথের ধারে।

মানুষটাকে ঠিক চেনেনি গোপা প্রথমে। কিন্তু পরে ভুল বুঝেছিল সে। বালুকারাম দেশেব ডাকে এই বিপদের দিনে কি একটা কঠিন কাযের ভার নিয়ে বের হয়েছিল।

তারপর আর সংবাদ নেই।

বিভিন্ন রাজ্যে গেছে একটি আবেদন নিযে, বোধহয় নিষ্ফল হয়েছে। নাহয় শত্রু সৈন্যের হাতে বন্দীই হয়েছে। কে জানে বেঁচে আছে কি নেই।

গোপা এত কাযের মধ্যেও তার কথা ভোলেনি।

একটা দেশের বহু মানুষ ভীত ত্রস্ত হয়ে এসে এই প্রভাসপত্তনে আশ্রয় নিয়েছে। পথ দিয়ে চলেছে গোপা।

হঠাৎ আবছা অন্ধকারে ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে সরে দাড়াল পথের একপাশে। বোধহয় জোর কদমে কোন সংবাদবাহীর দল, নাহয় অন্য কোন রাজ্যের সৈন্যদল আসছে এইখানে।

কয়েকজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে, হঠাৎ সামনের তেজী সাদা ঘোড়াটাকে রাশটেনে থামাতে চেষ্টা করছে সোয়ারী, ঘোড়াটা সামনের দুপা তুলে দাপাচ্ছে।

—তুমি। বালুকারাম।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে গোপাবতী।

বালুকারাম ফিরছে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে। মাথার চুলে চোখের পাতায় ঘাস আর ধুলো মেশানো, পোষাক ও মলিন। বালুকারাম গোপাকে দেখে ঘোড়া থামিয়েছে।

—কি সংবাদ গোপা?

—ভালোই! কিন্তু সুলতান মাহমুদ শুনছি এগিয়ে আসছে। কোন বৃহৎ বাধা প্রতিরোধ তো কেউ দিতে এগিয়ে এ'ল না?

বালুকারাম জানতো তাকে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এখানে। প্রভাসপত্তনের কেউ জানবে না আসল সংবাদ। বালুকারামের হীন স্বার্থ সিদ্ধির কথা তাদের অজানাই থাকবে।

সুলতান মাহমুদ ও তাকে কথা দিয়েছে বালুকারামের ভাগ্যে সে গুজরাটের সিংহাসন তুলে দেবে। বালুকারাম জবাবদেয় বিরক্তিভরে।

—ভারতবর্ষের সব রাজারাই আজ বিলাস ব্যসনে ডুবে আছে গোপা। পরস্পর হানাহানি রাজ্য বিস্তার নিয়ে যুদ্ধ করবে না সমবেত ভাবে বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করবে? একথা আজ তাদের ভাববারও সময় নেই।

গোপা ও অনুমান করেছিল এমনি বিপদের কথা।

—তবে!

বালুকারাম চিন্তিত মনে জবাব দেয়।

—সোমনাথ দেবের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে গোপা। তবু আমাদের চেষ্টা করতেই হবে। শত্রুকে আমারা প্রাণের রক্ত বিন্দু দিয়ে বাধা দোব।

গোপা ও নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস করে।

রাত নামছে। গোপা বলে।

—তুমি পথক্লান্ত।

—হোক। তবু এ সংবাদ নিয়ে এখুনি আমাকে মন্দির চত্তরে যেতে হবে, সর্বজ্ঞকে আরও কিছু সংবাদ দেবার আছে। পরে সাক্ষাৎ হবে গোপা।

গোপা বাড়ীর দিকে চলে গেল। তারার আলো পড়েছে বালুকারামের মুখে, সে প্রথমেই নিখুঁত অভিনয় করেছে। গোপাও তার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে।

বালুকারাম নিজের অভিনয়ে নিজে মুগ্ধ হয়। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। সুলতানের বাহিনী থেকে কয়েকদিনের পথ অগেই সে বের হয়ে এসেছে। সুলতান ও চায় বালুকারাম সোমনাথে ফিরে গিয়ে এইবার সেখানে গুপ্তভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করুক।

তারই বেশী প্রয়োজন।

তারই নির্দেশে ফিরেছে ধূর্ত বালুকারাম। এবার এইখানেই তার আসল কর্মক্ষেত্র।

সন্ধ্যার পর থেকেই প্রভাস পত্তনের প্রাকারের অন্য সব প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যায়, পরিখায় ঢোকানো রয়েছে সমুদ্রের জলরাশি, একটি মাত্র মূল প্রবেশ পথেও কড়া প্রহরা। কোন বিদেশীকে তারা সূর্য্যাস্তের পর ঢুকতে দিচ্ছেনা।

প্রাকারের বাইরে বিস্তীর্ণ মাঠে বাগানের নারকেলকুঞ্জে বহু অসহায় মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সেই রাত্রের মত বালুকারাম এগিয়ে আসে প্রধান তোরণে পরিখার উপর ভারি কাঠের সেতুটা নামানো রয়েছে। কটি অশ্বারোহীকে দেখে প্রহরীরা এগিয়ে আসে।

বালুকারামকে ও ওরা যেন চেনে না। পরিচয় দেয় সে।

—সেনানায়ক বালুকারাম।

—পরিচয় চিহ্ন ?

বালুকারাম মেরজাই-এর বুক পকেট থেকে নিশানা বের করে দেখালো, তার মুখে পড়েছে একটা একচোখো লণ্ঠনের এক ঝলক আলো।

মূল প্রবেশ দ্বারের প্রহরীদের প্রধানও এগিয়ে এসে তাকে দেখছে। চেনামুখ বলে মনে হয়। মরুস্থলীর সেই সামন্তরাজ মৃত খোঘাবাবার সন্তান সংগ্রামসিংহ ; বালুকারামের মুখটা তার চেনা। অবাক হয় সংগ্রামসিংহ। প্রশ্ন করে।

—আপনাকে কোথায় দেখেছি ?

হঠাৎ মনে পড়ে সংগ্রামসিংহের পারমার রাজ্যের মধ্য দিয়ে আসবার সময় ওদের দেখেছে সে। সংগ্রামসিংহ সুলতানের সৈন্যদলকে মরুভুমির মধ্যেই শেষ করে দেবার চেষ্টা করেছিল। বিপর্য্যস্ত বাহিনী নিয়ে সুলতান ফিরে যাবে কি না ভাবছে।

সেই দুর্দিনে কয়েকজন ভারতীয় সেনানীর সঙ্গে দেখেছিল এক বিদেশী সেনানায়ককে রসদপত্র নিয়ে যেতে।

সংগ্রামসিংহ বাধা দিয়েছিলো, সেই ভারতীয় সেনানায়কই জানায় তাকে পারমাররাজকে সুলতান সংবাদ দিয়েছে যে সে ফিরে যাচ্ছে, আর অগ্রসর হবে না। রসদপত্র তার নেই, তিনদিনের মত রসদপত্র পানীয় জল দিলে সে আবার আজমীরেই ফিরে যাবে !

তাই এসব চলেছে।

সংগ্রামসিংহ তার দলবল তাদের গতিরোধ করে নি। কিন্তু পরে বুঝেছিল সে সব মিথ্যা। আজ সন্ধ্যায় এই লণ্ঠনের আলোয় হঠাৎ সেই মুখটা চিনতে পারে, সেদিন মশালের আলোয় দেখেছিল বালুকারামকে অর্বুদপর্বত অঞ্চলের একটা গিরিপথে। সংগ্রামসিংহের মুখচোখ কাঠিন্যে ভরে ওঠে।

পরিচয়পত্রটা নিজে হাতে নিয়ে আলোয় দেখতে থাকে। বালুকারাম অধৈর্য হয়ে বলে।

—গুর্জরের সেনানায়ক বালুকারামকে চেন না কোন দেশের সৈনিক তুমি ?

সংগ্রামসিংহ কঠিন স্বরে বলে।

—অর্বুদ পর্বতের গিরিপথে বানাস নদীর অরণ্যে আজ থেকে দশদিন আগে রসদগাড়ীর সঙ্গে যাকে দেখেছিলাম সেই সেনানায়ক আর আপনি এক না ভিন্ন তাই পরখ করছিলাম।

বালুকারামের মুখ এক নিমিষের জন্য রক্তহীন পাংশু হয়ে ওঠে। কথটা কঠিন সত্য। তবু বালুকারাম পরক্ষণেই বেশ কঠিন কণ্ঠে শোনায়।

—পরখ করা শেষ হলে পথ দিন, না হয় গঙ্গাসর্বজ্ঞের কাছে আমায় নিয়ে চলুন, জরুরী সংবাদ তাকে দিতে হবে।

কি ভেবে সংগ্রামসিংহ তাকে প্রবেশের অনুমতি দিল। বালুকারাম প্রহরীদের অধিনায়ককে দেখবার চেষ্টা করে, কিন্তু অল্প আলোয় ঠিক ঠাওর করা যায় না।

সংগ্রামসিংহ কিন্তু বালুকারামকে চিনে রাখে।

সহরের মধ্যে ভীতত্রস্ত জনতা, চারিদিকে সাজ সাজ রব। অন্ধকার রাতে প্রাকারে মশাল জ্বলছে, ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সৈন্যরা ঘোরাঘুরি করছে, বালুকারাম এই প্রস্তুতির সাড়া দেখে বিস্মিত হয়। অনেক অপরিচিত সৈন্যও এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে। সোমনাথ পত্তনও বসে নেই।

মন্দির তোরণের প্রহরাপ্রাকার পার হয়ে মূলচত্বরে এগিয়ে আসে বালুকারাম। এবার তাকে আরও কঠিন পরীক্ষকের সামনে উপস্থিত হতে হবে। জানে, গঙ্গাসর্বজ্ঞ চতুর সন্ধানী লোক। গোপাকে যত সহজে বিশ্বাস করাতে পেরেছে, মিথ্যা কথাটা তত সহজে গঙ্গাসর্বজ্ঞকে বিশ্বাস করানো যাবে না। তবু বালুকারাম এগিয়ে চলে গঙ্গাসর্বজ্ঞের আবাসের দিকে।

ম্লান প্রদীপের আলোয় গঙ্গাসর্বজ্ঞ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বালুকারাম বলে চলেছে।

—সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল সর্বজ্ঞ, কোন রাজাই সুলতানকে বাধা দিতে সাহস করে নি।

—অবন্তীরাজ ভোজদেব ?

বালুকারাম তার কাছে প্রেরিত দূতকে নিজের হাতে হত্যা করেছে। কোন সংবাদই যায়নি সেখানে। তাই বালুকারাম জবাব দেয়।

—তিনি নিরুত্তর।

বালুকারামের মনে বিশ্বাস জন্মেছে গঙ্গাসর্বজ্ঞ তার কথা সব বিশ্বাস করেছে। এবার তাই সাহস পেয়ে বলে।

—সুলতান কিছু অর্থ স্বর্ণ পেলে হয়তো ফিরে যেতে পারেন। গঙ্গাসর্বজ্ঞ ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করেন।

—এ সংবাদ তুমি কি করে জানলে ?

ওর সন্ধানী দৃষ্টির সামনে চমকে ওঠে বালুকারাম, কি যেন মস্ত একটা ভুল কথাই বলে ফেলেছে তার অজানতে। তই শোধরাবার চেষ্টা করে সে !

—আমার অনুমান মাত্র।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ বলে চলেছেন।

—একথা ভাববার প্রয়োজন দেখি না বালুকারাম। আমরা বাধা দোব, প্রাণ দোব, তবু বিদেশীর কাছে আত্মবিক্রয় করবো না।

ওর সব কথাই যেন বলা হয়ে গেছে। বালুকারামকে বিশেষ কাযে পাঠিয়েছিলেন, যে কোন কারণেই হোক তা ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, বালুকারাম ওই দস্যুর কাছে দয়া প্রার্থনা করার আবেদনও জানিয়েছে।

ওর যেন আর কোন প্রয়োজন নেই। গঙ্গাসর্বজ্ঞের জরুরী কায আছে। তিনি বালুকারামকে বলেন।

—তুমি এখন আসতে পারো।

বালুকারাম বের হয়ে গেল। গঙ্গাসর্বজ্ঞ স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন।

মন্ত্রণালয়ে পায়চারী করছেন ভীমদেব। তিনি বালুকারামের উপর কোনদিনই খুশী ছিলেন না। ও কাযের লোক সত্যি, তবে অতিমাত্রায় কূট কৌশলী। তাকেই একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তার সে কার্য পূর্ণ হয়নি।

ভীমদেব বিরক্তি ভরে বলেন।

—অপদার্থ। শুধু শুধু ওর আশ্বাসে বৃথাই সময় নষ্ট করলাম আমরা।

মহানায়ক চামুণ্ডা রায় একদিকে চুপ করে বসেছিল, সমস্ত কথাগুলোই সে শুনেছে। বালুকারাম যে এমনি কথা শোনাবে তা আগেই জানতো। মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়, আবার ভাবনাও জাগে বোধহয় একাই সে সুলতানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছে, প্রতিশ্রুতি আদায় করে এনেছে, গুর্জরের সিংহাসনের মূল্যে সে সোমনাথের মর্যাদা বিকিয়ে দেবে।

হঠাৎ কার আবির্ভাবে সকলেই এরা বিস্মিত হয়।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ নবাগত এই লোকটিকে চেনেন, সংগ্রামসিংহ।

সুপরিচিত হয়ে উঠেছে সে ইতিমধ্যে।

ওকে অসময়ে আসতে দেখে গঙ্গাসর্বজ্ঞ বিস্মিত চাহনি মেলে ওর দিকে চাইলেন। সংগ্রামসিংহই এগিয়ে এসে অভিবাদন করে—জয় সোমনাথদেবের জয়।

—কি সংবাদ?

সংগ্রামসিংহ বলে—একটু গোপন সংবাদ ছিল সর্বজ্ঞদেব?

—মন্ত্রণাসভার মাঝে তা পেশ করতে পারো।

সংগ্রামসিংহ বলে ওঠে।

—একটু আগে একজন সেনানায়ককে আসতে দেখলাম।

—হ্যাঁ। ভীমদেব প্রশ্ন করেন—তার সম্বন্ধে কোন বক্তব্য আছে? সংগ্রাম সিংহ বলে।

—ওকে আজ থেকে দশদিন আগে অর্বুদরাজ্যের বানাস নদীর তীরের অরণ্যে সুলতানের একজন সেনাপতির সঙ্গে রসদপত্র নিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

সারা মন্ত্রণাসভায় স্তব্ধতা নামে। শ্বেতপাথরের দেওয়ালে ওই কথাগুলো প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

ভীমদেব চমকে ওঠেন। গঙ্গাসর্বজ্ঞের দুচোখ জ্বলে ওঠে, চামুণ্ডা রায় অবাক হয়েছে। গঙ্গাসর্বজ্ঞের কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—এ সংবাদ সত্য?

সংগ্রামসিংহ জবাব দেয়।

—যতটুকু জানি বললাম। আমি সেদিন বাধা দিতে চেয়েছিলাম, বালুকারামই আমাকে জানায় সুলতান ছিন্ন বিপর্যুস্ত বাহিনী নিয়ে আজমীর ফিরছে—রসদ পেলেই তিনি ফিরে যাবেন।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ ভীমদেব কি ভাবছেন, সংগ্রামসিংহ বলে।

—এ তথ্যটুকু নিবেদন করা দরকার মনে করেই আপনাদের বিরক্ত করে গেলাম।

—তোমার কর্তব্যই করেছো সংগ্রামসিংহ। তুমি এখন যেতে পারো।

একথাটা এতদিন ভাবেন নি গঙ্গাসর্বজ্ঞ। নিজেদের মধ্যেও এই বিপদের সুযোগ নিয়ে যে কেউ এমন হীন চক্রান্ত করতে পারে তা বিশ্বাসই করা যায় না। কিন্তু এসমন্ধে সাবধান হবার দিন এসেছে।

এবার বুঝতে পারেন বোধ হয় বিভিন্ন রাজ্যে দূত পাঠানো হয় নি, না হয় দূত পৌঁছেনি। বালুকারাম নিজে গিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের নরপতিদের সঙ্গে কোন হীন সন্ধি করে আসে নি তাই বা কে জানে ?

এসব যাচাই করার সময় নেই।

সুলতান এগিয়ে আসছে। ওই দস্যু ঘরে প্রবেশ করলে বাইরের সব পথই বন্ধ হয়ে যাবে।

শুভাও এই কথাগুলো শুনেছে। সে আশা করেছিল নিশ্চয়ই অবন্তী রাজ্যের বিপুল সৈন্য বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবে দেবশর্মা। দেবশর্মাকে সে জানে, কিন্তু বিস্মিত হয় সেদিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে।

সময় আর নেই। শুভাও বুঝেছে সোমনাথের বিপদের কথা, কি ভাবছে সে। মন্দিরের দেবদাসীদের মন্দির চত্বর থেকে বের হবার রীতি নেই। হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ সামন্তদেবকে মন্দিরে আসতে দেখে সে খুশীই হয়।

সামন্তদেবও খুশী হয়েছে ওকে দেখে। শুভা ওকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গেল। অবাক হয় সামন্তদেব। শুভা তো সব ছেড়ে এসেছে এইখানে আর তার গোপন কি কথা থাকতে পারে? শুভাই বলে চলেছে।

—তোমাকে দ্রুতগামী অশ্ব দিচ্ছি। তুমি অবন্তীপুরে একটা জরুরী পত্র নিয়ে গিয়ে সেনাপতি দেবশর্মাকে দেবে। খুব গোপন পত্র।

শুভা জানে গোপার কাছ থেকেই অশ্বের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সামন্তদেব অবাক হয়।

—তোমার জরুরী প্রয়োজন দেবশর্মার কাছে।

—ওসব তর্ক করার সময় নেই সামন্তদেব। তুমি যাবে বণিকের বেশে, কেউ যেন জানতে না পারে কি উদ্দেশ্যে তুমি চলেছো। এ অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে সামন্তদেব।

সামন্তদেব চুপ করে থাকে।

—কথা দাও। শুভা অনুনয় করছে তাকে। সে জানে এই বিপদের কথা শুনলে দেবশর্মা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। তার সাহায্য আজ সোমনাথ পত্তনের বিশেষ প্রয়োজন।

দেবশর্মার গৌড় অভিযানের আর দেরী নেই। অবন্তীরাজ ভোজদেবের চর অনুচরবৃন্দ সংবাদ আনছে, পল্লব বাহিনী কলিঙ্গের দিকে যাত্রা করেছে। তারা এগিয়ে চলেছে। শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী পার হয়ে গোদাবরী নদী দিকে অগ্রসর হচ্ছে তারা।

দেবশর্মার সৈন্যদলও প্রস্তুত। তারা এইবার যাত্রা করবে। একটি বাহিনী ওদের অগ্রগতি রোধ করবে চিল্কাহ্রদের তীরে রম্ভাবতী নগরের কাছে। অন্যবাহিনী গিয়ে কলিঙ্গ এবং গৌড় অধিকার করবে।

ভোজরাজসভায় যথারীতি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলেছে। সুন্দর নগরীতে আনন্দ কোলাহলের অভাব নেই। তবু রাজধানীতে এসে উপস্থিত হয়েছে শত শত গৃহহারা জনতা। গ্রামজনপদ শ্মশানে পরিণত করে একজন বিদেশী দানব এগিয়ে আসছে, আর এইসময় এদেশের একজন রাজা অন্যদেশ গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে চলেছে।

নানা সংবাদ আসে লোকমুখে, হত্যা আর ধ্বংসের সংবাদ। গুজরাট থেকে বণিকের দলও আর আসছে না। সে দেশের সব পথ যেন রুদ্ধ।

দেবশর্মা সেদিন সেনানিবাস থেকে ফিরছে। সব আয়োজন প্রস্তুত। বিরাট বাহিনী তৈরী হয়েছে সাজসাজ রবে।

তারা দুএকদিনের মধ্যে শুভক্ষণ দেখে যাত্রা করবে। রাজসভায় তাদের বিদায় সমর্দ্ধনা জানাবার আয়োজন হয়েছে, বঙ্গ বিজয়ে চলেছে রাজা ভোজের বাহিনী।

ক্লান্ত দেবশর্মা তার আবাসে ফিরেছে, আবার রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে সুদূরে। একক একটি মানুষ। বারবার মনেপড়ে সেই হারানো রাজনটীর কথা। কেউ নেই যে তার কাছে বিদায় নেবে সে।

হঠাৎ সামন্তদেবকে দেখে অবাক হয় দেবশর্মা। দীর্ঘ কতদিন ধরে লোকটা হারিয়ে গেছল। শুনেছিল শুভার সঙ্গে নাকি সোমনাথ পত্তনেই গেছে। জীবনের শেষ ক'টা দিন সমুদ্র তীরেই কাটিয়ে দেবে সেই তীর্থে।

তাকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয় দেবশর্মা।

—তুমি!

সামন্তদেবের দেহে দীর্ঘ পথশ্রম আর বয়সের নিবিড় ক্লান্তি। পথের দুদিকে দেখে এসেছে সে ভীত ত্রস্ত জনতার ভিড়। সুলতানের সৈন্যদল নগরকোট ছাড়িয়ে গিরিনগরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বৃদ্ধ সামন্তদেব জীর্ণ জতুবন্ধ চিঠিখানা এগিয়ে দেয়।

—আপনার এই জরুরী পত্র নিয়ে এসেছি দেবশর্মা।

—পত্র! কে দিয়েছে?

—দেবদাসী শুভা।

দেবদাসী শুভা! চমকে ওঠে দেবশর্মা। এতদিন সে ছিল রাজনটী। তার লাস্যে সে রাজসভার মনোহরণ করত। অর্থ খ্যাতি প্রতিষ্ঠার শিখরে উঠেছিল সে।

আজ সব অর্থ প্রতিপত্তি নিঃশেষে ত্যাগ করে সে দেবতার চরণে স্মরণ নিয়েছে। দেবশর্মা তার এই ত্যাগকে আজ মহিমাময় বলেই মনে করে।

চিঠিখানা সাগ্রহে খুলে পড়তে থাকে।

কয়েকটি ছত্র, সব ছত্র কটি দেবশর্মার মনে আঘাত করে। আকুল আগ্রহে সোমনাথ কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন ভোজদেবের সাহায্য আসবে। তিনিই একমাত্র যোগ্য নরপতি যিনি বিদেশী সুলতানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারতেন, কিন্তু তা হয় নি।

বিদেশী শত্রু আজ বিনা বাধায় গুজরাটে প্রবেশ করেছে, এগিয়ে আসছে ধ্বংসের করাল মূর্তিতে। হাজারো গ্রাম জনপদ তার পদভরে ধূলিসাৎ হয়েছে, আকাশ বাতাসে উঠেছে ক্রন্দনরোল।

সোমনাথদেবের পবিত্র মন্দিরও আজ বিপদাপন্ন।

শুভা তাই অনুবোধ জানিয়েছে দেবশর্মার কাছে—কাতর অনুরোধ। দেবশর্মা চিঠিখানা পড়ে বলে।

—কোন সংবাদই আমরা পাইনি, কোন দূতও আসেনি সেখান থেকে।

সামন্তদেব চুপ করে থাকে, সে এসবের কিছুই জানে না।

রাজা ভোজদেব সভায় আজ জ্যোতিষীদের আহ্বান করেছেন। বিজয় অভিযানে তাঁর বাহিনী যাত্রা করবে, তার জন্য শুভক্ষণ দেখা দরকার। সারা নগরীকে তিনি উৎসব সাজে সজ্জিত করে তুলেছেন। তোরণে তোরণে বাদ্যভাণ্ড বসেছে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই। সভায় সকল সভাসদরাই সমবেত।

সেনাপতি দেবশর্মাকে আসতে দেখে ভোজরাজ ওর দিকে চাইলেন।

দেবশর্মা কাল বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। দুচোখের পাতা বুজতে পারেনি। বার বার ভেসে উঠেছে হাজারো মানুষের কাতর কান্নার রোল, তাদের ব্যথাকাতর ভীত মুখগুলোর সঙ্গে মিলছে শুভার সেই কান্নাভরা ডাগর দুচোখের আকুতি। দেবশর্মা জীবনে

অনেক যুদ্ধ জয় করেছে। আজ এ তার কাছে জীবনের ব্রতে আত্মনিবেদন করার আহ্বান বলেই মনে হয়। ভোজদেব ওর কথায় বিস্মিত হন। দেবশর্মা বলে চলেছে।

—সুলতান মামুদ সোমনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তার আগেই ভোজরাজের কাছে মন্দির কর্তৃপক্ষ সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন, কিন্তু সে দূতকে কারা হত্যা করেছে; সংবাদ এসে পৌঁছেনি। কাল আবার আবেদন এসেছে।

চিঠিখানা এগিয়ে দেয় দেবশর্মা ভোজদেবের হাতে।

সারা সভায় স্তব্ধতা জাগে। সভাসদ মন্ত্রীরাও দেখেছে রাজধানীতে বিতাড়িত জনতার ভিড়, একটা সর্বনাশ যে ঘটে চলেছে তারাও অনুমান করেন। আজ তারই সিদ্ধান্তই নিতে হবে এই মুহূর্তে।

দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সুলতান বিনা বাধায় এগিয়ে চলেছে, এখন তাকে পিছন থেকে আক্রমণ করা ছাড়া পথ নেই।

ভোজদেবের মুখ চোখ কঠিন হয়ে ওঠে।

—মূর্খের দল, এ সংবাদ আগে তারা পাঠায় নি কেন? বেশ বুঝেছি গুজরাট আজ গুপ্তচরের ভিড়ে ভরে গেছে, লালসা একটা জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে।

দেবশর্মা রাজার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। গৌড় বিজয়ের আদেশ প্রত্যাহার না করলে দেবশর্মা পদত্যাগ করে নিজের অনুচরদের নিয়েই যথাসাধ্য বাধা দেবার জন্য এগিয়ে যাবে গুজরাটের পথে।

—দেবশর্মা!

ভোজদেবের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

—এ সময় গৌড় বিজয় বন্ধ থাক, সমগ্র বাহিনী নিয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো বিদেশী সেই দস্যুর উপর। তার সোমনাথ লুণ্ঠন

পর্বের সমাধি রচিত হবে গুজরাটের প্রান্তরে। তুমি আজই যাত্রা কর দেবশর্মা।

দেবশর্মার কণ্ঠে আজ মহারাজার জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়।

প্রাকারে তুরীধ্বনি ওঠে। সহরে সৈন্যাবাসে—সাড়া জাগে। অবন্তীরাজ ভোজদেবের বাহিনী চলেছে সোমনাথের দিকে।

কালাবিলম্ব করার সময় নেই। ওরা যাত্রা করে। দেবশর্মার সারা অন্তরে আজ দুর্বার তেজ। জীবনে এই যুদ্ধ তার সার্থক যুদ্ধ। শুভাকে মনে পড়ে।

এ সংবাদ বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে সোমনাথে পৌঁছবে। একজন খুশী হবে। সোমনাথের সেবিকার এ আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। ভগবান সোমনাথ তাকে এ বিজয়ে সাহায্য করবেন। অশ্ব রথ গজবাহিনী এগিয়ে চলে।

দুটি নারী এই ধ্বংস আর বিপর্যয়ের মাঝে ও ক্ষণিকের জন্য তাদের নারীমনের সেই বেদনা আর আনন্দকে ভুলতে পারে নি।

গোপাবতীও সংবাদটা জেনে ফেলেছে।

সে নটী শুভার কথায় সামন্তদেবকে গোপনে অশ্ব এবং পাথেয় দিয়ে সাহায্য করেছে।

গোপাও খুশী হয়েছে শুনে।

সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার মধ্যে শোনা যায় সমুদ্রের অশান্ত গুঞ্জনধ্বনি। ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। গোপার মুখে কৌতুকের আভাস। আজ মনটা খুশীতে ভরা।

বালুকারাম ফিরে এসেছে। তাই খুশী মনেই বলে গোপাবতী।

—তাহলে সংসার সম্পদ ছেড়ে বের হয়ে আসার কারণটা এইবার বুঝলাম। অবন্তীরাজের সেনাপতি কিন্তু একটি মস্ত কাপুরুষ না হয় আহাম্মুক।

শুভা জবাব দিল না। কি ভাবছে। আকাশের তারাগুলো জ্বলছে নিবিড় বেদনায়, সমুদ্রের ঢেউ-এর মাথায় হাজারো মানিকের ঝলমলে আভাস।

শুভা জবাব দেয়।

—ভালবাসার এত বেদনা তা বুঝিনি গোপা, মানুষকে ভালবাসলে শুধু জ্বালা আর বেদনাই পেতে হয়, তাই দেবতাকেই ভালবাসতে এলাম, যে কোনদিন আঘাত দেয় না।

গোপা বলে।

—প্রতিদান কি পেয়েছো তুমি ?

—প্রতিদানের আশা নিয়ে তো ভালোবাসিনি গোপা।

—নিজেকে শুধু ভুলতে চেয়েছো ?

শুভা ওর দিকে চাইল, এর জবাব কি সে দেবে জানে না। গোপাবতীর চঞ্চল দুচোখে আনন্দের আভাস। বলে শুভা।

—সে কথার জবাবে আজ ফল নেই গোপা। তবু কামনা করি তুমি যেন ভালবাসায় সার্থক হও। এতবড় দুনিয়ার একজনকে ভালবেসে ছোট একটি ঘরে যে শান্তি পেতে চায় মানুষ সেই শান্তি তুমি পাও গোপা।

গোপা হাসছে—বাবাঃ! এত অভিমান।

পরক্ষণেই মনে পড়ে সামনের বিপদের কথা। বলে গোপা।

—কিন্তু এই বিপদের মাঝে ঘর বাধার স্বপ্ন যে বাতুলতা শুভা।

শুভা জবাব দেয়।

—ঝড় চিরকাল থাকবে না গোপা। এ ঝড় একদিন থামবে, আবার শান্তি নামবে এ মাটিতে, আমরা সেই দিনটির আশাতেই বুক বেঁধে থাকবো গোপাবতী। তোমার সাধনা—কামনা সফল হবে। বালুকারাম বীর, তার যোগ্যা তুমি।

গোপা কথা বলেনা। এ তার অন্তরের গোপন স্বপ্ন। অন্ততঃ একজনের কাছে প্রকাশ করে সে খুশী হয়েছে।

গোপা ও কথা ভেবেছে। সাগ্রহে দুটি নারী কোন আগামী ভবিষ্যতের দিকে পরম আশাভরে চেয়ে আছে।

মন্দিরে যথারীতি ভজন চলেছে।

কোথাও কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। আগামী দিনের কঠিন ভবিষ্যৎকে ওরা এই পূজা অর্চনার সমারোহের মধ্যে ভুলে থাকতে চায়। শুভাই বলে।

—রাত হয়ে গেছে গোপা।

গোপা এতক্ষণ কি স্বপ্নকল্পনার অতলে সমাহিত ছিল। ওর কথায় তার চমক ভাঙ্গে। বাড়ীতে ফিরতে হবে তাকে।

মনে একটা খুশীর সুর ওঠে।

বলে গোপা।

—প্রেম করে এত দুঃখ পেতে হয় তাতো জানতাম না শুভা।

শুভা হাসে, মলিন বেদনাময় একটু হাসি। বলে সে, —জীবনে অনেক কিছুই পেয়েছিলাম গোপা, অর্থ সম্পদ প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সবকিছু, কিন্তু ওই ভালবাসার স্বাদ বুঝিনি। নটীর জীবনে তার কোন ঠাঁই নেই, হঠাৎ ভুল করেই তাকে ভালবেসেছিলাম। অবশ্য আজ বুঝছি ভুল নয়, অনেক বেদনায় নিজেকে চিনেছি!

গোপা বেদনার স্বাদ পায়নি, তার মনে নিবিড় ভালবাসার সুর জাগে। সে স্বপ্ন দেখে, বিচিত্র মধুর স্বপ্ন।

মনে হয় সব বাধাবিপদ তারা উত্তীর্ণ হয়ে নোতুন একটি শান্তির জগৎ ফিরে পাবে।

সমুদ্রের গুঞ্জন ধ্বনিতে বালুবেলা আকাশসীমা ভরে ওঠে, তার বুকে আলোর তুফান চলেছে, পিছনে ধ্যানমগ্ন সোমনাথ মন্দির চূড়ার স্বর্ণকলস কি পূর্ণতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একফালি চাঁদের আলোর স্পর্শ জাগে আঁধারের মাঝে। তার মনের কামনার ক্ষীণ দীপ্তির মতই সে আভা আকাশতলে একটি নোতুন গ্রহের সৃষ্টি করেছে।

বালুকারাম রাতের অন্ধকারে প্রভাস সঙ্গম ছাড়িয়ে সরস্বতীর তীরের নারকেল ঝাউ আর কলাগাছের বাগান পার হয়ে চলেছে মিত্রপাদের আশ্রমের দিকে। সেখানে একটা জরুরী নির্দেশনামা পৌঁছে দিতে হবে।

হাসামখাঁ জাল পেতেছে নিপুণভাবে, প্রভাসপত্তনের সব সংবাদ ওইখান থেকেই নিয়মিত ভাবে পাচার হচ্ছে। কত পদাতিক অশ্বারোহী সৈন্যদল, কোন রাজার কি পরিমাণ সাহায্য আসছে কি অস্ত্র শস্ত্র মজুত আছে, কি প্রতিরোধের আয়োজন দুর্গ প্রাকারে হয়েছে সেটুকু পর্যন্ত সংবাদ যায় সেখানে।

আলবেরুনী প্রথম প্রথম বোঝেনি ব্যাপারটা। মিত্রপাদের তান্ত্রিক আশ্রমে সে ছিল তার নিজের প্রয়োজনে। ভারতীয় ধর্মের একটা অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয় এই তন্ত্রকে।

ভেবেছিল তন্ত্র সমন্ধে কোন প্রাচীন গ্রন্থ—মূল্যবান পুঁথি বা প্রামাণ্য উক্তি সে পাবে মিত্রপাদের আশ্রমে। মিত্রপাদও তাকে সমাদরে রেখেছে. সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিছু গ্রন্থ আনিয়ে দেবে।

আলবেরুণী তার গবেষণার কাজে প্রভূত সাহায্য পাবে এই আশাতেই ছিল এই নির্জন আশ্রমে। মাঝে মাঝে প্রভাসপত্তনে ও এসেছে। সোমনাথ পত্তনের প্রাকারবেষ্টিত নগরীও দেখেছে।

দেখেছে সোমনাথ মন্দিরের বৈভব, প্রাচীন হিন্দুধর্ম শৈব মতের অনেক রীতি নীতি।

উদার এই ধর্মমত। ওরা সহরে মন্দির চত্বরে প্রবেশের কোন বাধা রাখেনি, সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছে সে। মূলতানের সূর্যমন্দিরও দেখেছে, কিন্তু তাদের তুলনায় সোমনাথ একটা সাম্রাজ্য বিশেষ, শ্বেতপাথরের বিরাট বৃষ মন্দিরের দেবতার দিকে মুখ করে আছে, তার কারুকার্য গঠন শৈলীও অপূর্ব। ওই প্রস্তরমূর্তি যেন প্রাণময় বিশ্রামরত, এখুনি উঠে দাঁড়াবে।

সামনের তোরণ দ্বারে শ্বেতমর্মরের বুকে ব্রাকেটের কায, ওই কঠিন পাথর শিল্পীর অস্ত্রের কাছে মাখনের মত কোমল একটি বস্তুতে পরিণত হয়েছে। জাফরীর নমুনা সারা হিন্দুস্থানে এমন নিখুঁত দেখেনি।

শ্বেতপাথরের মেজের ওদিকে মুলমন্দিরের সীমানা। বিরাট চন্দনকাঠের দরজার উপর রৌপ্যতবক এবং হাতির দাঁতের টুকরো কেটে কেটে বসানো হয়েছে মনোরম ভঙ্গীতে। সমস্ত দরজায় ওই নিপুণ শিল্পশৈলী তার ভাবময়, গাম্ভীর্যকে প্রকট করেছে! নাট-মন্দিরের উপর চালচিত্র নেমে এসেছে। শ্বেত প্রস্তরের তৈরী বিরাট প্রস্ফুটিত শ্বেতকমল। সহস্র দল মিলে ধরেছে সে সারা মণ্ডপ জুড়ে।

এমনি কারুকার্য কিছু দেখেছে সে অর্বুদ পর্বতে দৈলবারার মন্দির চত্বরে, কিন্তু এই কারুকার্য এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে আরও মহান আরও অর্থবহ। পিছনে সমুদ্রের শীকরসিক্ত বাতাস এসে এর ধ্বজায় সাড়া তোলে; আসমুদ্র হিমাচল এব মহিমা পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

মন্দিরের রক্ষার ব্যবস্থাও তেমনি সুদৃঢ়। প্রাকার বেষ্টিত মূল মন্দির চত্বর; তার পর যাত্রীনিবাস ধর্মশালা অতিথিগৃহ। বিরাট নগরী প্রভাসপত্তন, স্বয়ং সম্পূর্ণ সে। অসংখ্য মিষ্ট পেয় জলভরা সরোবর, হর্মমালা, সুসজ্জিত বিপনী। প্রশস্ত রাজপথে দেশ বিদেশের নাগরিকদের দেখা যায়।

সারা প্রভাসপত্তন নগরীকে ঘিরে আকাশছোঁয়া সুদৃঢ় প্রাকার তার পর অতল জলভরা পরিখা। মাত্র একটি সেতু দ্বারা বাইরের সঙ্গে এর যোগাযোগ, সে সেতুও রাত্রির অন্ধকারে তুলে নেওয়া হয়। প্রাকাবে থাকে সাবধানী প্রহরার দল।

আল্‌বেরুণী একে কেন্দ্র করে দেখেছেন সারা ভারতের মর্মস্থল। বিভিন্ন ধর্মমত বিভিন্ন দেশাচার লোকাচার ধর্মদর্শন জ্যোতিষ শাস্ত্র সব এখানে একটি মহান সর্বভারতীয় রূপে পরিণত হয়েছে।

সোমনাথ একা সৌরাষ্ট্রখণ্ডের নয় সারা ভারতের মর্মস্থল। মিত্রপাদের আশ্রমে থেকে সে এই সোমনাথকেও অনেকবার দেখেছে। শ্রদ্ধা বোধ করেছে। তার তুলনায় মনে হয়েছে মিত্রপাদের আশ্রমে তার ধর্মদর্শন অনেক অসম্পূর্ণ; লোকটিকে ও কেমন যেন শ্রদ্ধা করতে পারেনা সে।

তন্ত্র সমন্ধে বিশেষ কোন কাযই এগোয় নি আলবেরুণীর।

ভাবে এখান থেকে চলে যাবে সে। তাছাড়া আলবেরুণীর মনে হয় শীর্ণ প্যাকাটির মত লোকটার অন্তরে কোথায় নিদারুণ একটা সত্বা জেগে আছে। তাকেও অহেতুক নানা প্রশ্ন করেছে সোমনাথ সমন্ধে।

মাঝে মাঝে বাত্রি গভীরে ঘুম ভেঙ্গে গেছে আলবেরুণীর। জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেখেছেন বিচিত্র অনেক লোকের এখানে আসা যাওয়া।

তারা রাতের অন্ধকারে আসে, কেউ পায়ে হেঁটে কেউ বা ঘোড়ায়; কি সব ফিসফিস করে কথা বলে। আবার অন্ধকারেই সরস্বতী নদী পার হয়ে চলে যায় তারা সঙ্গোপনে।

মিত্রপাদ কি যেন গভীর ষড়যন্ত্রে জড়িত।

আলবেরুণী এখান থেকে চলেই যাবেন মনস্থ করেছেন। কিছুদিন থেকে দেখেছেন শান্তিপূর্ণ নগরীর পথে পথে, আশপাশে

এসে জমছে ভীত ত্রস্ত হাজারো মানুষ, পায়ে হেঁটে গরুর গাড়ীতে না হয় উটের গাড়ীতে তারা সামান্য সঞ্চয় নিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে পালিয়ে আসছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। জানেন আলবেরুণী ওদের মনে এ কিসের আতঙ্ক।

দানব সুলতান মাহমুদের স্বরূপের পরিচয় তিনিও জানেন। সর্বধ্বংসী একটি মানুষ। তার ছায়া মাড়ানোও পাপ।

তাঁর নিজের সব কিছু ওই শয়তান দখল করে নিতে চায়।

তাঁর জীবনে ছায়া ফেলেছে ওই দানব। কি এক করাল ছায়া। তাই এখান থেকেই চলে যেতে চান আলবেরুণী।

মিত্রপাদ অবাক হয়েছে আলবেরুণীকে গোছগাছ করতে দেখে। এদিকে সুলতান মাহমুদ এগিয়ে আসছে। সারা সৌরাষ্ট্রমণ্ডলে হাহাকার পড়ে গেছে, তাদের আসতে আর দেরী নেই। মিত্রপাদের অনেক দিনের আশা এইবার সফল হবে। যে অত্যাচার শৈবরা করেছিল তাদের উপর, সেই অত্যাচারের শোধ নেবার দিন এসেছে।

শুধু শোধই নেবে না তারা, আবার পুরোমাত্রায় তাদের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুলতান মাহমুদ ধ্বংস আর লুণ্ঠন করে চলে যাবার পর সেই শ্মশানে বসে তারাই নোতুন তন্ত্রসাধনার প্রতিষ্ঠা করবে পরবর্তী কালে।

বালুকারামও সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছে। একমাত্র সেই প্রতিষ্ঠার স্বার্থে মিত্রপাদ দেশের এতবড় শত্রুতা করতেও সম্মত হয়েছে, পশু হয়ে উঠেছে সব নীতিধর্ম বিসর্জন দিয়ে।

রাত্রি গভীর, আজ তারই আলোচনা চক্র বসেছে।

বালুকারাম নিশ্চিন্ত মনে এসেছে আজ। গোপাবতী গঙ্গা সর্বজ্ঞকেও ভুল কথাটা বিশ্বাস করাতে পেরেছে, ওরা টের পায়নি ওই সুলতানকে নানাভাবে সাহায্য করার কথা। ওরা কেউ

জানে না বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরিত দূতদের কি ভাবে বালুকারামের লোকজন হত্যা করে সব আবেদন পত্র নষ্ট করে ফেলেছে।

ওরা সংবাদও পায়নি বালুকারাম পারমার রাজ ধন্ধুরাজ নগরকোটের শাসনকর্তা মহাসেনাধিপতিকে কতখানি অনুরোধ করেছে সুলতানকে বাধা দেবার কাযে নিরস্ত থাকতে এবং সে কাযে সিদ্ধ হয়েছে সে।

সুলতান জানে সবকথা। সে নিজে বালুকারামকে অভয় দিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাই সাগ্রহে তারা প্রতীক্ষা করছে কতক্ষণে সেই সৈন্যদল নিয়ে সুলতান এখানে এসে পৌঁছবে।

মিত্রপাদ বলে।

—এখানে বাধা দেবার আয়োজন করেছে গঙ্গাসর্বজ্ঞ, কঠিন বাধা। সুলতানের পক্ষে নগরে প্রবেশ করাও দুরুহ হয়ে উঠবে।

শুধু তাই নয় প্রাণঘাতী সংগ্রামও করবে তারা।

বালুকারাম হাসে। বলে ওঠে কণ্ঠস্বর নামিয়ে।

—করুক, তবু সুলতান নগরে প্রবেশ করবেই মিত্রপাদ।

—কি ভাবে ?

বালুকারাম সে প্রশ্নের জবাব দিল না। বলে বালুকারাম।

—জয়ী সে হবেই।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে কারা আসে। কয়েকটা ঘোড়ার খুরের শব্দ ওঠে। কাদের উত্তেজিত কণ্ঠের কথাবার্তাও শোনা যায়। ওরা এগিয়ে আসছে।

আলবেরুণী বের হবার আয়োজন করে ফেলেছেন, সামান্য একটা গাঁঠরীতে কিছু সংগৃহীত পুঁথিপত্র, আর তার পরিধেয় বস্ত্র দুএকখানা, এই তার সম্বল। তাই নিয়ে বের হয়ে আসবেন, মিত্রপাদের ঘরে ঢোকেন বিদায় নিতে।

—আমি চললাম মিত্রপাদ।

মিত্রপাদ ওর কথায় বিস্মিত হয়। তার উপর নির্দেশ আছে ওই পণ্ডিত আলবেরুণীকে কোন রকমে আটকে রাখার। কিন্তু ওকে বার হয়ে যাবার জন্য তৈরী হতে দেখে মিত্রপাদ বলে।

—সেকি! এখন যাওয়া সম্ভব নয়। চারিদিকে ভীতত্রস্ত লোকজন উন্মাদের মত ঘুরছে। পথে ঘাটে যাকে পাচ্ছে লুটপাট করে বধ করছে।

হাসেন আলবেরুণী—আমাকে তারা কিছু বলবে না। আমিও তো তাদেরই মত ভিখারী। আমাকে যেতেই হবে।

এমন সময় নীচে থেকে কারা ব্যস্ত হয়ে ঢুকছে। আবছা আলোয় দেখা যায় হাসাম খাঁ আর কজন অনুচর। ওদের দেখেই চমকে ওঠেন আলবেরুণী।

—হাসাম খাঁ!

হাসাম খাঁ ওকে কুর্ণিশ করে জানায় শ্লেষভরা কণ্ঠে:

—খুদার বান্দা দীন সুলতান মাহমুদ পণ্ডিতপ্রবর আবু রাইয়ান আলবেরুণীর সাক্ষাৎপ্রার্থী, তিনি প্রভাসপত্তনের অদূরে ভেরাবলের প্রান্তরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার উপর হুকুম হয়েছে সেই পণ্ডিত প্রবরকে নিয়ে যেতে।

ওরা সকলেই চমকে ওঠে! মিত্রপাদ, বালুকারাম খুশী হয়।

—এসে গেছেন তাহলে!

আলবেরুণীর মুখ রক্তশূন্য হয়ে ওঠে, ওই মিত্রপাদ বালুকারামের দিকে চেয়ে অবাক হয়। ওরাও হিন্দু। ওরা জানে না কি সর্বনাশ ওদের দেশে এনেছে ওই একটি দানব, আবার কি সর্বনাশ অপেক্ষা করছে তা ওরা জানে না। নয়তো সামান্য স্বার্থের জন্য ওরা সাহায্য করেছে নানাভাবে সেই দানবকে, কিন্তু এর পরিণাম কি ভয়াবহ তা জানে না ওরা। জানলে শিউরে উঠতো।

তার জন্মভূমি থিবাকে শ্মশানে পরিণত করেছে; তার জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে ওই দানব।

আজও তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে।

হাসাম খাঁ শোনায়।

—অবশ্য স্বেচ্ছায় যদি যেতে না চান, অন্যভাবে নিয়ে যাবার আদেশও আছে। আশা করি সেটার প্রয়োজন হবে না আলবেরুণী।

বালুকারাম বলে।

—তাই যান আলবেরুণী সাহেব।

হাসামখাঁ কঠিন কণ্ঠে বলে,

—আপনাকেও যেতে হবে।

বালুকারাম চমকে ওঠে, আজ হাসাম খাঁয়ের কণ্ঠে অন্য সুর। হাসামখাঁ বলে চলেছে।

—সুলতান আশা করেছিলেন আপনার কাছ থেকে সব রকম সাহায্যই তিনি পাবেন, কিন্তু পিছনে শক্তিমান ভোজরাজার সৈন্যদলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের এই শেষপ্রান্তে এনে পিষে মারবার চক্রান্ত হবে তা জানতেন না।

বালুকারাম বিস্ময়ে চমকে ওঠে।

—ভোজরাজার সৈন্যদলকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি?

—আপনি না হোন, তবে এখানকারই কেউ হবে। সে খবর আগেও পাইনি আমরা।

বালুকারাম বিস্মিতকণ্ঠে বলে,

—আমি দীর্ঘদিন বাইরে ছিলাম, সেই সময় কেউ যদি সংবাদ দেন সে কথা জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হাসাম খাঁ ওর দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখছে। মনে হয় ওই কাপুরুষ মিথ্যা কথা বলেনি। রাজ্য পাবার লোভ ওর সারা দেহে মনে। সেই লোভী মানুষটা নিজের ভবিষ্যত

স্বপ্নকে এমনি করে মিথ্যা করার সাহস পাবে না তা জানে হাসাম খাঁ।

বালুকারাম বলে চলেছে।

—সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি, তা পালন করবো। আজ রাত্রেই এ সম্বন্ধে সংবাদ নিয়ে আমি প্রত্যুষে সুলতানের কাছে যাবো।

হাসাম খাঁ শাসনের সুরে বলে।

—এ কথার যেন খেলাপ না হয়। মনে রাখবেন সেনানায়ক, তিন দিনের মধ্যে আমাদের এখানে সব পর্ব শেষ করতে হবে। ওই মন্দির চূড়া ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে আমাদের ওই ভোজরাজের নাগালের বাইরে চলে যেতে হবে, তারপর আপনার রাজ্য আপনি শাসন করুন।

বালুকারামের দুচোখ ক্ষণিকের জন্য ঝক ঝক করে ওঠে।

আলবেরুণী স্তব্ধ নির্বাক দর্শকের মত একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এত বড় হীন চক্রান্তের সংবাদ শুনে শিউরে উঠেছে।

মনে হয় ভারতের অন্তরের এটা তীব্র গ্লানি, তার সব সংস্কৃতি ঐতিহ্য সৃষ্টির পথে মাঝে মাঝে এই হীন পশু তার সব সুন্দরকে গ্রাস করেছে।

সুলতান মামুদের মত দানব এ দেশের সেই অকল্যাণ আর পশুত্বের সন্ধান পেয়েছে।

—চলুন আলবেরুণী।

এতদিনের জীবনে তবু বন্দীদশা ঘোচেনি এই মানুষটির। মনে হয় এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো, এই দানবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।

কিন্তু তা করতে পারেন নি আলবেরুণী। মনে হয়েছে এককালের একটি মানুষের এই সর্বনাশের কাহিনী একটি মহান দেশের এই

ঐতিহ্যের কথা বৃহত্তর বিশ্বকে, আগামী ভবিষ্যৎকে তার জানানো প্রয়োজন।

তাই সব দুঃখ কষ্ট অত্যাচার সয়েও সে বেঁচে আছে, জীবনের সেই ব্রত পালনের জন্য।

মৃত্যুকে সে ভয় করে না। বলে আলবেরুণী।

—চল হাসাম খাঁ, কোন দোজকে নিয়ে যাবে, চল। আমি তৈয়ার।

প্রভাস পত্তন থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা খাল সমুদ্র থেকে বের হয়ে চলে গেছে সমভূমির বুক চিরে। দুপাশে ছায়াঘন বন। মাটির বুক থেকে মিঠে পরিষ্কার জল অবিরল ধারায় উঠে চলেছে তোড়ে, তাকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট জলাশয়। ওই অরণ্যের গভীরে নাকি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণদেব জরাব্যাধের শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তাই এই ঠাঁই এর নাম দেহাবসান।

অলবেরুণী এগিয়ে আসছেন ওদের সঙ্গে।

অন্ধকার শূন্য প্রান্তরে আর ঠাঁই নেই, কেবল পট্টাবাসে-র শ্রেণী। পট্টাবাসের বাইরেও ভিতরে সতর্ক প্রহরা, দূরে প্রভাসপত্তনের কালো পর্বতপ্রমাণ প্রাকারসীমা মাথা তুলেছে।

সব কেমন বয়োজীর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ চরিতের কথা জানেন আলবেরুণী। যদুবংশের তখন প্রবল প্রতাপ। এই প্রভাসতীর্থে তারা পরস্পর হানাহানি করে আত্মধ্বংস এনেছিল। শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র শাম্ব্য এক মুনির সামনে নারীবেশে এসেছিল যদুবংশের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে। পরিহাসছলে প্রশ্ন করেছিল মুনিকে।

—এই গর্ভবতী নারীর কি সন্তান হবে?

এই পরিহাসে মুনি ক্রোধে জ্বলে উঠে অভিশাপ দিয়েছিল।

—এ মুষল প্রসব করবে। সেই মুষলই কালে যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হবে।

বহুদিন পর এই প্রভাসতীর্থে যদুবংশের অনেকে মদ্যপ অবস্থায় আত্মকলহ সুরু করেছিল। সেই আত্মকলহের সময় তারা হাতের কাছে কোন অস্ত্র না পেয়ে নদীতীরের সরগাছই তুলে নিয়েছিল। ওদের হাতে সেই সরগাছই মুষলে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

সেই হানাহানিতেই যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, মনের দুঃখে যদুবংশের অন্যতম প্রধান বলরামদেব পাতালে প্রবেশ করেন, আর শ্রীকৃষ্ণও এই সময় জরাব্যাধের শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। মহাভারতের একটি গৌরবময় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সেই ঘটনা সেই ইতিহাসেরই যেন পুনরাবৃত্তি চলেছে আজও। নিজেদের হানাহানি তুচ্ছ স্বার্থের কাছে সারা ভারতবর্ষ আজও আত্মনিধনে প্রবৃত্ত হয়েছে, বিদেশীর কাছে তাদের ধর্ম সংস্কৃতি এমনি দেশের সবকিছু বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে নি।

আলবেরুণীর চোখের সামনে অতীতের সেই ইতিহাসের করুণ অধ্যায়ই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ধ্বংস থেকে যেন এদের নিষ্কৃতি নেই। বারে বারেই একই ভুল করে চলেছে তারা।

পট্টাবাসের মধ্যে সেই সরোবরের ধারে সুলতানের আবাস। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী। ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ ওঠে। কোথায় কোথায় কোন তাবু থেকে দূরাগত সৈন্যের দেশের গজলের টুকরো সুর ভেসে ওঠে।

জানে না এই রক্তস্নান সেরে আর কোনদিন গজনীর সেই পর্বতসমাকীর্ণ সবুজ উপত্যকার পাইনবনে সে ফিরে যাবে কিনা তবু সেই দেশে কার দুটো কালো চোখ তাকে বারবার ডাকে।

—তু আয়ে কতুজান।

সেই ঝর্ণার ধারে সবুজ বনভূমির বুকে প্রেয়সীর কুটিরে সে ফিরে যাবে কিনা তার অজানা, তবু মন কাঁদে।

এমনি মন কাঁদে মিনাবাঈ এর।

দীর্ঘপথ পার হয়ে এসেছে সে। পথের দুধারে দেখেছে শুধু মৃত্যু রক্তপাত আর ধ্বংস। সব সুন্দর গ্রাম শান্ত জনপদকে ওই নিষ্ঠুর দৈত্য একটা শ্মশানে পরিণত করেছে।

মিনাবাঈ যেন এই অন্ধপঙ্গু প্রকৃতির নীরব সাক্ষী।

তবু চুপ করে দীর্ঘ পথ বয়ে এসেছে। এ পথের শেষ কোথায় জানে না।

সবুজ গ্রামসীমা। ধনে জিরে মশলার ক্ষেত্রে অলস গতিতে ময়ূরের দল ঘুরে বেড়ায়, মিনাবাঈ যেন বন্দী কোন শিখরী। গুজরাটের সবুজ প্রান্তরে ওকে বন্দী করে এনেছে সুলতান মাহমুদ জীবনে আরও কি নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করাবার জন্য।

মুলতানের পল্লী অঞ্চলের মেয়ে সে। সহরে আসতো ক্ষেতির ফল আনাজ শব্জী নিয়ে। মাঝে মাঝে সূর্যমন্দিরের চত্বরেও যেতো। ভজন গানের আসর বসতো, নাহয় উৎসবে সমাগত লোকদের সম্মিলিত ভাগ্‌রা নাচ দেখতো।

ও বোলে বোলে বোলে এ এ····

হোরিয়া কি গোরিয়া

নাচের ভিড়ে মেয়ে পুরুষ সকলেই যোগ দিত, বাবুল পিপুল গাছের ছায়ানামা ঠাঁইটুকু নাচের উল্লাসে আর চীৎকারে ভরে উঠতো। তেমনি দিনে মিনাবাঈ দেখেছিল একজনকে। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। দুচোখের নীল তারায় যেন আশমানের ডাক।

মুক্ত চিড়িয়াকে সেই সুদূর আশমান উধাও হবার ডাকে ডেকেছে বার বার।

তারপরই সব স্বপ্ন ছারখার হয়ে যায়।

সুলতান এসে প্রবেশ করে সেই সমৃদ্ধ নগরীতে। সুর মিশে যায় কান্নার আর্তনাদে।

তবু ক'দিনের সেই স্বপ্ন আজও ভোলেনি মিনাবাঈ, তার রিক্ত শূন্য জীবনে সেইটুকুই অমৃতসঞ্চয়।

ঘুম আসেনি। দেহমনে একটা নীরব আতঙ্ক জমাট বেধে রয়েছে। সোমনাথ তীর্থের কাছে এসে পৌঁচেছে। ওই দস্যু এসেছে তাকে ধ্বংস করতে। মিনাবাঈ মনে মনে আজ কামনা করে ওর পরাজয় হোক, ধ্বংস হোক তার!

নিজের কথা সে আজ ভাবে না। কোনদিনই ওকে ভালোবাসে নি। ওই দস্যুর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। যেটুকু আছে তা শুধু ঘৃণারই। সেই ঘৃণার আগুনে তিলে তিলে জ্বলেছে সে।

ওপাশেই সুলতানের পট্টাবাস। ওখানে কার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ চমকে ওঠে মিনাবাঈ। সুলতান রাগলে ওর কণ্ঠস্বর নরম হয়ে আসে। কঠিন ব্যঙ্গের সুরে কথাগুলো বলে সে। ঠাণ্ডা মাথায় শত্রুকে নিঃশেষ করে। এই ধ্বংসপর্বের মধ্যে কোন উত্তেজনা থাকে না। কার সঙ্গে তেমনি উত্তাপহীন স্বরে কথা বলে চলেছে সুলতান।

সুলতান মাহমুদ বহুদিন পর আবার আলবেরুণীকে সামনা-সামনি দেখেছে। মন দিয়ে সে ওই লোকটাকে হিংসা করে, ঘৃণা করে তাই অবচেতন মনে। ও জানে নিষ্ঠুর সুলতান মাহমুদের এইঘৃণ্য এই রক্তাক্ত কাহিনী, ইতিহাস কোনদিনই লোকে ভুলবে না, ওই আলবেরুণীকেও অনেকে মনে রাখবে।

কিন্তু এত সৈন্য এত রক্তক্ষয়-এর বীরত্ব দিয়ে সে একটা দেশ, জাতিকে জয় করতে পারেনি, তাই ধ্বংসই করতে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, কিন্তু ওই পরদেশী মুসাফির এদেশের অন্তরকে চিনেছে, তাকে ভালবেসেছে, তাই জয় করেছে এ দেশের মন।

ভবিষ্যতের মানুষ ঘৃণা করবে সুলতানকে আর ভালবাসবে ওই দীন ফকীরকে।

তাই এত হিংসা। শ্লেষ ভরা কণ্ঠে বলে সুলতান।

—তাহলে তসরীফ্ শরীফ আলবেরুণী ?

—খুদার মেহেরবাণী।

আলবেরুণী ওর কথায় উত্তর দেন। সুলতান ক'দিনেই এখানকার সব কায শেষ করে দেশে ফিরতে চায়। দেরী করা ঠিক হবে না। পিছনে এগিয়ে আসছে ভোজদেবের সৈন্যবাহিনী।

তবু সুলতানকে কেউ রুখতে পারবে না।

মুখে চোখে ফুটে ওঠে কাঠিন্যের ছায়া। আলবেরুণী প্রশ্ন করেন।

—আমাকে স্মরণ করেছেন ?

—হ্যাঁ। ভাবছিলাম একজন মুসলমান পণ্ডিতের দরকার, ধীমান শুচিমান হবে ; মনে পড়ল তোমার কথা।

—সুলতানের অশেষ মেহেরবাণী।

—তোমাকে সোমনাথের ধ্বংসস্তূপের উপর খুৎবা পড়তে হবে।

চমকে ওঠেন আলবেরুণী। সুলতান হাসছে, ওর অট্টহাসিতে রাত্রির অন্ধকার খান্ খান হয়ে ওঠে।

—কি। সন্দেহ হচ্ছে আলবেরুণী ? সন্দেহের কোন কারণ আছে ? সোমনাথ দেবেরও সাধ্য নেই সুলতান মাহমুদকে ঠেকায়, আমিও খুদার বান্দা। যা বলছি তারই নির্দেশে বলছি, যা করছি তাও তাঁরই হুকুম। তাহলে বিস্মিত হচ্ছো কেন ? ভারতের জন্য মমতা বোধ হচ্ছে ?

হাততালি দিতেই একজন প্রহরী প্রবেশ করে, সুলতান মাহমুদ বলে।

—মিনাবাঈ!

প্রহরী চলে গেল, সুলতান মাহমুদ পায়চারী করছে; নরম কালানের উপর তার দামী সাচ্চাজরির কায করা নাগরা ডুবে যায়, আলোয় ঝলমল করছে দামী ওয়াশকিটের হীরার বোতাম গুলো, দুচোখে অমনি জ্বালার আভাস! স্তব্ধতার মাঝে প্রবেশ করে কিংখাবের ভারি পর্দার ওদিক থেকে একটি নারী!

সুন্দরী। টিকলো নাক, মাথার বেনীটা উদ্ধত সাপের মত ঝুলছে লীলায়িত ছন্দে, ওর পরণে আশমানি রং-এর পেশোয়াজ।

হালকা গোলাবী ওড়নার চুমকি গুলো ঝক্‌মক করে আকাশের তারার ঝিকিমিকি নিয়ে।

চমকে ওঠেন আল্‌বেরুণী। ওর মুখে বিস্ময়ের শব্দটা এসে গেছে তবু সেই বিস্ময় প্রকাশ করেন না, কোন রকমে চেপে গেলেন.

মনের সব উত্তেজনা চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন আল্‌বেরুণী নিস্পৃহ দর্শকের মত।

মিনাবাঈ এর সারা মনে চকিতের মধ্যে অমনি ঝলক খেলে যায়। ওর মনে ভিড় করে আসে মূলতানের সেই হারানো স্বপ্নের দিন গুলো।

ছায়া নামা নদীর তীরে দেখেছিল ওই বিদেশীকে। দুজনে দুজনকে চিনেছিল। মিনার মনে এনেছিল বাঁচার নোতুন আশ্বাস।

তারপর দুজনে দুদিকে সরে গেছে।

বিস্তৃত এই ভারতবর্ষের বহু বন্ধুর রক্তিম পথের পারে নিশ্চিত একটি দুর্বার ধ্বংসের মাঝে আবার তারা দুজনে দুজনকে প্রত্যক্ষ করেছে।

কিন্তু সেই দিনগুলো আজ বদলে গেছে।

সুলতান মিনার চোখের সেই চমক দেখেনি, তাই তাকে পরিহাস ভরা কণ্ঠে বলে।

—আর একটি বেয়াকুফ দেখছো মিনা? লোকে বলে উনি মহাপণ্ডিত আবু বাইয়ান আলবেরুণী। আমি বলি ইনি পহলা নম্বরের এক বেয়াকুফ! তবে উনিও মানেন যে আমি নাকি সোমনাথ ধ্বংস করতে পারবো না। তাই বলছিলাম উনি পয়লা আর তুমি দোসরা নম্বরের বেয়াকুফ!

মিনা চুপ করে থাকে। মুখ চোখ অপমানের জ্বালায় লাল হয়ে উঠেছে আলবেরুণীর। বলে ওঠেন আলবেরুণী।

—ভারতবর্ষকে ধ্বংস করতে পারেন সুলতান কিন্তু জয় করতে পারবেন না

—জয়!....সুলতান গর্জে ওঠে।

—জয় করার সার্থকতা কি আলবেরুণী? আমি চাই ছিনিয়ে নিতে। লুঠ করতে জয় করার চেয়ে ধ্বংস করেই আমি খুশী। পারেন তবে সোমনাথ নিজেকে সামলান।

মিনাবাঈ শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

—আমাকে ডেকেছিলেন?

—হ্যাঁ। জয় করা না ধ্বংস করা কোনটা তুমি বেশী পছন্দ কর বাই? দেবতা না শয়তানকে?

—এ পরিহাসের অর্থ কি?. মিনা চমকে ওঠে।

সুলতান হাসতে থাকে। কঠিন সেই হাসি। হাসি থামিয়ে বলে।

—ওই মহাপণ্ডিতকে সেই জবাবটা শুনিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। তুমিও তো ভারতবর্ষের মেয়ে তোমার মুখের জবাবের দাম দিই।

মিনাবাঈ আলবেরুণীর দিকে চেয়ে থাকে।

ভাবলেশহীন সেই মুখ। তবু বুঝতে বাকী থাকেনা ওই লোকটি সারা মন দিয়ে এই সুলতানকে শুধু ঘৃণাই করে।

ওর সঙ্গে চোখাচোখী হতে দৃষ্টি নামালেন আলবেরুণী।

সে দৃষ্টিতে কি পুঞ্জীভূত বেদনা জমে আছে। দুজনেই আজ বন্দী।

মিনাবাঈ তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলে।

—বন্দীর মুখের জবাবের মূল্য কি জনাব? সে তো স্তুতিপূর্ণই হবে।

চকিতেব জন্য সুলতান কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল। বাইরে কাদের কোলাহল শোনা যায়। সেনাপতি মসজদ খাঁ এগিয়ে আসে পট্টাবাসের সামনে।

রাত শেষ হতে আর দেরী নেই। সুলতান এবার নিজের কাযে ব্যস্ত হবে। বলে ওঠে মসজদ খাঁ।

—সমস্ত তৈয়ার জনাব।

স্তব্ধতা নামে পট্টাবাসে। সুলতান বলে মিনাবাঈকে।

—তোমার জবাবটা পরে শুনবো বাঈ। আর আলবেরুণী, তুমি আমার সম্মানিত অতিথি। পাশের পট্টাবাসেই তুমি থাকবে। তোমাকে দিয়াই খুৎবা পড়ানোর মনস্থ করেছি। বর্তমানে তারই ব্যবস্থা পুরো করতে হবে। চল, মসজদ খাঁ। ভোরের ওয়াক্তের নেওয়াজ শেষ করেই খুদার বান্দা সুলতান মামুদ ওই প্রাকার নগরীতে হানা দেবে। তুমি সৈন্য সমাবেশ করো।

সুলতান বের হয়ে গেলো। ওর মুখচোখের ভাব বদলে যায়। সেই ধূর্ত সুচতুর মানুষটা কঠিন শপথের মত ঋজু হয়ে ওঠে।

—মিনা!

মিনা আলবেরুণীর দিকে ডাগর অশ্রুভেজা দুচোখ তুলে চাইল, আলবেরুণী বলে চলেছে।

—তোমাকে এখানে দেখবো কল্পনা করিনি। এখানে এই অবস্থায়।

মিনাবাঈ হাসে, মলিন বিষন্ন হাসি। সারামুখ পাণ্ডুর হয়ে ওঠে তার। জবাব দেয় মিনা।

—আমিও কি কোন দিন জানতাম এমনি করে জীবনের সব স্বপ্ন সম্ভাবনা একটা দানবের হাতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাকে বন্দী করে দেহের সম্পদ ও লুঠ করেনি। আমাকে তিলেতিলে ও জঘন্য অপমৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। ওরা জয় করে না আবু রাইয়ান, ওরা ধ্বংস করে।

আলবেরুণীকেও সে বন্দী করেছিল, হত্যা করে নি। জীবনের অন্ধ নীচতার পঙ্ককুণ্ডে ওকে তিলে তিলে নিমজ্জিত করে চলেছে।

আজও সেই শাস্তির শেষ হয়নি।

—কতদিন এ যন্ত্রনা সইবো আবু রাইয়ান?

আল্‌বেরুণী কি জবাব দেবে জানে না। তার জীবনে একটা ব্রত আছে ও জানে। এ দুঃখ দহন সেই ব্রতের উদযাপনের জন্যই। কিন্তু একটি নারী কি ভবিষ্যতের আশায় হৃদয়হীন একটি দানবকে মেনে নেবে জানে না।

বলেন আলবেরুণী।

—তবু দিন বদলাবে মিনাবাঈ। তার আর দেরী নেই।

—বদলাবে? আবার শান্তি ফিরে আসবে এখানে? আমরা সুখী হবো আবু রাইয়ান? ওই দানব পরাজিত হবে? একমাত্র এই আশাতেই বেঁচে আছি আমি! সব রূপ গুণ আমার না পাশ বরবাদী হয়ে গেল। ভালবেসেছিলাম, কিন্তু তার ও কোন সার্থকতা নেই। তুমিও আজ সে কথা ভুলে গেছো আবু রাইয়ান?

—ওসব কথা ভেবে লাভ কি মিনাবাঈ? অতীত অতীতেই থাক। আজ ধ্বংস আর মৃত্যুর সামনে চোখের জল ফেলে লাভ কি? জীবনে যা আসে তাকেই সহজভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা কর মিনা।

আবুরাইয়ান আলবেরুণী আজ অতীতের সব স্মৃতিকে ভুলতে চায়। সব আঘাত তার মনের কাঠিন্যকে আর ও জাগ্রত করুক। ঘৃণায় ভরে দিক সারা অন্তর।

বালুকারামকে একজন খুঁজছে বারবার। সে গোপাবতী। শত্রু সৈন্য এত তাড়াতাড়ি যে সোমনাথ পত্তনে এসে হানা দেবে তা কল্পনা করে নি সে। সহরের দ্বারিকা তোরণ বন্ধ।

চারিদিকে সাজ সাজ রব।

আজ চামুণ্ডারায়ও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। সে যদি বালুকারামকে প্রশ্রয় না দিতো বালুকারাম এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করতে সাহসী হতো না। এত সহজে শত্রু সৈন্য এসে এখানে হানা দিতেও সাহসী হ'ত না, সে অবকাশ ও পেত না।

গোপাবতী বাবাকে চিন্তান্বিত দেখে সান্ত্বনা দেয় সে।

—ভগবান সোমনাথের কৃপায় আমরা জয়ী হবো বাবা।

চামুণ্ডারায় বলে ওঠে।

—কিন্তু এত পাপ কি সোমনাথদেব ক্ষমা করবেন মা? বালুকারাম বিশ্বাসঘাতক। সেই-ই বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে রাজাদের ওকে বাধা দিতে নিরস্ত করেছে, সেইই বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরিত দূতদের পথের মধ্যে হত্যা করে সব আবেদন পত্র নষ্ট করে দিয়েছে। সেইই গোপনে সুলতানকে এখানকার সব সংবাদ পাঠিয়েছে। গোপাবতী ও কথা শুনে চমকে ওঠে।

এ সব কায যে গোপনে এখানের কেউ করছে সে কথা শুনেছিল সে। ভোজরাজার দূতকে কারা হত্যা করেছিল তাও শুনেছে। কিন্তু এ সব ঘৃণ্য জঘন্য কায করবে বালুকারাম তা সে কল্পনা করেনি। তাই প্রতিবাদ করে।

—এসব কি সত্য বাবা? মনে হয় কোন মিথ্যা রটনা।

চামুণ্ডা রায় মেয়ের দিকে চাইলেন। জানেন গোপার মনে বালুকারামের জন্য একটু নিভৃত স্থান আছে। তিনিও এটা জানতেন বালুকারাম পাত্র হিসাবে যোগ্যই বলা যায়, তাই বাধা দেন নি ওদের মেলামেশায়। মেয়ের মুখে ওই কথা শুনে জবাব দেন চামুণ্ডা রায়।

—ভীমদেব নিজে এসব তদন্ত করেছেন, সাক্ষ্য প্রমাণ ও আছে। তার কয়েকজন অনুচরকে বন্দী করা হয়েছে, তারাই এসব কথা স্বীকার করেছে। আজ এত বড় সর্বনাশের দিনেও বালুকারাম ইচ্ছা করে সে গুর্জবপতি হবে চামুণ্ডারায়কে সরিয়ে।

গোপার চোখে মুখে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা জাগে সারা মনে। কিন্তু বালুকারামকে সে খুঁজে পায় না।

সহরের পথে পথে সাড়া পড়ে গেছে। অবরুদ্ধ নগরী। প্রতিটি মানুষ আজ তাদের শেষ আশ্রয় এই নগরী রক্ষা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছে, আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে তারা।

সেনানায়ক বালুকারাম এই রাতের অন্ধকারে গোপন মন্ত্রণা সভা থেকে ফিরেছে। ও মনে মনে খুশী হয়েছে সুলতানের আগমন সংবাদ পেয়ে। এবার আর দেরী হবে না।

ক'টা দিন এবার দেশপ্রেমিকের ভাণ করে কাটিয়ে দিতে হবে সুযোগ বুঝে তারপর নিজমূর্তি ধরবে বালুকারাম।

হঠাৎ তার বাড়ীর বাগানে কাকে দেখে এগিয়ে আসে বালুকারাম। সৈনিকের বেশে কাকে দেখেছে সে, কাছে এসে তারার আলোয় চিনতে পারে। বালুকারাম খুশী ভরা কণ্ঠে বলে।

—গোপা!

গোপা কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল। বালুকারামের সারামনে নীরব ব্যাকুলতা জাগে।

—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা রয়েছে গোপা।

—আর কোন কথাই থাকতে পারে না বালুকারাম। তোমায় আজ সারা মন দিয়ে ঘৃণা করি। ছিঃ ছিঃ! এত নীচ তুমি।

বালুকারাম অবাক হয়।

—কি বলছ তুমি? এই মিষ্টিরাত—

গোপার সারা মন জ্বলে ওঠে।

—চারিদিকে শত্রু সৈন্য, দেশের মান সম্মান, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন, আজ সেনানায়ক কিনা প্রেমের আকাশ কুসুম দেখে চলেছে? কাপুরুষ। লোভী। বিশ্বাসঘাতক তুমি। তুমিই সুলতানকে আজ পথ দেখিয়ে এনেছো সোমনাথে। এই ধ্বংসস্তূপের উপর তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করবে?

—গোপা। বালুকারাম গর্জন করে ওঠে।

ওর সব ভালবাসা আর প্রেমের মুখোশ খুলে গেছে।

দু একজন মাত্র জেনেছে বালুকারামের এই সংবাদ। চামুণ্ডারামই বোধ হয় বলেছে তাকে। তাই গোপার কণ্ঠস্বর সে রুদ্ধ করতে চায়।

গুজরাটের সিংহাসনের কাছে একটা নারীর প্রেম তুচ্ছ।

গোপা কিছু বলার আগেই বালুকারাম গর্জে ওঠে।

—এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও উচ্চারণ করোনা গোপা!

—বিশ্বাসঘাতককে কি ভয়ে পূজো করতে হবে? তোমাকে যে কোন দিন আমি ভালোবেসেছিলাম একথা ভাবতেও আজ ঘৃণা বোধ করি।

বালুকারাম আজ সব প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

—তার আর প্রয়োজন হবে না গোপা। তোমার নামই আমি মুছে দোব সোমনাথপত্তন থেকে।

ওর কোষমুক্ত তরবারি চকিতের মধ্যে উর্দ্ধে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে

কঠিন আঘাতে বালুকারামের হাত থেকে তরবারি ছিটকে পড়ে মৃত্তিকায়।

—বালুকারাম!

বালুকারাম ওই কণ্ঠস্বর চেনে। তাকে এ সময় এখানে দেখবে তা কল্পনাও করেনি সে। স্তব্ধ হয়ে যায় তার কণ্ঠস্বরে। স্বয়ং রাজা ভীমদেব তার সামনে দাঁড়িয়ে।

বালুকারাম কিছু বলবার আগেই দুজন প্রহরী এসে ওকে বন্দী করে। রাজা ভীমদেব আদেশ দেন।

—বন্দী করে নিয়ে যাও, পরে বিচার হবে।

গোপাও মাথা নীচু করে রাজা ভীমদেবকে অভিবাদন করে। ভীমদেব বলেন।

—তোমার কথায় আমি মুগ্ধ হয়েছি গোপা, সামনে আমাদের কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। তবু মনে হয় অন্তরের সত্যনিষ্ঠা আর ত্যাগ আমাদের বিফল হবে না!

তুরীধ্বনি শোনা যায়। প্রাকারে প্রাকারে চাঞ্চল্য জাগে। হাজারো কণ্ঠের জয়ধ্বনি ওঠে।

—হর হর মহাদেও।

প্রাকারের ওদিক থেকে সুলতানের সৈন্য দলের কলনাদ শোনা যায়। পূর্ব আকাশে ফুটে ওঠে আলোর প্রথম আভাস।

অন্ধকারের অতল থেকে উদিত হচ্ছে একটি রক্তরাঙা দিন, আজ এর জাগরণ সার্থক, বীরের রক্ত ধারায় এই পুণ্যমৃত্তিকা নিষিক্ত হবার সঙ্কেত আনে সারা আকাশ বাতাসে।

সোমনাথ মন্দিরে যথারীতি দুন্দুভি ঘণ্টা বাজে। মঙ্গলারতি সুরু হয়েছে। হাজারো ভীত ত্রস্ত যাত্রীদল আজ প্রাণের আকুতি মেশানো কণ্ঠে প্রার্থনা জানায়।

—জয় শিব মহাদেব। জয় সোমনাথ কি জয়।

ভীমদেব এগিয়ে গেছেন বহিঃসীমার প্রাকারের দিকে। একাই দাঁড়িয়ে আছে গোপা : সারামনে তার শূন্যতা আর তীব্র ঘৃণা।

—গোপা!

শুভার ডাকে চমক ভাঙ্গে তার।

গোপা ওর দিকে চাইল। শুভা সভ্য স্নান সেরে পরেছে পট্টবস্ত্র, চোখে তার অভয় দীপ্তি। বলে শুভা।

—বালুকারামকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদায় দিতে এসেছো বুঝি? গোপার সারামন ঘৃণায় জ্বলে উঠে! জবাব দেয় গোপা।

—ও নাম আর উচ্চারণ করো না শুভাবতী, ও পাপী বিশ্বাস-ঘাতক।

—বিশ্বাসঘাতক! চমকে ওঠে শুভা।

--হ্যাঁ। এতদিন গোপনে ওই দানবকে সব রকম সাহায্য করে এসেছে। নিজে নাকি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসাবে গুর্জরের সিংহাসন পাবে। এই পিশাচকে আমি ভালোবেসেছিলাম শুভা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ। পুরুষকে চিনিনি।

আজ মনে হয় তোমার কথাই সত্যি শুভা, এ যে কি বেদনা তা তোমায় কি বোঝাবো!

শুভা অস্ফুট কণ্ঠে বলে।

—ভগবান সোমনাথ তোমায় শান্তি দিন।

গোপার দুচোখ জ্বলে ওঠে। বলে চলেছে সে।

—সেই প্রার্থনাই জানাবো আজ দেবতার কাছে। তিনি আমায় শক্তি দেন। তুচ্ছ পাওয়ার বদলে বৃহৎ পাওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় ত্যাগ করার সাহস তিনি যেন আমায় দেন।

গোপার মনের সব দুর্বলতা আজ কঠিন একটি দুর্বার শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

এই নারীকে যেন শুভা চেনে না।

সুলতান মাহমুদ সর্বশক্তি নিয়ে হানা দিয়েছে সোমনাথ পত্তনে। প্রথম প্রাকারের বাইরে অতল জলভরা পরিখা, সকালের আলোয় চারিদিকে ভরে গেছে। পাখিগুলো উপবনে কলরব করতো তারাও এত কোলাহল—চীৎকারে ভীত হয়ে কোথায় চলে গেছে।

সূর্যের আলো পড়েছে দূরে সোমনাথের মন্দিরচূড়ার স্বর্ণ কলসে, লোভী সুলতানের দৃষ্টি ওই সুদূরে নিবদ্ধ।

সারা প্রান্তর ঘিরে সৈন্যদল এগিয়ে আসে একটি মাত্র পথ ওই দ্বারিকা দ্বারের দিকে। সমুদ্রের দুর্বার জলস্রোত যেন ওই প্রবেশ পথ দিয়ে উত্তাল তরঙ্গে প্রবেশ করবে সোমনাথ পত্তনে, তাদের প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙ্গে পড়বে সব কিছু।

কিন্তু সহজে এতদিন যুদ্ধ জয় করে এসেছে সুলতান। ভেবেছিল এখানেও তেমনি সহজে এবং কৌশলে কার্য সিদ্ধ হবে।

কিন্তু এত কঠিন বাধার সম্মুখীন হবে তা ভাবেনি।

দুর্বার তেজ নিয়ে ওরা বাধা দিচ্ছে।

প্রাকারের উপর থেকে হাজার হাজার তীরন্দাজ বাহিনী তীরবৃষ্টি করে চলেছে, পরিখার ওপাশে সুলতানের সৈন্যদল সেই তীরের সামনে লুটিয়ে পড়ে। কোনমতেই তারা পরিখার কাছে এগোতে পারে না।

মাঝে মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আসে আগুনের জ্বলন্ত কুণ্ডলী ভরা তীরের ঝাঁক। সুলতানের অশ্বারোহী সৈন্যদলেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আগুনের ভয়ে ভীত ত্রস্ত ঘোড়াগুলো এদিক ওদিকে দৌড়াচ্ছে। তাদের পায়ের চাপেই অনেক সৈন্য আহত হয়।

তীরের সামনে থেকে ওরা পিছিয়ে আসে। মাঝে মাঝে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে জয়ধ্বনি শোনা যায়।

—হর হর মহাদেও।

দ্বারিকাদ্বারেই সব থেকে আক্রমণের তীব্রতা বেশী। সুলতান নিজে এখানে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করছে, ওদিকে আছে মসজদ খাঁ, মূর্তিমান ধ্বংসের মত তারা দুর্বার বেগে এগিয়ে আসতে চায়, কিন্তু দ্বারিকাদ্বারের বাইরে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে মরুস্থলীর রাজপুত যোদ্ধারা, সংগ্রাম সিংহ বহুদিন পর এবার সুলতানকে সামনে পেয়েছে।

অতীতের সেই পিতৃহন্তাকে দেখে তার রাজপুত রক্তে উষ্ণস্রোত বয়ে যায়। তার রণনিপুণ সৈন্যদল আজ হিমালয়ের মত কঠিন ভাবে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করে চলেছে।

রোদের আলোয় ঝলসে ওঠে ওদের তরবারি, পরিখার ওপাশের মৃত্তিকা আজ রুধিরাক্ত। পিছনে তোরণ দ্বার থেকে তীরন্দাজ বাহিনী শরজাল বিস্তার করে চলেছে।

সুলতানের ঘোড়াটা হঠাৎ পূর্ণ গতিবেগের মাঝে একটা বল্লমের আঘাতে ছিটকে পড়ে, সুলতানের বর্মাবৃত দেহে তরবারির তীক্ষ্ণ আঘাত এসে বাজে কঠিন ধাতব শব্দে।

সুলতান চমকে উঠেছে. প্রস্তুত হবার আগেই তার সামনে ভেসে ওঠে কঠিন দুটো চোখের তীব্র চাহনি।

সংগ্রামসিংহ আজ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর, নিজের জীবন বিপন্ন করেও এগিয়ে এসেছে সে শত্রুব্যূহের মধ্যে।

হাসাম আলি খাঁয়ের অনুচররা সুলতানকে এসে ঘিরে ফেলে। সরে এল সংগ্রামসিংহ। চারিদিকে যেন হত্যার তাণ্ডব চলেছে।

দুপুরের তীব্ররোদে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সুলতানের ক্লান্ত সৈন্যদল পিছিয়ে আসে, পরিখার জলে ভাসছে অসংখ্য মৃতদেহ, সংগ্রাম সিংহের নিপুণ সৈন্যদের সামনে সুলতান এগোতে পারেনা।

আহত সৈন্যদল পিছিয়ে এসেছে।

সোমনাথ পত্তনের পরিখার বুকে ওদের মৃতদেহের স্তূপ জমে, ওপারের প্রান্তর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তবু সোমনাথ পত্তনের একখানা প্রস্তরও সুলতান নড়াতে পারেনি।

প্রাকার থেকে এই যুদ্ধ দেখছেন গঙ্গাসর্বজ্ঞ আর রাজা ভীমদেব নিজে, সংগ্রামসিংহের মত বীর সাহসী কৌশলী যোদ্ধা আজ সোমনাথদেবের জন্য প্রাণ দিতে এসেছে, ও যেন সোমনাথদেবের মানসপুত্র।

রাজা ভীমদেব বিস্মিত হন।

- ভিনদেশী রাজপুত এসেছে এখানে জীবনপণ সংগ্রাম করে সোমনাথকে রক্ষা করতে, আব আমারই সেনানায়ক বালুকারাম কিনা সেই সুলতানকে ডেকে এনেছে তারই ঘরের মধ্যে।

এ যেন কি এক নিষ্ঠুর প্রহসন।

সুলতানের সৈন্যদল পিছু হটছে, আজকের মত রণে ভঙ্গ দিল তারা। রক্তাক্ত সংগ্রামে ওরা ভয় পেয়েছে, রাজা ভীমদেব তাই বলেন।

—যদি পূর্বেই একটা প্রতিরোধ গড়তে পারতাম, সুলতান এতদূর আসতে সাহসী হতো না।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সংগ্রামসিংহ সামনে গঙ্গাসর্বজ্ঞ আর রাজা ভীমদেবকে দেখে প্রণাম করে, গঙ্গাসর্বজ্ঞ ওকে দেবতার প্রসাদী নির্মাল্য দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

সংগ্রাম সিংহ বলে।

—ওই শয়তান আবার আক্রমণ করবে সর্বজ্ঞ, সে আক্রমণের বেগ হবে আরও দুর্বার। আশীর্বাদ করুন যেন বীরের মত সে সংগ্রামে যোগ দিতে পারি।

সোমনাথমন্দিরে আজ বিশেষ পূজার আয়োজন হয়েছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার উদ্ভাসিত হয় অসংখ্য দীপের আলোয়, সমবেত জনতা আজ কাতর প্রার্থনা জানায় দেবাদিদেবের কাছে।

নর্তকী শুভা আজও পথ চেয়ে আছে। তার আবেদন নিষ্ফল হবে না। জানে, নিশ্চয়ই আসবে দেবশর্মা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে।

দেবতার কাছে আজ সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় উপচার সেই নৃত্যকলা দিয়ে প্রার্থনা জানায়। বীণা বেণু বাজছে। পাখোয়াজে গুরু গম্ভীর সুর তোলে, তারই দুরুদু তালে ওই ধ্রুবপদী বন্দনার লয়ে শুভা আজ নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়।

হাজারো ভীত ত্রস্ত জনতা কাতর আবেদন জানায়—প্রসন্ন হও দেব।

কারাগারের একটি প্রায়ন্ধকার কক্ষে বালুকারাম স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তার কানে এসেছে যুদ্ধের কলরব, ওরা এক একটা জলস্রোতের মত দুর্বার বেগে এগিয়ে এসেছে আবার এখানে প্রচণ্ড বাধা পেয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ফিরে গেছে।

বীরের রক্তে সোমনাথদেবের পূজা চলেছে, আজ বালুকারাম এই অন্ধকার নির্জনে বসে অনুভব করতে পারে কি এক মোহের বশে সে মস্ত ভুল করেছে।

গোপাকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল সে, তার সব মনুষ্যত্ব কর্তব্যবোধকে একটি শয়তানের কাছে বিক্রী করে সেও দানবে পরিণত হয়েছে।

সেই দানব আজ দুরন্ত লোভ আর লালসা নিয়ে আক্রমণ করেছে তার মাতৃভূমি, পুণ্য এই দেবতীর্থ। আর সে বীর হয়ে এই অপমান নীরব দর্শকের মত দেখে চলেছে। তার করার কিছুই নেই।

অধীর ব্যাকুলতা আর অন্তর্দ্বন্দ্ব তার সারা মনকে অসহ্য যন্ত্রনায় যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

এই জ্বালার তীব্রতা যে এতখানি তা কোনদিনই ভাবেনি বালুকারাম। গুর্জরের সিংহাসনে তার প্রয়োজন নেই। সে শুধু মানুষের মত বাঁচতে চায়। একজনের নিরঙ্কুষ প্রীতি ভালবাসা পেয়ে ধন্য হতে চায় সে। আবার তার হারানো সেইটুকুই ফিরে পেতে চায় বালুকারাম, তার জন্য যদি মৃত্যুও বরণ করতে হয় তাই হবে শ্রেয়, অন্ততঃ গোপা তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘৃণা করবে না। জানবে তার নামে যা রটনা হয়েছিল তা ভুলই।

বালুকারাম বীরের মত প্রাণ দিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে। হঠাৎ কারাগারের রুদ্ধ দ্বার খুলে যায়।

একটা মশালের আলো হারানো অন্ধকারের বুকে শেওলাধরা পাষাণ প্রাচীরের গায়ে কেমন রহস্যময় বলে বোধ হয়। কতকালের আতঙ্ক ওতে মেশানো, বিবর্ণ ওই শিলাতল। একটা চামচিকে বের হবার পথ না পেয়ে ওই আলোর ঝলকানিতে উড়ে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে তার পাখার হিমপরশ লাগে। ও যেন মৃত্যুর মত অশুভ একটি স্পর্শ।

বালুকারাম দেখে সামনে দাঁড়িয়ে রাজা ভীমদেব এবং গঙ্গাসর্বজ্ঞ। রাজা ভীমদেবের কণ্ঠস্বর সেই বদ্ধ ঘরে গুরু গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

—বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি তা নিশ্চয়ই জানো বালুকারাম?

বালুকারাম সবচেয়ে বড় শাস্তির জন্যই আজ প্রস্তুত। জবাব দেয় সে।

—মৃত্যুদণ্ড। সেই শাস্তিই আমি মাথা পেতে নেবো মহারাজ। কিন্তু একটা অনুরোধ।

—বলো!

—যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত যুদ্ধ করেই আমি মরতে চাই। অপরাধ আমি করেছিলাম, তার জন্য আমি অনুতপ্ত। ভগবান সোমনাথ দেব আমায় মার্জনা করুন, তারই উদ্দেশ্যে এ জীবন উৎসর্গ করে আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ দিতে চাই। এই প্রার্থনাটুকু আমার পূর্ণ করুন মহারাজ।

গঙ্গাসর্বজ্ঞের মুখের কঠিন রেখাটা সহজ স্নিগ্ধতায় মিলিয়ে আসে। বালুকারামের কণ্ঠস্বরে আকুতি ফুটে ওঠে।

—মহারাজ!

ভীমদেব ওর কথাটা ভাবছেন। গঙ্গাসর্বজ্ঞ বলেন।

—তোমার প্রার্থনার উত্তর যথা সময়ে জানাবো।

রাতের অন্ধকারে সুলতান চিন্তিত মনে পায়চারী করছে। আজকের যুদ্ধে তার পরাজয়ই ঘটেছে। নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। কোথাও কোন আশার সংবাদ নেই।

ওই পরিখা আর বিরাট তোরণ তার জয়ের পথে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মসজদ খাঁএর সঙ্গে শীর্ণ একটা লোককে ঢুকতে দেখে চাইল সুলতান। মসজদ খাঁ বলে।

—ইনি আচার্য মিত্রপাদ।

সুলতান গর্জে ওঠে।

—হিন্দুস্থানের সব বেইমান, কাউকে বিশ্বাস করি না। কোথায়

তোমার সেই সেনানায়ক বালুকারাম? শয়তান কাফের! বলেছিল সেইই নাকি ভিতর থেকে সুযোগ বুঝে দুর্গ তোরণের দ্বার মুক্ত করে দেবে, তার সব কথাই মিথ্যা! আবার এই শয়তানকে কোত্থেকে এনেছো?

মিত্রপাদ ভয় পেয়েছে। তবু বলে।

—আমাকে বিশ্বাস করুন সুলতান। হাসাম খাঁ আমার বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের পরিচয়ই আমি দোব। আমিও চাই ওই সোমনাথের আকাশছোঁয়া চূড়া ধুলোয় লুটিয়ে পড়ুক। তার জন্য সবরকম সাহায্যই আমি করবো জনাব।

সুলতান গজরায়।

—দেখি তোমার এলেমটা; নাহলে কাল তোমাকেই কোতল করবো পয়লা। নিয়ে যাও মসজদ খাঁ! দেখ এর দৌড়টা।

হাসাম খাঁ—সেনাপতি মসজদ আলিখাঁ বুঝেছে পরিখার ওপারের স্থলভূমিতে না পৌছানো অবধি কোন সত্যকার আক্রমণ চালানো যাবে না। ওদিকে দ্বারিকাদ্বারেও কঠিন বাধা রয়েছে, সে বাধা উত্তীর্ণ হবার সাধ্য নেই তাদের। তাই ভাবনায় পড়েছে তারা।

রাতের অন্ধকারে চলেছে মিত্রপাদ, মসজদ খাঁ আর হাসাম খাঁ। দূরে সোমপত্তনের প্রাকার সীমা কালো পর্বতশ্রেণীর মত বাধা প্রাচীর রচনা করেছে।

অন্ধকারে দেখা যায় সমুদ্রের জলরেখা; ঢেউগুলো ফাটছে, তাদের মাথায় মাথায় হাজারো মাণিক ঝলসে ওঠে।

সেই দীপ্তিতে অন্ধকার সমুদ্র ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে যায়। আবার আঁধার নামে।

ছোট খালটা এখানে সমুদ্রে এসে মিশেছে, যোয়ার আসতে আর দেরী নেই। সামনেই দেখা যায় কতকগুলো নোঙর করা

নৌকার ভিড়। শক্ত কাছি দিয়ে ওগুলো তীরের সঙ্গে আটকানো মাল্লারা তখনও নৌকার উপর জেগে আছে।

হাসাম খাঁ—মসজদ আলি খাঁয়ের চোখের সামনে বুদ্ধিটা খেলে যায়! সামনেই তাদের সমস্যা সমাধানের পথ।

মিত্রপাদ ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয় তীরের কাছে নোঙর করা ভড় নৌকা গুলোকে। ভাঁটার স্তিমিত টান শেষ হয়ে এইবার সমুদ্রে আসছে যোয়ারের দুর্বার সাড়া।

সরু খালটা জলে এইবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, মসজদ খাঁয়ের ইঙ্গিতে কয়েকজন ছায়ামূর্তি এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ ধার তরবারি দিয়ে নোঙরের কাছির দড়িগুলো কেটে দিয়েই নৌকাগুলোয় উঠে মাঝিদের বন্দী করে ফেলে

চীৎকার করার চেষ্টা করতেই তখুনি দু-একটা মৃতদেহ ছিটকে পড়ে সমুদ্রের জলে।

সুলতানী সৈন্যদল নির্দয়ভাবে ওদের হত্যা করে চলেছে। আর কোন সাড়াও ওঠে না। কয়েকটি মূহূর্তমাত্র।

সমুদ্রের ওপাশে রাখা কয়েকটা নৌকা ভারবাহী স্লুপ ভড় এদের হস্তগত হয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে সেই ভড়গুলো নিয়ে ওরা খালের মধ্যে চলেছে।

যোয়ারের জল ঢুকেছে তখন খালের বুকে। সেই পরিপূর্ণ খাল বয়ে ওরা নৌকা গুলোকে সোমনাথ পত্তনের ছায়া ঘেরা পরিখার দিকে এগিয়ে আনে।

আরও অনেকগুলো ছায়ামূর্তি যেন মাটির বুক থেকে মাথা তোলে, তারাও এগিয়ে আসে। নৌকাগুলোকে জোয়ারের জলে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। পরিখার একটা মুখ এখানে সমুদ্রে এসে মিশেছে। নৌকাগুলো নিশ্চুপে কালো ছায়ার মত এগিয়ে চলে।

কোন সাড়া শব্দ নেই। অন্ধকারে ঢেউ-এর মৃদু শব্দ ওঠে। তারা থেমে যায়। দূরে দেখা যায় কালো পাহাড়শ্রেণীর মত একটানা প্রাকার সীমা চলে গেছে, তার উপর সতর্ক প্রহরীদের দেখা মেলে ছায়ামূর্তির মত।

ছায়া অন্ধকাব ঢাকা পরিখার বুকে দুপাশের গাছগুলো নেমে এসেছে। তারই আড়াল দিয়ে এরা এগিয়ে চলে।

ভোরের আলো আজ ফুটে উঠেছে কি আশা নিয়ে।

রাজা ভীমদেব কালকের প্রতিরোধে আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। যে ভাবে হোক আর কটা দিন ওদের আটকাতে পারলে বাইরে থেকে আরও সাহায্য এসে পৌঁছবে নিশ্চয়ই।

ততদিনে সুলতানও হীনবল হয়ে যাবে। প্রভাসপত্তনের বাইরের গ্রামে আর মানুষ বিশেষ নেই। খাদ্য দ্রব্যও নেই। সুলতানের সৈন্যদল অনাহারে ক'দিন যুঝবে?

আজ দ্বারিকাদ্বারে সংগ্রামসিংহ নোতুন বিক্রমে বাধা দিতে প্রস্তুত। হঠাৎ সৈন্যদলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগে। পরিখার মধ্যে সারি সারি নৌকা ভড় লাগিয়ে শত্রুসৈন্য পার হবার জন্য এগিয়ে আসছে। পরিখার উপর তারা-সেতুর মতই একটা পথ রচনা করেছে।

সুলতান মাহমুদ আজ পরিখা পার হবার ব্যবস্থাই করেছে। হাসাম খাঁ মসজদ আলি খাঁয়ের সৈন্যদল সমবেতভাবে দ্বারিকাদ্বারে হানা দিতে এগিয়ে আসে।

ভীমদেবও বিচলিত হন। ভাঁটার টানে পরিখার বুকে জলের বিস্তার কমে গেছে। জল রয়েছে মাত্র মধ্যেকার একটু ঠাঁই। বড় বড় নৌকা ভড় যাবার উপায় নাই। নৌকাগুলো পরিখার বুকে জমাট বেঁধে বসে গেছে। কাতারে কাতারে সৈন্য ওই নৌকা দিয়ে পার হয়ে পরিখার কাছে এগিয়ে আসে।

দ্বারিকাদ্বারের বাইরে সংগ্রামসিংহ দলবল নিয়ে যুদ্ধ করে চলেছে। দুর্বার সেই সংগ্রাম। পরিখার চারিদিকে প্রাকারের দ্বারে হানা দিয়েছে সুলতানের সৈন্যদল।

কেউ দড়ির মই লাগাবার চেষ্টা করছে প্রাকারে, কিন্তু প্রাকার থেকে সৈন্যদল তীর ছুঁড়ে চলেছে, কাছে এগিয়ে যাবার সময় উপর থেকে গরম তেল গড়িয়ে পড়ে ওদের উপর, অর্দ্ধদগ্ধ আহত সৈন্যদল বাধা পেয়ে ফিরে আসে আবার বিপুল বিক্রমে এগিয়ে যায়।

ওদের রণ কোলাহলে সোমনাথপত্তন প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সংগ্রামসিংহ আজও প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে চলেছে! কিন্তু চারিদিকে ওর শত্রুসৈন্য ঘিরে ফেলেছে। ওই বীর রাজপুতকে হত্যা করাই যেন সুলতানের সেনাদলের প্রধান কাজ। ওকে না সরাতে পারলে তারা সোমনাথপত্তনে প্রবেশের পথ কোনমতেই পাবে না।

ওদের দল এগিয়ে আসছে, নৌকাগুলো ক্রমশঃ যোয়ারের জলে সচল হয়ে ওঠে, তবু সুলতানী সৈন্যদের খেয়াল নেই। স্রোতের বেগে এইবার তারা সমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছে।

পরিখার জলও বেড়ে ওঠে, ফেরবার পথ নেই। সুলতানের সৈন্যদল এবার বিপদে পড়েছে। পরিখার এদিকে আটকে পড়েছে তারা।

তবু মরীয়া হয়ে তারা সংগ্রামসিংহকে ঘিরে ফেলেছে। মরবার আগে তারা দ্বারিকাদ্বারে প্রবেশ করবেই।

তরবারির ঝঙ্কার ওঠে।

সংগ্রামসিংহও বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে। আর ফেরার পথ নেই। তার মৃত দেহের উপর দিয়ে সুলতানের সৈন্যদল সোমনাথে প্রবেশ করবে।

অবসন্ন দেহ, আঘাতে জর্জর। হঠাৎ সামনেই বালুকারামকে দেখে অবাক হয় সংগ্রামসিংহ।

বালুকারাম আজ প্রাণপণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছে। তার কৃতপাপের সে প্রায়শ্চিত্ত করবে। তার অনুচররাও প্রবল বেগে সুলতানের সৈন্যদের আক্রমণ করেছে।

হাসাম খাঁ বালুকারামের ব্যবহারে বিস্মিত হয়। সুলতান নিজে পরিখার এপার থেকে গর্জন করে।

—ওই বিশ্বাসঘাতককে কোতল করো।

সংগ্রামসিংহকে ছেড়ে ওরা বালুকারামকেই ঘিরে ধরেছে। প্রবলবেগে এগিয়ে যায় বালুকারাম। তার তরবারি রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সংগ্রামসিংহের সৈন্যদল প্রাকার থেকে বের হয়ে এসেছে ওদের নিঃশেষ করে দিতে।

রক্তে আপ্লুত হয়ে ওঠে মৃত্তিকা। ভীত ত্রস্ত সুলতানী সৈন্যদল দেখে ওদের ফেরার নৌকাও ভেসে গেছে, জলে লাফ দিয়ে পড়বার আগেই রাজা ভীমদেবের বাহিনীর হাতে ওরা নিহত হতে থাকে। প্রাকারের ধারে আটকেপড়া সৈন্যদল সুলতানের চোখের সামনে শেষ হয়ে চলেছে। তাদের নিহত দেহের স্তূপে পরিখা বুজে ওঠে।

তবু দ্বারিকাদ্বারে সমবেত সৈন্যদল শেষ হবার আগে বালুকারামকে তারা কঠিন আঘাত হেনে যায়।

সংগ্রামসিংহও ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করে।

—সেনানায়ক, সরে আসুন।

বালুকারাম আজ বীরের সবচেয়ে গৌরবের মৃত্যুই কামনা করে। তার বুকের রক্ত দিয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত করে যায়।

সুলতানের সৈন্যদল পলায়িত, পরাজিত। বেশকিছু সংখ্যক আজ নিহত। যারা পরিখার এদিকে এসে আটকে গেছে তারা

আর ফিরে যায় নি। দ্বারিকাদ্বারের তোরণ পথে তাদের মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা নামছে। স্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে বন্য শৃগালের দল আজ পরম উৎসাহে নৈশভোজ সমাধা করতে এসেছে।

সোমনাথপত্তনে নেমেছে শোকের ছায়া। বহু সৈন্যও হারিয়েছে সোমনাথপত্তনের, সেনানায়ক বালুকারামও নিহত হয়েছে। আজকের যুদ্ধে এদেরও কম ক্ষতি হয় নি। প্রাকারের দু এক জায়গায় ওরা কঠিন আঘাত হেনেছে। আজ সুলতানই যেন জিতেছে।

একজন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ওই প্রাণহীন দেহের দিকে। সে গোপা। তার মনে হয় বালুকারামের সম্বন্ধে ওই সব রটনা মিথ্যা। আজ প্রাণ দিয়ে সে তার সত্যতা প্রমাণ করে গেছে।

স্তব্ধ সাগরবেলায় ঢেউগুলো ভেঙ্গে পড়ে।

গোপার দুচোখ ছাপিয়ে জল নামে। বালুকারাম নেই। সেই সঙ্গে গোপার কত স্বপ্ন কত কল্পনা সব কোন দিকে নিঃশেষ হয়ে গেল।

—গোপা!

গোপা ফিরে চাইল। শুভাবতী তার পাশে দাঁড়িয়ে। তার কাছে আজ গোপার গোপন করার কিছুই নেই। শুভাও জানে সব কিছু। বলে—দুঃখ করার সময় এ নয় গোপা।

গোপা অশ্রুভিজে কণ্ঠে জবাব দেয়।

—তাকে ভুল বুঝেছিলাম শুভা, চিনতে পারিনি। সেই অভিমানেই বোধ হয় সে এমনি করে নিজেকে সোমনাথের পায়ে সঁপে দিল।

শুভা বলে—ভগবান সোমনাথদেব তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন। আজ শোকের দিন নয় শুভা, বুক বেঁধে দাঁড়াবার দিন।

—তাই ভাবছি শুভা। বালুকারাম আমাকে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছে। আমি পথ পেয়েছি।

একটি নারী আজ কঠিন শপথের আগুনে জ্বলে ওঠে।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ, ভীমদেব আজ চিন্তায় পড়েছেন। বালুকারামের মৃত্যু তাদের বিচলিত করেছে। সংগ্রামসিংহ আহত।

আজ মনে হয় সোমনাথের ইচ্ছা অন্যপ্রকার। তবু যুদ্ধ করা ছাড়া পথ নেই। সৈন্যবাহিনী তবু তৈরী হয়। জীর্ণ প্রাকার আবার গেঁথে তুলছে তারা। আজ তাদের জীবন-মরণ পণ।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ বলেন।

—একটা পথ তবু আছে। যদি ওই দানবকে ধনরত্ন কিছু দিই হয়তো ফিরে যাবে, তারও ক্ষতি অনেক হয়েছে।

চামুণ্ডারায় বালুকারামের মৃত্যুতে আজ ব্যথিত হয়েছে। তবু মনে মনে এই যুদ্ধ, সর্বনাশা ধ্বংসকে সে ভয় করে, এড়াতে চায়। সেইই বলে—সন্ধির প্রস্তাব করে দেখতে দোষ কি!

শেষ চেষ্টা তারা করবে। ভীমদেব বাইরের সাহায্য আশা করেছিলেন। যদি ভোজদেবের বাহিনী এগিয়ে আসে সুলতান বিপদে পড়বে। ততদিন ঠেকাতেই হবে।

তারই একটা উপায় হিসাবে সন্ধির প্রস্তাব করে সময় যাপন করতে চান তিনি, তাই রাজী হন।

—দেখুন, তবু সৈন্যদল একটু সময় পাবে।

একজন এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। সে আলবেরুণী। সুলতানের সৈন্যদলের অশ্ববাহিনীর এই দুদিনে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্বও তাকে মুগ্ধ করেছে। বারবার অন্তর দিয়ে চেয়েছে এবার সুলতানের পরাজয় হোক।

তাই চেয়েছে মিনাবাঈও।

সেও দেখেছে বারবার সুলতান ওই কঠিন প্রাকারে নিষ্ফল আঘাত করতে গিয়ে কত ক্ষতি সয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।

—শয়তানের এবার শিক্ষা হোক আবু রাইয়ান।

আলবেরুণী চুপ করে থাকেন।

যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে সুলতান। আজ হাসাম খাঁ নিজাম আলি মসজদ আলি খাঁ সকলেই চিন্তায় পড়েছে। পট্টাবাসে ক্লান্ত সুলতানও ভাবছে। এতদূর এসে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হবে, এ তার কলঙ্ক।

রাতের অন্ধকারে তবু তারা আগামী আক্রমণের খসড়া করছে। সময় নেই, ওদিকে ভোজরাজের বাহিনী এগিয়ে আসছে, কয়েকদিনের পথ দূরে আছে তারা।

সুলতান গর্জে ওঠে।

—ভয় পেয়েছো বেয়াকুফের দল ? কাজ ফতে করতেই হবে। সোমনাথের ওই চূড়া ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

সংবাদটা আনে আলি মসজদ খাঁ।

—সোমনাথের মহানায়ক নিজে এসেছেন, সুলতানের সাক্ষাৎ চান তিনি।

সুলতান আজ বালুকারামের ব্যবহারে বিস্মিত হয়েছে। ওরা সবাই বেইমান, কথা দিয়ে বালুকারাম সে কথা রাখেনি।

আবার কোন বেইমানের নাম শুনে বিরক্ত হয় সুলতান।

—হঠাও উস্‌কো!

আলবেরুণীই বলেন—কি বলতে চান উনি শোনা দরকার। সুলতান কি ভেবে বলে।

—আনো। জলদি বাত শেষ করতে বলো, আমার সময় নেই।

কথাটা মসজদ খাঁ-ই বলে।

—সোমনাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সন্ধি করতে চান, তাঁরা সুলতানকে কয়েক কোটী স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। সুলতান তাই নজরানা নিয়ে খুশী হয়ে ফিরে যান। অনর্থক লোকক্ষয় মন্দির ধ্বংস করে লাভ কি।

মসজদখাঁ হাসামখাঁকেও চামুণ্ডারায় আড়ালে আরও কিছু করে স্বর্ণমুদ্রা দিতে চায়, চামুণ্ডারায় এসব কাযে কাকে কি দিয়ে খুশী করতে হয় জানে।

ওরাও অহেতুক সৈন্যক্ষয় কবতে চায় না, তাছাড়া তারাও বুঝেছে অতি সহজে সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করা সম্ভব হবে না।

চামুণ্ডারায় সুলতানের দিকে চেয়ে থাকে।

সুলতান কি ভাবছে।

আলবেরুণী ও এই রক্তক্ষয় বন্ধ করতে চান, ধ্বংস যজ্ঞে লাভ কি। তাই বলেন তিনি।

—সন্ধির সর্তটা লোভনীয় সুলতান।

চামুণ্ডারায় এ বিষয়ে খুব হিসেবী লোক, সেইই ভেবে চিন্তে এগিয়ে এসেছে নিজের জীবন বিপন্ন করে সুলতানের ছাউনিতে। আগেই এসে হাসামখাঁ আর আলি মসজদের সঙ্গে কথা বলে তাদের হাত করেছে প্রলোভন দেখিয়ে, তারাও কিছু পাবার আশায় খুশী হয়।

সোমনাথ জয়-পরাজয় অনিশ্চিত, যদিও জয়ী হয় তারা তখন সেই বেপরোয়া সৈন্যদলের হাত থেকে কতটুকু কি পাবে তা জানেনা। এই পাবার আশাতেই তারা সুলতানের কাছে নিয়ে যায় ওকে, চামুণ্ডারায়ের কথায় আলবেরুণীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন।

সুলতান কি ভাবছে, সেও আলবেরুণীর কথায় ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চাইল, স্তব্ধতা নামে শিবিরে। বাইরে প্রহরীর যাওয়া আসার পদধ্বনি শোনা যায় মাত্র।

সুলতান এক নজরেই বুঝতে পারে তার সেনাপতিদের মনোভাব, বলে ওঠে সুলতান গম্ভীর স্বরে।

—তা হয় না হাসামখাঁ। মৃত্যুর পর আমি যখন বেহেস্তে যাবো তখন দেবদূতরা বলাবলি করবে কে আসছে? সুলতান মাহমুদ না? যে কাফেরদের সবচেয়ে মূল্যবান দেবতার মূর্তি ভেঙ্গেছে। এইটা ভালো শোনাবে না তারা বলবে এই সুলতান মাহমুদ শুধু অর্থের লোভে কাফেরদের দেবমূর্তি বিক্রি করে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে, এইটা প্রশংসার হবে?

আলবেরুণী জবাব দেন।

—সহনশীলতা, শ্রদ্ধা সহাবস্থান এসবের কি কোন মূল্য নেই? সুলতান গর্জে ওঠে।

—হিন্দুস্থানে থেকে থেকে তুমিও কাফের হয়ে উঠেছ আলবেরুণী।

সুলতানের সেনাপতিরা চুপ করে গেছে। সুলতানই বজ্রগম্ভীর স্বরে কথাটা শোনায়।

—আপনি নিরাপদে ফিরে যান মহানায়ক, আপনাদের সন্ধিতে আমার সম্মতি নেই।

ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বর। কঠিন একটা মানুষ, চামুণ্ডারায়ের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল।

ব্যর্থ হবে তা গঙ্গাসর্বজ্ঞও জানতেন।

রাত্রের অন্ধকারে সোমনাথের সাবধানী প্রহরীর দল চামুণ্ডারায়কে পথ দিল। প্রবেশ পথের দুধারে তারা ব্যগ্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু চামুণ্ডারায় তাদের কোন আশার খবর শোনাতে পারে না।

সারা সোমনাথপত্তনের পথে প্রাকারে রক্ষাদুর্গে সব সৈন্যই আজ

চকিতের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। ক্রমশঃ তারাও মনস্থির করে—হয় জয় না হয় মৃত্যু। এই দুয়ের মাঝখানে আর কিছু নেই, তারা বীরের মত লড়বে। প্রাণ দেবে। এই দৃঢ়বিশ্বাসে সোমনাথপত্তনের কয়েক সহস্র বীর প্রস্তুত হয়।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ ও স্তব্ধ হয়ে কথাটা শোনেন, সুলতানের সেই আস্ফালনের সংবাদে, রাজা ভীমদেব গর্জে ওঠেন।

—দেহের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে বাধা দেব সর্বজ্ঞ।

মন্দিরের পূজারীর দলকে আদেশ দেন সর্বজ্ঞ। আজ পূজা ছেড়ে তোমাদের ও অস্ত্রধারণ করতে হবে। কোথাও কোন দুর্বল অরক্ষিত স্থান থাকবে না বিস্তৃত প্রাকারে।

দেবদাসী মহলে আর্তনাদ শোনা যায়, একজন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে শুভা। জীবনে তার কোন আকর্ষণ নেই, আশা নেই, তাই এই মৃত্যুকে সে সহজ ভাবেই মেনে নেবে।

সমুদ্রের দিকে কয়েক শো নৌকাও রাখা আছে। গঙ্গাসর্বজ্ঞ মন্দির থেকে নারীদের সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অমত জানায় শুভা।

—আমি থাকতে চাই সর্বজ্ঞ, দেবতার দাসী আমি। দেবতার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আমারও ধ্বংস হোক, এই চাই। তাঁকে পরিত্যাগ করে কোথাও যেতে চাইনা আমি।

গোপার পরণে আজ পুরুষের বেশ, সে তার জানা যুদ্ধবিদ্যাকে আজ প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।

গঙ্গাসর্বজ্ঞ দুটি বিচিত্র নারীর দিকে চেয়ে থাকেন। এতদিন যাদের দেখেছেন এরা দুজনে তার থেকে বিভিন্ন।

অন্য দেবদাসীরা তখন ভৃগুকচ্ছের ওদিকে চলেছে। প্রাকারসীমায় কোলাহল ওঠে। ওরা জয়ধ্বনি দেয়।

—সোমনাথ দেবকি জয়। হর হর মহাদেও।

ওদিক থেকে সুলতানের সৈন্যদলের গর্জন ভেসে আসে। গোপা এগিয়ে যায়। শুভার সারা মনে একান্ত কামনা দেবশর্মার বাহিনী এসে পড়লে হয়তো এখনও সর্বরক্ষা হবে।

সময়মত সংবাদও পাঠাতে পারেনি, বহুদূরের পথ।

তবু জানে শুভা দেবশর্মা নিশ্চয়ই আসবে, তাই তার পথ চেয়েই সে সোমনাথে রয়ে গেছে, যাহয় হোক। সে একজনের জন্য অন্তহীন প্রতীক্ষাভরেই জীবন দিয়ে যাবে।

মেঘ গর্জনের মত কলরব ওঠে দ্বারিকাদ্বারে।

পুরোহিতরা বিচলিত ত্রস্ত। এতদিন তারা শাস্ত্র পাঠ করেছে আর পূজা অর্চনা করেছে, যুদ্ধ সম্বন্ধে জানে না কিছুই। অনেকে সোমনাথ দেবের মন্দিরে হত্যা দিয়েছে। দেবতার প্রত্যাদেশ শুনতে চায় তারা।

গঙ্গাসর্বজ্ঞের পরণে রক্তাম্বর, হাতে শাণিত কৃপাণ। কণ্ঠের রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে রক্ত চন্দনের ত্রিপণ্ড্র রেখা একটা বীভৎসতা এনেছে ওকে ঘিরে।

প্রাকার থেকে তিনিও আজ প্রতিরোধ পরিচালনা করছেন।

সুলতান মাহমুদ আজ সর্বশক্তি দিয়ে হানা দিয়েছে। তার সারা দেহ মনে আজ দুর্বার সাহস, কাল রাত্রে সন্ধির প্রস্তাব সুলতানকে ওদের দুর্বলতার সংবাদই দিয়েছে।

রাত্রি ভোর থেকেই ওরা নৌকা ভড় গুলোকে আজ শক্ত কাছি দিয়ে বেঁধে দ্বারিকাদ্বার-এর সামনে পথ তৈরী করছে। কয়েক জায়গাতেই তেমনি করে পথ করেছে হাসামখাঁ, বাধা দিয়েছে ওদের সৈন্যদল, তবু সেই বাধা তুচ্ছ করে কায করেছে হাসাম খাঁ।

সময় নেই। প্রাণঘাতী যুদ্ধে আজ জিততেই হবে তাদের। একযোগে তারা পরিখার বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়েছে। হস্তিবাহিনী এসে আঘাত হানছে দ্বারিকাদ্বারে।

ক্লান্ত সংগ্রামসিংহ তবু প্রাণপণে যুঝে চলেছে। মূর্তিমান শয়তান সুলতান মাহমুদ আজ সর্বশক্তি সংহত করে হানা দিয়েছে।

হাতীগুলো আঘাত হানছে দ্বারিকাদ্বারের কঠিন তোরণে, উপর থেকে প্রবল বেগে নামে গরম তৈলধারা। তীরন্দাজদের তীর বিঁধছে হাতীর সারা গায়ে তবু উন্মাদ হাতীগুলো ওই কঠিন তোরণদ্বারে সর্বনাশা আঘাত হেনে চলে।

বৃহৎ দ্বারটা কেঁপে উঠেছে।

রাজা ভীমদেব নিজেও আজ মুক্ত কৃপাণ হাতে এসেছেন। ওদিকে পরিখার বিভিন্ন স্থানেও আঘাত হেনেছে সুলতানের সৈন্যদল।

পরিখার গায়ে ওরা দড়ির মই লাগাবার চেষ্টা করছে, হাসামখাঁ দুর্বার বেগে আজ পরিখা পার হয়ে প্রাকারে উঠবার চেষ্টা করে চলেছে। ওদের তীরগুলো ঢালে প্রতিহত হয়ে ছিটকে পড়ে।

মইগুলো বেয়ে উঠছে তারা। অনেকেই ছিটকে পড়ে আঘাতে। এ আঘাত সহ্য করে কিছু সুলতানের সৈন্য প্রাকারে উঠছে, মুক্ত কৃপাণ হাতে তারা পথ পরিষ্কার করে—আশমান থেকে জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়—সুলতান মামুদ কি জয়!

গঙ্গাসর্বজ্ঞ কয়েকজন সৈন্য নিয়ে এই দিকে এগিয়ে আসেন মূর্তিমান ধ্বংসের মত। প্রাকারেই রক্তস্রোত বইতে থাকে।

বিশাল তোরণদ্বার ক্রমাগত আঘাতে কেঁপে কেঁপে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে পড়ে, ছিটকে পড়েছে পাথরের গাঁথুনি। কত সৈন্য দুর্বার উল্লাসে ওই মুক্ত পথ দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে চাপা পড়ে ধ্বংসস্তূপের নীচে, তাদের সমাধির উপর দিয়ে প্রবল জলস্রোতের মত প্রবেশ করছে সুলতানের বিজয় বাহিনী।

সংগ্রাম সিংহ ওই স্রোতের সামনে প্রাণ বিসর্জন দেয় বীরের মত, তার রক্তে নিষিক্ত হয়ে ওঠে দ্বারিকাদ্বার, রাজা ভীমদেবও আহত।

গঙ্গাসর্বজ্ঞের, চোখের সামনে ধ্বংসের নিষ্ঠুর সত্য ছবিটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

আহত অচৈতন্য ভীমদেবকে গুর্জর সৈন্যদল কোনমতে বের করে আনে। সুলতানের সৈন্যদল নগরে প্রবেশ করেছে, পথের দুদিকে ভীত ত্রস্ত নর নারীকে তারা নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে।

প্রাকারও তাদের দখলে, ভীমবেগে সুলতান—হাসাম খাঁ মসজদ আলি নগরে প্রবেশ করে মন্দির সীমার দিকে এগিয়ে আসে।

মন্দিরের রক্ষা প্রাচীর মাত্র ভরসা, তাতে এইবার বিপুল শক্তি নিয়ে হানা দিয়েছে সুলতান।

রাজপথে লুঠতরাজ সুরু হয়েছে। জ্বলছে বিপণি সুসজ্জিত হর্মমালা, মত্ত সৈন্যের উল্লাসে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত।

মন্দির চত্বরে আর্তনাদ শোনা যায়। পালাবার পথ একটি মাত্র খোলা, সমুদ্রের দিকে সীমাপ্রাচীর পার হয়ে পুরোহিতদল কিছু ভীত ত্রস্ত জনতা শিশু নারী পালাচ্ছে। গঙ্গাসর্বজ্ঞ বাধা দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু নিষ্ফল সে চেষ্টা।

কিছু সৈন্য তখনও ওদিকে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে।

গোপাও আজ কি এক রুদ্রধ্বংসের সংগ্রামে মেতে উঠেছে। মন্দিরের সীমা প্রাচীর থেকে তার অব্যর্থ লক্ষ্যে অনেক সুলতানী সৈন্য ছিটকে পড়ে, একটা তীর গিয়ে বিধেছে সুলতানের কাঁধে।

ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সুলতান প্রাকারের দিকে চেয়ে গর্জন করে ওঠে।

—একটা বেকুফ নৌ যোয়ানকে আহাম্মুকের দল হত্যা করতে পারো না?

গোপা আজ মৃত্যুকে তুচ্ছ করে যুদ্ধ করছে। তার আশপাশে সৈন্যরাও উত্তেজিত হয়ে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে চলেছে। একটা অতর্কিত তীরের আঘাতে গোপার ক্লান্ত অচৈতন্য দেহ প্রাকার থেকে নীচে ছিটকে পড়ে। একটি মূহূর্ত।

তার চোখের সামনে একটি সুন্দর জগতের স্বপ্নময় ছবি ফুটে ওঠে, সে আর বালুকারাম কোন অচেনা পথে চলেছে। সবুজ ছায়াময় বিহগকাকলী মুখর সেই পথ, বাতাস সেখানে মধু গন্ধ ভরা।

জীবনের সব আশা আনন্দ তার পূর্ণ হয়েছে।

অগণিত মৃত্যুর মাঝে এই মৃত্যুর কোন দাম নেই, তবু চামুণ্ডারায় চমকে ওঠে। গঙ্গাসর্বজ্ঞের কঠিন চোখে অশ্রু নামে। ওরা জীবনের সব কিছু সুন্দরকে এমনি করেই ব্যর্থ করে দেয়—ওই দানবের দল। আকাশ বাতাসে ওদের রণহুঙ্কার আর বিজয় উল্লাস ধ্বনিত হয়।

ভীত ত্রস্ত পূজারী দল আহত সৈন্যরা প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। শেষ রক্ষাপ্রাচীর বেয়ে সুলতানের সৈন্য দল নামছে—তোরণ উন্মুক্ত।

মুক্ত তরবারি হাতে ঢুকছে সুলতান মামুদ। সারাদেহে তার রক্তধারা—তরবারি ও রঞ্জিত। গজনী থেকে সে যাত্রা করেছিল, বহু রক্তপাত—হত্যা বিশ্বাসঘাতকতার পর আজ শেষ লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে মাহমুদ।

সামনে তার সেই বিশাল মন্দির, ভিতরে দেখা যায় বিগ্রহ।

হঠাৎ মন্দিরের থামের আড়াল থেকে দীর্ঘদেহী রক্তাম্বর পরিহিত খড়্গধারী সর্বজ্ঞ এগিয়ে আসে। দুচোখ তার জ্বলছে, তার খড়্গের প্রচণ্ড আঘাতে কয়েকজন সৈন্য ছিটকে পড়ে।

হাসাম খাঁর বর্শার আঘাতে গঙ্গাসর্বজ্ঞের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে মন্দির চত্বরে। শ্বেত প্রস্তরের মেজেতে রক্তস্রোত বয়ে যায়।

আজীবন সোমনাথদেবের পূজা করে আজ তারই চরণে প্রাণ উৎসর্গ করে গেলেন তিনি।

সোমনাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করছে সুলতান মামুদ। পা দিয়ে মৃতদেহটাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল।

সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। বিশাল মন্দির, অপূর্ব এর কারুকার্য, দরজাটা দেখে দাঁড়াল একবার। মূল্যবান চন্দন কাঠের দরজা, হাতীর দাঁত—স্বর্ণ রৌপ্যখণ্ড বসানো। নিমেষের মধ্যে ওর ইঙ্গিতে দরজাটা খুলে ফেলা হ'ল।

বিশাল গদা হাতে মন্দিরে প্রবেশ করে সেই বিগ্রহ মূর্তির উপর নিজেই প্রচণ্ড আঘাত করে চলেছে দানব সুলতান মামুদ।

কষ্টি পাথরের বিরাট শিবলিঙ্গ।

আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে তাতে মামুদ, সশব্দে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ে মূর্তিটা। বাতাসে তখনও ধূপের সৌরভ জাগে—চারিদিকে পড়ে আছে ভক্তদের নিবেদিত পুষ্পরাজি বিল্বপত্র। কেউ নেই তারা

ওদের প্রাণহীন দেহগুলো পড়ে আছে, রক্তের ধারায় মন্দির তল, চত্বর নিষিক্ত। নীরব হাহাকার মিশিয়ে আছে আকাশ বাতাসে।

আলবেরুণীকে ওরা এনেছে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। চোখের সামনে এই সর্বনাশ দেখে একটি মানুষ চমকে উঠেছে। মৃত্যু এখানে পথে পথে বিকীর্ণ।

সুলতান ওকে দেখে হাসছে, ওর অট্টহাসির শব্দ সারা মন্দির চত্বরে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে হাসছে একটি দানব।

—সুলতান! আলবেরুণী চমকে ওঠেন।

সুলতান মামুদ বলে চলেছে।

—খুব মর্মাহত হয়েছো পণ্ডিত, না? ওই মূর্তির চার খণ্ডের সবই নিয়ে যাওয়া হবে। একখণ্ড গজনীর মসজিদের প্রবেশ দ্বারে থাকবে, একখণ্ড থাকবে রাজপ্রাসাদের চত্বরে আর দুখণ্ড যাবে মক্কা আর মদিনা শরীফে। আর ওই চন্দন কাঠের দরওয়াজা যাবে গজনীতে, আমার সমাধি মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে লাগানো হবে ওই মূল্যবান দরওয়াজা।

সুলতান হাসছে। উন্মাদ পাশবিক হাসি।

মন্দিরের সুন্দর থামগুলোর উপরে দামী শিশের পাত মোড়া; ওরা কঠিন আঘাতে সেই মূল্যবান থামগুলোকে খুলে ফেলেছে, বের করছে সেই ধাতুর স্তূপ।

দরজাটা কঠিন আঘাতে কেঁপে ওঠে, শক্ত পাথরের বাঁধন থেকে ওরা খুলে নিল দরজাটা। উটের পিঠে বোঝাই করা হচ্ছে।

সারা সোমনাথপত্তনে তখন পথে পথে চলেছে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ওই দস্যুর দল প্রবেশ করছে, লুণ্ঠন করছে প্রভুত সম্পদ। আর সেই সঙ্গে নারী শিশু বৃদ্ধ সকলকেই হত্যা করে চলেছে নির্বিচারে।

আকাশ বাতাসে ওঠে কান্নার রোল আর আর্তনাদ। আগুন জ্বলছে ঠাঁই ঠাঁই। সারা সহরের আকাশ বাতাস সেই আর্তনাদ আর ধূমে আচ্ছন্ন।

পথে পথে শুধু রক্ত আর স্তূপীকৃত মৃতদেহ। ক'দিনের মধ্যেই সেগুলো পচে ফুলে উঠেছে। বাতাস তারই পূতিগন্ধে সমাচ্ছন্ন। পাখীগুলো এই রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে। এখানে কোন সুর কোন প্রাণ নেই, আছে শুধু বুক জোড়া হাহাকার।

এতদিনের এত বৎসরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এই সুন্দর সহর সোমনাথপত্তন একদিনেই দানবের হাতে পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

ওরা মন্দিরের সম্পদ লুঠ করে চলেছে।

সুলতান রুদ্ধ বিস্ময়ে মন্দিরের ধনাগারের দিকে চেয়ে থাকে। পাথরের সুরক্ষিত কক্ষটায় একটা গবাক্ষ থেকে এতটুকু আলো আসে আর সব অন্ধকারাচ্ছন্ন। কক্ষে সারি সারি সিন্দুকগুলো ভেঙ্গে ফেলছে দস্যুর দল।

সারা ভারতবর্ষের রাজাদের সম্পদ যেন এই খানেই জমা হয়েছে। এত হীরা মাণিক্য জহরৎ মুক্তার সমাবেশ গজনীর সুলতান কখনও দেখেনি। দরিদ্র পার্বত্য দেশ।

সেখানের মানুষ কোনমতে কায়ক্লেশে দিনপাত করে, সে দেশের রাজকোষে এত সম্পদ কোন দিনই থাকে না। আজ সুলতান এত সম্পদ দেখে চমকে উঠেছে।

মনে হয় তার এখানে আসা সার্থক হয়েছে। ওরা লোভী দস্যুর মত দুর্বার লালসা নিয়ে সেই সম্পদ আহরণ করে চলেছে।

চর্ম পেটিকায় ভারে ভারে তারা পূর্ণ করছে স্বর্ণ মুদ্রা, হীরা মাণিক্য জহরত সবকিছু। মন্দিরের মহাঘণ্টা বাঁধা ছিল সোণার শিকলে, যাত্রীদের হাতের স্পর্শে সেই ঘণ্টা বেজে উঠতো। সুলতান সেই সোণার শিকলও লুঠ করে নিল।

মন্দিরের ভিতরের দিকে সোনার পাত মোড়া থামগুলোকে কুঠারের আঘাতে চুরমার করে সেই সোনার পাতও বের করে নিচ্ছে—কোথাও এতটুকু ধন সম্পদ তারা রেখে যাবে না।

উট-হাতী ঘোড়ার পিঠে বোঝাই হয়ে চলেছে সব সম্পদ। তার মূল্য হবে প্রায় বিশলক্ষ দিনার।

এত সম্পদ সারা গজনীতে নেই!

আলবেরুনী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ওই দেবতাহীন ধ্বংসপ্রায় মন্দিরের দিকে, শ্রীহীন—রিক্ত সে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে তাকে ওই দানব। সুলতান আজ বিজয়দর্পে চারিদিকে চেয়ে দেখছে। কঠিন প্রতিরোধ চূর্ণ করে সে প্রবেশ করেছে এই নগরে মন্দিরে। তার সৈন্যদলেরও ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে প্রচুর।

সুলতান বলে ওঠে।

—বুঝলে পণ্ডিত, এর ধ্বংস হওয়া দরকার ছিল। ভারতের রাজাদের যদি এতে চেতনা হয়। আগামীদিনের মানুষকেও এই কথা স্মরণ করে সাবধান হতে হবে। এই সোমনাথের ধ্বংসস্তূপ একটি মহাজাতির শোকের লাঞ্ছনার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে অন্তহীন কালসমুদ্রের তীরে।

আলবেরুনী বলেন।

—আর সেই সঙ্গে তোমাকে তারা জানবে নিষ্ঠুর-সর্বনাশা একটি দস্যু বলে।

হাসছে সুলতান। তার অজ্ঞাতেই কোষবদ্ধ সেই অসি ঝনৎকার করে ওঠে। সামলে নিল সুলতান। ও জানে আলবেরুনীর মত অনেকেই তার এই বীরত্বকে দস্যুতা বলেই জানবে।

এই সোমনাথ জয়ের গৌরব তার কাছে একটা সাম্রাজ্যজয়ের মতই গৌরবময়। যে সম্পদ সে পেয়েছে তা সাম্রাজ্যের মতই। বেয়াকুফের দল এতদিন ধরে তিল তিল করে তারই জন্যে বোধহয় ওই কোষাগারে এসব সম্পদ সঞ্চিত করে রেখেছিল।

হাসি আসে সুলতানের।

—তুমি কে?

সুলতান সামনে রক্তবাস পরণে সন্ন্যাসীর মত জটাজুটধারী একজনকে দেখে সুলতান প্রশ্ন করে কঠিন কণ্ঠে।

মিত্রপাদ এতদিন ধরে এই দিনটির জন্য অন্তহীন প্রতীক্ষা

করেছিল। সোমনাথের মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। শিব মহাকালের প্রতিষ্ঠা দেশ থেকে, সমাজ থেকে মুছে যাবে। এইবার আবার তাদেরই মতবাদ—তন্ত্রাচার ফিরে আসবে পুরোমাত্রায়।

বালুকারামের উপর মিত্রপাদের অনেক আশা ছিল। কিন্তু শেষকালে বালুকারামের মত বীর কৌশলী ব্যক্তিও এই ধর্মের জন্য দেবতার জন্য প্রাণ দিয়ে গেল। সব গোলমাল করে গেছে বালুকারামই।

মিত্রপাদের প্রাধান্য সে থাকলেই বিস্তার লাভ করতো। এখন সে একা। তবু সোমনাথ জয়ের সংবাদে সেও এসে পড়েছে। মন্দির চত্বরে তখনও পড়ে আছে স্তূপীকৃত স্বর্ণমুদ্রা রাশিপ্রমাণ স্বর্ণ রৌপ্যের শিকল, পাত বাট, বড় বড় পেটিকায় রত্ন হীরা জহরৎ। সব পেটিকাবন্দী করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

মিত্রপাদ লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওই রাশীকৃত সম্পদের দিকে।

সে অনেক উপকার করেছে সুলতানের। হাসানখাঁ—মসজদ আলিও রয়েছে, দাঁড়িয়ে আছেন আলবেরুনীও।

মিত্রপাদ সুলতানের প্রশ্নে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে বলে—আমি সুলতানের গোলাম।

সুলতান ধূর্ত লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। ওর শীর্ণ চেহারা টিকলো খড়োর মত তীক্ষ্ণ নাক, জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখে এক নজরেই তাকে চিনেছে সুলতান। ওর কথায় গর্জে ওঠে।

—ঝুটবাত।

মিত্রপাদ কেঁপে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরে। তবু বলবার চেষ্টা করে।

—না সুলতান। আপনার সেনাপতি হাসামখাঁ জানেন। আমি সোমনাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে লুকিয়ে ওকে আশ্রয় দিইছি, আলবেরুণীও চেনেন আমাকে। আমার আশ্রমেই তিনি থাকতেন।

সুলতান হাসতে থাকে, প্রাণহীন কঠিন সেই কণ্ঠস্বর।

বলে ওঠে—তাহলে ইনাম নিতে এসেছো ?

মিত্রপাদ খুশীভরা কণ্ঠে জানায়।

—সুলতানের যা অভিরুচি ?

সুলতান বলে—নজরানা এনেছো বেয়াকুফ ?

—নজরানা! চমকে ওঠে মিত্রপাদ—গরীব সন্ন্যাসী!

—তোমার আশ্রমটাই তাহলে আস্ত থাকে কেন? মসজিদ আলি খাঁ ?

মিত্রপাদ আর্তনাদ করে ওঠে।

—সুলতানকে সাহায্য করার এই পুরস্কার ?

আলবেরুণীও চিনেছেন লোকটাকে, ও সাপের চেয়েও ক্রুর। নিজে হিন্দু হয়েও তুচ্ছ জেদের বশেই সারা মন দিয়ে এতবড় পরাজয়কে কামনা করেছে, সমর্থন করেছে।

সুলতান বলে .

—এই তোমার যোগ্য পুরস্কার। প্রাণে তোমায় হত্যা করবো না। হত্যা করতে আমার ব্যাথা লাগে তাই এই শাস্তিই দিলাম তোমায়। তোমার আশ্রমও ভস্মীভূত হবে। খুব সামান্য শাস্তিই দিলাম। সামনে থেকে যাও, নাহলে তোমার প্রাণও বিপন্ন হবে।

মিত্রপাদ সরে গেল প্রাণ ভয়ে।

চোখের সামনে দেখে ক'জন অশ্বারোহী বের হয়ে গেল। তার ছায়াঘন আশ্রমটাও এইবার ধুলোয় মিশিয়ে যাবে। আবার পথেই নামতে হ'ল তাকে।

হাজারো মানুষের ভিড়ে মিশে রসায়নবিদ ব্যাধি আর মেনকা আবার ফিরে এসেছিল সোমনাথপত্তনে। তারা ঘর

বেধেছিল দূরে কোন পাহাড়ের কোলে ঝর্ণার ধারে ছায়া সুনিবিড় গ্রাম সীমান্ত।

সুন্দর একটি আশ্রয়। সামান্য খেত খামারও ছিল।

ব্যাধি নিপুণ মন নিয়ে এখানে কাজে নেমেছিল। নানা রসায়ন—গাছ-গাছড়া নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু করেছিল। অবসর সময়ে রোগীও দেখতো। তার সুচিকিৎসার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দূর দূরান্তরে। রোগীও আসতো অনেক দূর থেকে।

মেনকা খুশী হয়েছিল। তাদের দিন ভালোই কাটছিল। কিন্তু ওই সুলতানের আক্রমণে ওদের সবকিছু আশা স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিল।

কোথায় যাবে জানে না, ব্যাধি আর মেনকা ভীত ত্রস্ত জনতার সঙ্গে মিশে এই সোমনাথ পত্তনেই ফিরে এসেছিল।

তারপর এই চরম সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছে। চোখের সামনে দেখেছে অপমৃত্যু আর রক্তপাত। সেদিন সোমনাথপত্তনের পতনের পর ওরা ধনদৌলত লুট করতে ব্যস্ত। মন্দিরের পিছনের উদ্যানের নীচে গোপন ভূর্গভস্থ কক্ষে ব্যাধি তখন তার কাজে ব্যস্ত।

এর প্রবেশপথ অনেকেরই অজানা। গঙ্গাসর্বজ্ঞ ব্যাধিকে সহরে দেখে নিজেই আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন এইখানে। তারও প্রয়োজন হতে পারে। কিছু বিশ্বস্ত অনুচর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেককে তুলে এনেছে। ব্যাধি মেনকা তাদের পরিচর্যায় ব্যস্ত।

শুভাও আজ প্রাণপণে সেবা করে চলেছে। জানেনা কি এর সার্থকতা—তবু এছাড়া আর করণীয় কিছুই নেই!

তার সব আবেদন নিষ্ফল হয়ে গেছে।

ভোজরাজার ওদিক থেকে কোন সাহায্যই আসেনি। আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।

তবু তারা সেবা করে চলেছে।

আজকের সর্বনাশা যুদ্ধের পর ওদের সৈন্য সামন্ত থেকে সুরু করে সুলতান অবধি লুটতরাজ নিয়েই ব্যস্ত। বিশৃঙ্খল অবস্থা। তাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবার কুড়িয়ে নেবার পালা।

পরিখার এদিক ওদিকে পড়ে আছে মৃত নিহত অগণিত সৈন্য, সীমাপ্রাচীরের আশে পাশে তাদের স্তূপ।

মিনাবাঈকে সুলতান তলব করেছেন।

কেন এই ডাক তা অনুমান করেছে মিনাবাঈ।

দীর্ঘদিন ধরে সে এই সর্বনাশকে ভয় করে এসেছে। কোনদিন কল্পনাও করেনি সোমনাথদেবের মন্দির ধুলিসাৎ হবে, তার বিগ্রহ চূর্ণবিচূর্ণ করবে ওই শয়তান।

চোখের সামনে দেখেছে মিনাবাঈ এই চরম সর্বনাশ। তাকে বন্দী করে এনেছে ওই দানব। এই চরম অপমান আর লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করতে হবে তাকে।

...মিনাবাঈ প্রতিমুহূর্তে কল্পনা করেছে এই কঠিন প্রতিরোধের সামনে পরাজিত হয়ে পালাবে সুলতান মাহমুদ।

হয়তো মারাত্মক ভাবে আহত হবে। কিন্তু সেই দানবের কোন ক্ষতি করতে পারে নি তারা। শুনেছে সব শেষ হয়ে গেছে।

ওই উন্মাদ দস্যুর কাছে ওরা আত্মরক্ষা করতে পারে নি, মন্দিরও বাঁচাতে পারেনি।

মিনাবাঈ এগিয়ে আসছে, এই সেই সোমনাথপত্তন। দুপাশে বিশাল অট্টালিকাগুলোকে দেখে মনে হয় ধ্বংসপুরী।

এর সব বৈভব সম্পদ আজ লুণ্ঠিত। এর পথে পথে ছড়ানো রয়েছে মৃত্যু। এর মাটি রক্তে পঙ্কিল হয়ে গেছে। বিরাট প্রস্তর-

নির্মিত প্রাকার আজ প্রহরী শূন্য। সারা শহরে উঠেছে আর্তনাদ আর আগুনের উত্তাপ, ধোয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

মন্দিরের স্বর্ণ কলসও তুলে নিয়েছে ওরা। সব শ্রী আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে। পথের দুধারে মাঝে মাঝে দেখা যায় উন্মাদ সৈন্যদলকে, তারা লুটের মালের বখরা নিয়ে ব্যস্ত।

মিনাবাঈ হঠাৎ প্রাকারের পাশে একটি নারীমূর্তিকে পড়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। ওর পরনে যোদ্ধার বেশ। মাথার বেণীটা খুলে পড়েছে। সুন্দর অপরূপ একটি তরুণী। দুচোখের পাতা বুজে গেছে।

প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে বোধ হয়।

চকিতের জন্য দাঁড়াল মিনাবাঈ, সুলতানের উপর ঘৃণা বেড়ে ওঠে। সামান্য নারীকেও হত্যা করে তবে তাকে এই মন্দির চত্বরে ঢুকতে হয়েছে। তার লুণ্ঠন পর্বে নারার উপর অত্যাচারও বাদ যায় নি।

তার নিজের উপর আসে অপরিসীম গ্লানি। দেশের জন্য নারী আজ অকাতরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিচ্ছে। আর সেও নারী, সে কিনা স্বেচ্ছায় এই বন্দীদশা মেনে নিয়ে একটা দানবের সঙ্গে রাজভোগ উপভোগ করে দেশ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। আজ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতে এসেছে তার এই চরম অপমৃত্যুকে।

মিনাবাঈ-এর নিজের উপরই বিজাতীয় ঘৃণা আসে। কিসের জন্য, কিসের আশার সে এত বড় অপমানকে তিলে তিলে সয়ে চলেছে জানেনা। আজ চোখের সামনে ওই কিশোরীর আত্মত্যাগ তার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে।

মনে হয় মৃত্যুকে ভয় করে এসেছে এতদিন; তাই নিজেকে পদে পদে অপমানিত করেছে। আজ সব অপমানের শেষ হোক।

ওই নারীরও প্রিয়জন ছিল, হয়তো রূপ যৌবনও ছিল।

জীবনে সুখী হতে পারতো, কিন্তু তবু সে সেই সামান্য সুখ চায়নি। তাই বোধ হয় এই আত্মত্যাগই করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার মতই প্রাণ দিয়েছে।

চুপ করে কি ভাবছে মিনাবাঈ।

তার সব দুর্বলতা মন থেকে মুছে গেছে।

কঠিন প্রদীপ্ত তেজে এগিয়ে চলে একটি অন্য নারী ওই ধ্বংসপ্রায় মন্দিরের দিকে। সব মোহ স্বপ্ন তার কেটে গেছে।

মনে হয় সে কোনদিন কিছু পাবার আশা করেছিল ওই দস্যুর কাছে। লোভী নারীমনের অবচেতন বিবরে কি একটা

পাশব কামনা লুক্কায়িত ছিল, আজ ওই গৌরবময় সুন্দর মৃত্যুর প্রশান্তি তার সব দুর্বলতাকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছে।

মিনাবাঈএর মনের মোহবন্ধন ঘুচিয়ে দিয়েছে। বহুদিন পর আজ মিনাবাঈ মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। মনটা অনেক হাল্কা হয়ে ওঠে।

ছায়ানামা গাছের নীচে গোপনে দেহটা পড়ে আছে প্রচুর রক্তপাতের ফলে অচৈতন্য হয়ে আছে সে। চারিদিকে ওই ছড়ানো মৃতদেহের মধ্যে ও ওর সুন্দর মুখখানা চোখে পড়ে। বিলাসে লালিত পালিত, চেহারাও তেমনি সুশ্রী।

ওত ক্লান্তি হতাশার অন্ধকারেও ওর রূপ যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত প্রকট হয়ে রয়েছে।

সৈন্যরা লুটের মাল সরাতে ব্যস্ত।

দুচোখ তাদের ধাঁধিয়ে গেছে এত বৈভব দেখে। এতদিন অসীম দারিদ্রের মধ্যে দিন কেটেছে তাদের। আজ এই প্রাচুর্য তাদের সব দুঃখ ভুলিয়েছে, তারাও ক্ষুদে আমীর হবার আশায় দৌড়াদৌড়ি করছে।

অন্য কোনদিকে দৃষ্টি নেই তাদের।

কে কোন দেহটা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখার হুকুম তাদের

নেই, প্রয়োজনও নেই। ওই মৃতদেহের ভিড়ের মধ্য থেকে তাই ক'জন অনুচর বিনাবাধায় ওদের দৃষ্টির অগোচরেই গোপার দেহটা বয়ে নিয়ে চলে গেল সেই পিছনের উদ্যানের দিকে।

পথটা কোন ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদের ভিত্তির সঙ্গে মিশিয়ে আছে। সঙ্কেত পেয়ে ভিতর থেকে সেই প্রবেশদ্বার খেলা হল। ওরা ভিতরে যেতে আবার বন্ধ হয়ে যায় সেই গুপ্তদ্বার।

এ নাটকের কোন দর্শকই রইল না।

মিনাবাঈও এ সংবাদ জানে না। তার মনে তখন অন্য ভাবনা।

স্থলতান ব্যস্ত হয়ে পায়চারী করছে। তার সময় বেশী নেই। এদিকের মালপত্র চালান হয়ে যাচ্ছে। তাব ছাউনিও তুলতে হবে।

সন্ধ্যা নামছে। আজ আর ভক্ত পূজারীর দল মন্দিরে নেই।

সহরের তোরণে নহবৎও বাজেনি। মন্দিবে দেবতাও নেই, আরতির পঞ্চপ্রদীপ শিখাও জ্বলেনি।

সারা শহরের লোক আতঙ্কে স্তব্ধ মাঝে মাঝে কার কান্নার করুণ রোল শোনা যায়, রাস্তার প্রদীপমালাও জ্বলেনি।

আকাশে আঁধার জমাট বাঁধছে কি ক্রূর ষড়যন্ত্রের মত।

আকাশে বাতাসে উঠছে আরব সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনি। ঢেউগুলো এসে মন্দিরের পিছনের বেলাভূমিতে শতধা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। নীল সমুদ্রের ঢেউএর মাথায় পূজোর সাদা ফুল কে ছিটিয়ে দিয়েছে।

অন্তহীন ওই কাল সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়েছিল সোমনাথদেব। একটি মানুষ তাকে আজে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

তখনও উন্মাদ সৈন্যদের কলরব শোনা যায়। তারা শহরে তখনও অবাধ তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে।

অন্ধকার শহর। মাঝে মাঝে কোন বাড়ীতে আগুন ধরিয়েছে ওরা। সেই আগুনের আভায় আকাশকোল অবধি রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

সুলতান আশা করেছিল মিনাবাঈও এই ভাঙ্গা মন্দিরের দরবারে এসে তাকে অভিবাদন জানাবে। সুলতান মামুদ তাকে দেখাবে তার প্রতাপ। ওই নারী প্রথমদিন থেকেই তাকে ব্যঙ্গ করে এসেছে।

হেসেছে সে তার দুঃসাহসের কথা শুনে।

তাই আজ তাকেও এখানে আসবার জন্য এত্তেলা পাঠিয়েছিল।

এখনও আসেনি মিনাবাঈ।

সামান্য একটা নারীর এত সাহস! তার এ সাহসের উৎস কোথায় জানেনা সুলতান।

ধনসম্পদ গৌরব কিছুই তার নেই, তারই দয়ায় সে পড়ে আছে। তার মান প্রাণ সবই সুলতানের হাতে। তবু কোন ভয় তার নেই।

সুলতান আজ ক্লান্ত, ক'টা দিন দারুণ পরিশ্রম গেছে। সোমনাথ ধ্বংস করার শপথ নিয়ে যেদিন গজনীর পার্বত্য উপত্যকা হিন্দুকুশ পার হয়ে ভারতে ঢুকেছিল সেইদিন থেকে এই উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ তার বেড়েই চলেছে। দেহ মনের উপয় একটা কঠিন চাপ এনেছে।

মাঝে মাঝে ক্লান্তি আর হতাশায় সারা দেহমন ভেঙ্গে গেছে, মনে হয়েছে ফিরেই যাবে। আঘাত বেদনাও পেয়েছে। উত্তেজনায় সে উন্মাদের মত হয়ে উঠেছে।

আজ সেই সবকিছুরই শেষ হয়েছে। তাই আজ সে বিশ্রাম চায়, মিনাবাঈ তবুও আসেনি। রাগও হয় সুলতানের মনের মধ্যে।

খুশীর আবেগে সেই রাগ কিছুটা চাপা পড়ে। আজ তার কাছে ওরা কৃপার পাত্রী।

...এতদিন কাছে ছিল মিনাবাঈ, ওকে ভালকরে দেখতেও সময় পায়নি। মনের মাঝে জ্বালা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে মোহব্বৎ করা চলেনা।

আজ সুলতানের মনে মিনাকে কেন্দ্র করে রাগ নয়, একটা বিচিত্র সুর বেজে ওঠে। ভারতের বুকে এতদিন শুধু তাণ্ডবই চালিয়ে এসেছে। ওর সব সৌন্দর্য-সম্পদকে দলে পিষে সে নিঃশেষ করেছে।

ভারতের অন্তরাত্মার পরিত্রাহি চীৎকার আর আর্তনাদ শুনেছে সে কানে। মিনাকে কেন্দ্র করে তার মনে কঠিন একটি দাবী আর শাসনের ধ্বনি জেগেছে।

আজ সুলতান মিনাকে অন্য চোখে দেখে।

ওর জন্য মনের কোণে একটু বেদনাও বোধ করে। তাই ওকে সুখী করতে মন চায়।

হাসাম খাঁ লুটের ধন সম্পদ নিয়ে আগেই যাত্রা করবে। তাদের বাহিনী দু একদিনের পথ এগিয়ে গেলেই সুলতান তার পিছু পিছু যাবে।

উট অশ্ব হস্তি-বাহিনীর পিঠে সাম্রাজ্যের ধন সম্পদ চাপানো হয়েছে। বাছাই করা সৈন্যদল নিয়ে হাসাম খাঁ বের হয়ে পড়েছে। তাদের বিদায় জানাতে এসেছে সুলতান।

সারা নগরে একটা পূতিগন্ধ, আগুনের ধিকি ধিকি শিখা জ্বলেছে। বুকচাপা কান্নার করুণ রেশের মাঝে তার বুক থেকে সব সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাত্রা করল সুলতানের বিশ্বস্ত বাহিনী।

এবার নিশ্চিত হয়েছে সুলতান।

ওরা লাহোরের দিকে এগিয়ে গেল। লাহোর মুলতান হয়ে যাবে গজনীতে।

রাত্রি নামছে।

পট্টাবাসের দিকে এগিয়ে চলে সুলতান।

প্রহরীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দেয়। আজ আর মন্ত্রণা নেই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা নেই। রক্ত পিপাসাও মিটেছে।

আজ সুলতানের মনে হয় নিমেষের মধ্যে তার অন্তরের একটা দিক শূন্য হয়ে গেছে। সেই শূন্যতার হাহাকার শুধু এক জায়গাতেই নয়—মনের মাঝে নিঃশেষ রিক্ততার বেদনা এনেছে।

এত সম্পদ বৈভব প্রতিষ্ঠার মাঝেও সে একাই, তার অন্তরের দিকটা যেন ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর মতই শোভাহীন বিধ্বস্ত।

ওখানে শুধু আগুনই জ্বলছে। নিজের কোন সম্পদ তার নেই।

—মিনাবাঈ!

মিনা আজ ইচ্ছে করেই সেই ধ্বংসপ্রায় মন্দিরের দরবারে যায় নি।

সুলতান হয়তো রেগেছে। লোকটা রাগলে কঠিন নির্বাক হয়ে ওঠে, ওর চোখ দুটো জ্বলছে।

মিনা ওকে দেখে অবাক হয়।

লোকটা এগিয়ে আসছে, মেজেতে বিছানো নরম কালিনের উপর ওর পায়ের শব্দ ওঠে না।

কাছে এসে মিনার দিকে এগিয়ে দেয় মহামূল্যবান একটা মুক্তা মাণিক বসানো হার, ওর দামী মণি মুক্তা হীরাগুলো আলোয় লাল নীল উজ্জ্বল আভায় ঝলমল করে।

সুলতান বলে।

—বহুমূল্য ওই হার তোমার জন্যই এনেছি মিনা।

মিনা বিশ্বাস করতে পারে না, দেবতার গলার ওই মহামূল্যবান হারটা তার গলায় পরাতে এসেছে ওই হৃদয়হীন শয়তান।

—দেবতার গলার হার দিতে এসেছেন আমাকে ? উপহার ! হাসে সুলতান।

সেই সহজ নিঃস্ব মানুষটা সামান্য প্রতিবাদের আঘাতেই চমকে উঠেছে। তার অন্তরের সেই কঠিন সত্বাটা জেগে ওঠে। ব্যঙ্গ ভরে জবাব দেয় সুলতান।

—দেবতা আর নেই। আমারই হাতের গদার আঘাতে তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় এখন উটের পিঠে সওয়ার হয়ে পাক্ গজনীর দিকে যাত্রা করেছেন। সেখান থেকে যাবেন মক্কা আর মদিনা শরীফেও। দেবতার গলার এ মালা এখন এই বান্দার দৌলত মিনাবাঈ, আমার যাকে খুশী তাকে দেবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে ?

মিনা জবাব দেয়।

—আমার না নেবার অধিকারও নিশ্চয়ই আছে সুলতান। ও আমি নোব না।

সুলতান একটু অবাক হয়। পরক্ষণেই তার কঠিন সেই সত্বা বলে।

—আমার হুকুম মিনাবাঈ।

মিনাবাঈ চমকে ওঠে, তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেই ধ্বংসপুরীর রূপ। মানুষ তার ধর্ম তার সত্য আর সম্মানের জন্য সবটুকু বিসর্জন দিয়েছে। সামান্য একজন নারীকেও প্রাণ দিতে দেখেছে সে। সেই সুন্দর মৃত মুখখানা তার মনের গভীরে কি নিদারুণ শক্তি আর সাহস আনে।

মিনা কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ করে।

—হুকুম তামিল যদি না করি ?

—তোমাকে—গর্জে ওঠে সুলতান।

মনের সব মিষ্টি স্বপ্ন তার এক নিমেষেই ওই নারীর কঠিন

প্রতিবাদের সামনে নিঃশেষ হয়ে যায়। ওর কঠিন প্রতিবাদে সুলতানের কোষবদ্ধ অসি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

মিনাবাঈ ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে তীব্র ঘৃণা আর জ্বালা। আজ সে মৃত্যুকেও ভয় করে না।

মুক্তি চায় এই জীবন থেকে।

সুলতান ওর দিকে চেয়ে চমকে ওঠে, সেই দুর্বার তেজের প্রদীপ্ত আভা মিনার মুখে চোখে।

তরবারি বের করতে গিয়েও থেমে গেল সুলতান।

মিনাবাঈ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে চলেছে।

—হত্যা করুন সুলতান। আমি এই জীবন থেকে মুক্তি চাই। তিলে তিলে এই ঘৃণায় জ্বলে পুড়ে আমি মরতে চাই না। এর চেয়ে আমায় হত্যা করুন।

সুলতানের চোখের দৃষ্টি বদলে যায়।

তার নিজের মনের অপরিসীম দৈন্য আর শূন্যতা বুক ভারি করে তুলেছে।

—মিনা!

মিনা কাঁদছে। দুঃসহ বেদনায় ব্যর্থ নারী শুধু কাঁদে। এ কান্না সুলতানের মনের সব কাঠিন্যকে নরম কবে তোলে।

...মনে হয় এতকিছু জয় করেও সুলতান একটি সামান্য নারীর কাছে হেরে গেছে।

তাকে অস্ত্র দিয়ে জয় করা যায় না, প্রভাব দিয়ে বশে আনা যায় না। তাই মনে হয়—ভারতবর্ষকে সে জয় করতে পারেনি। আলবেরুণীর কথাই মনে হয়—একে ধ্বংস করা যায়, জয় করা যায় না। ভারতবর্ষকে সে ধ্বংস করেছে কিন্তু জয় করতে পারে নি। এই নারীকেও সে এখুনি দলে পিষে নিঃশেষ করে ওর প্রাণহীন দেহটাকে

দূরে ফেলে দিতে পারে, তবু ওর অন্তরের মাঝে কোথায় একটা সত্বা আছে যাকে জয় করা যবে না।

কোন অস্ত্র দিয়ে এ জয় সম্ভব তাও জানেনা সুলতান।

মিনাবাঈ ওর দিকে চাইল, সুলতান বলে চলেছে।

—কোনদিন কাউকে ভালবাসোনি তুমি ?

মিনা তীক্ষ্ম কণ্ঠে জবাব দেয়।

—সেই প্রশ্নটা আমিই করছি আপনাকে। উত্তরও আমার জানা।

সুলতান অবাক হয়—কি সে উত্তর ?

—কোনদিনই কাউকে ভালোবাসতে পারেন নি আপনি। আপনার মত হৃদয়হীন লোক কোনদিনই ভালোবাসতে পারে না, তাই তারা হিংস্র—নির্মম—কঠিন। আপনাদের উপর ঈশ্বরের এই অভিশাপ।

সুলতান গর্জে ওঠে।

—ঈশ্বর ! তোমাদের ঈশ্বরের দৌড় আমি বুঝেছি মিনা। যাদের ঈশ্বরকে আমি নিজের হাতে ধ্বংস করেছি— সেই ঈশ্বরের উপর যারা ভরসা করে তারাও উন্মাদ।

—উন্মাদ আপনিই সুলতান। ঈশ্বরের কল্পনামাত্র ওই দেবতার মূর্তি। ঈশ্বর থাকেন মানুষের অন্তরে, তাকে কোনদিনই স্পর্শ করতে পারবেন না তার করুণাও আমার ভাগ্যে তাই কোনদিনই জুটবে না।

—দেখা যাক্, এর শেষ কোথায় ! আজ আমি ক্লান্ত মিনাবাঈ তোমার আর্জিটা আমার শোনো রইল।

সুলতান প্রাণভরে মদিরা পান করে, এতদিন ওসব স্পর্শ করেনি। আজ মুক্ত মন নিয়ে সে বিশ্রাম করতে চায়।

রাত্রি নেমেছে।

শিবিরের এখান ওখানে দুচারজন প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত। তাদের ছায়ামূর্তিগুলো মাঝে মাঝে দেখা যায়। সব সৈন্যরা ক'দিন প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে, অধিকাংশই আহত, অনেকেই মৃত। তাদের ছাউনিগুলো শূন্য পড়ে আছে। কিছু সৈন্য চলে গেছে হাসান খাঁয়ের বাহিনীর সঙ্গে।

শিবিরের সেই জাঁক জমক ভাবটা আর নেই।

অনেকের প্রিয়জনও মারা গেছে, বন্ধু বান্ধবও নিহত হয়েছে। কেউ বা আহত। তাদের কাতর আর্তনাদ শোনা যায়। অনেক মূল্যে সুলতান এই জয় সম্পন্ন করেছে।

সবকিছু সম্পদের বেশীর ভাগই পেয়েছে সে নিজে, আর এরা! এরা শুধু শুধুই রক্ত দিয়েছে।

একটা বুকচাপা অসন্তোষ নেমেছে কালো ছায়ার মত এদের মনে। ক্লান্ত ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল তাই নিষ্ক্রিয় হয়ে নিদ্রার বুকে ঢলে পড়েছে।

একজন জেগে আছে।

আলবেরুণীর ঘুম আসেনি। ক'দিন ধরেই কি একটা নিবিড় দুশ্চিন্তার মাঝে কাটিয়েছেন তিনি। সুলতান শেষ অবধি জয়ী হয়েছে, ধ্বংস করেছে সবকিছু।

সোমনাথের সব সম্পদ সে লুঠ করেছে, আলবেরুণীর অনুরোধে নেহাৎ দয়া করেই এই মন্দিরের গ্রন্থশালা সে ধ্বংস করেনি।

মূল্যবান বহু পুথি ধর্মগ্রন্থ রক্ষা পেয়েছে। তবু শান্তির সন্ধান পাননি আলবেরুণী।

চোখের সামনে দেখেছেন আর একজনের অপমৃত্যু। সে মিনাবাঈ। তাকেও এই দানব বন্দী করে এনে তিলে তিলে

হত্যা করে চলেছে। আজ সন্ধ্যায় দেখেছিলেন সুলতানের সেই শ্বাপদ লালসামাখা মুখ।

সে মিনাকেও গ্রাস করতে চায়!

একদিন তরুণ আলবেরুণী এই নারীকে ভালবেসেছিল, আজ তার কোন মূল্য নেই, অর্থ নেই। তবু একটা নীরব সুরের রেশের মত সেই বেদনাটুকু সারা মন ছুয়ে যায়।

আলবেরুণীও পথ ঠিক করে নিয়েছেন। ভারতবর্ষেই তিনি থাকবেন। বেশ জানেন গজনীতে গৃহযুদ্ধ বাধবে। সুলতান মামুদের ছোট ভাইও এইবার মামুদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সৈন্য সংগ্রহ করে সিংহাসন দখল করে নেবার চক্রান্ত করছে।

তাছাড়া সে দেশের উপর আলবেরুণীর কোন আকর্ষ৷ নেই।

হঠাৎ কার ছায়া মূর্তি দেখে একটু চমকে ওঠেন আলবেরুণী। এগিয়ে আসে মূর্তিটা।

—মিনাবাঈ।

মিনার দুচোখের জলধারা তখনও মুখখানাকে ভারি করে তুলেছে। ওর কথায় মিনা মুখ তুলে চাইল।

—চলে যাচ্ছো আবু রাইয়ান?

আলবেরুণীর সামান্য সঞ্চয়ও গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মিনার কথায় বলেন আলবেরুণী।

—হ্যাঁ। এই দানবের সঙ্গে বাস করলে নিজেকেই হারিয়ে ফেলবো মিনাবাঈ।

মিনাও সে কথা আজ সারা মন দিয়ে বিশ্বাস করেছে অনেক বেদনায়! আলবেরুণীর মুক্তির পথ আছে, কিন্তু তার!

জানেনা মিনাবাঈ কোথায় কবে তার পরম মুক্তি ঘটবে।

ব্যর্থ এ জীবন, কোন সঞ্চয় নেই। ভালবাসার সব স্বপ্ন সঞ্চয় তার ব্যর্থ হয়ে গেছে !

আলবেরুণী বলে চলেছেন।

—চোখের উপর এই সর্বনাশ দেখাও পাপ।

মিনাবাঈ জবাব দেয়।

—তোমার মুক্তি মিলবে আলবেরুণী, কিন্তু আমার ? তিলে তিলে এমনি করেই ফুরিয়ে যেতে হবে আমায়। তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো না আবু রাইয়ান ? এতবড় তুনিয়ার ওই জানোয়ারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েও কি বাঁচার ঠাই আমার হবে না ?

মিনাবাঈ আজ এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায়।

আবু রাইয়ান কি ভাবছেন। তার নিজেরই যাবার ঠাঁই নেই পথে পথেই ঘুরবেন তিনি।

—তুমি কোথায় যাবে মিনাবাঈ ?

মিনাবাঈ আজ বাঁচতে চায়। ব্যাকুলকণ্ঠে জবাব দেয় সে।

—তোমার সঙ্গে।

—আমিতো মুসাফির মিনাবাঈ, কোনদিন ঝুপড়ি কোন দিন গাছতলায়—নাহয় সরাইখানায় পড়ে থাকি।

- তুমি কোনোদিনই কাউকে এতটুকু ভালবাসোনি আলবেরুণী ? কোনদিনই কি ঘর বাঁধার আশা তোমার মনে জাগেনি ?

আলবেরুণী মিনাবাঈএর দিকে চাইলেন।

বিচিত্র এই নারী, সুলতানের ঐশ্চর্য ছেড়ে সামান্য এক মুসাফিরের সঙ্গে পথে পথেই ঘুরতে চায় সে ! এটা এমনি রূপবতী এই নারীর খেয়াল কিনা তা জানেন না আলবেরুণী।

তবু বিচিত্র ঠেকে !

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মিনাবাঈএর মন কঠিন হয়ে ওঠে,

ভেবেছিল তার এই ব্যাকুল আবেদন নিষ্ফল হবে না, আলবেরুণীর সঙ্গে সেও অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।

হয়তো তার মনের সেই গোপন কামনা পূর্ণ হবে, কিন্তু তা হয় না। ব্যর্থ হয়ে গেছে তার জীবন—যৌবন। ব্যাকুল নারীমন তাই নীরব হাহাকরে ভরে ওঠে।

মনে হয় এ জগতে প্রেম মিথ্যা, মিথ্যাই সে স্বপ্ন দেখেছে এতদিন। কোনকিছু সত্য সুন্দর এখানে নেই।

তাকে এই হীন অপমান আর লাঞ্ছনা সয়েই থাকতে হবে। আলবেরুণী বলেন।

—আমাকে ভুল বুঝোনা মিনাবাঈ, একটা ভুলই করছো তুমি। তোমার জন্য পথ নয়, সুলতানী প্রাসাদেই তোমার ঠাঁই।

মিনাবাঈ কান্নাভিজে কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

- তুমি যাও আবু রাইয়ান, আর আঘাত আমাকে দিও না। খোদার বেহেস্তে তোমাদের জন্য ঠাঁই কায়েম করা আছে আর তাঁরই নরকে পচে মরবো আমি। তুমি যাও! কোনদিনই কোন অনুরোধ তোমায় করবো না।

আলবেরুণী বের হয়ে গেলেন মাথা নীচু করে অপরাধীর মত।

রাতের অন্ধকারে ওই বনসীমার মাঝে একটা ঘোড়া আগে থেকেই তৈরী ছিল। আলবেরুণী সে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

রাতের অন্ধকারে তারাজ্বলা প্রান্তরের মাঝে একটা ঘোড়া অন্ধকার বিন্দুর মত দ্রুতগতিতে কোথায় হারিয়ে গেল।

তিনি জানেন এপথের নিশানা।

মাত্র দুএকদিনের পথ, তার মধ্যেই আলবেরুণী জানেন তিনি ভোজরাজের বাহিনীর সাক্ষাৎ পাবেন।

এই হিন্দুরাজার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছেন তিনি। বিরাট

একরাজ্যের রাজা, কাব্য-শাস্ত্র জ্যোতিষ-চিত্রকলা সব কিছু সম্বন্ধেই তাঁর অশেষ কৌতূহল।

সদাশয় রাজা, তাঁর বাহিনী এগিয়ে আসছে ঝটিকাবেগে, ওরা সুলতানকে শেষ করে দেবে।

মিনাবাঈএর সেই চোখের জল তখনও ভোলেনি আলবেরুণী, মিনা মুক্তি চায়, সাবা মনেমনে কামনা করে এই অত্যাচারের শেষ হোক। ওর জন্য আলবেরুণী ভোজরাজের সেনাপতি দেবশর্মাকে নিজে অনুরোধ জানাবে।

তারাগুলো কি অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। নির্জন প্রাণহীন প্রান্তর জনহীন গ্রামের পাশ দিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াটা ছুটে চলেছে তাকে নিয়ে।

মিনাবাঈ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোথায় কান্নার সাড়া ওঠে, মৃত স্তব্ধ নগরীর বুকে তখনও ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে।

তার জীবনের মতই ওই নগরীকে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে শয়তান মামুদ। আজ তার শেষ আশাটুকুও হারিয়ে গেল।

এখন তার সামনে একটা মাত্র পথ খোলা।

ওই শয়তানকেই মেনে নিয়ে চলতে হবে, এই জীবনের সব গ্লানি তার কণ্ঠরোধ করে এনেছে।

একটি চরম পরীক্ষার সামনে সে আজ উপস্থিত হয়েছে।

হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে মিনাবাঈ সচকিত হয়ে উঠে একবার চেয়ে দেখল।

সুলতান মামুদ ঢুকছে, তার মুখে পরিহাসের তীক্ষ্ণ হাসি।

প্রশ্ন করে।

—আলবেরুণীকে খুব ভালবাসতে নয় মিনাবাঈ ?

মিনাবাঈ চমকে ওঠে। ওর দুচোখে সেই আগুণ জ্বলে ওঠে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দেয়।

- সে প্রশ্নের উত্তর যদি না দিই!

—দিতে হবে না। জবাব আমি পেয়েছি। তবে তোমার জন্য আপশোষ হয় বাঈ; বার বার মোহব্বৎ করে শুধু দিলই জখম করে তুললে। বলেছিলাম না, ওসবের কোন দাম নেই। মোহব্বৎ ঈশ্বর সব ঝুট! শয়তানের দলে নাম লেখাও জিন্দগী খুশিতে কেটে যাবে। সুলতান তোমার পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে ধন্য হতে চায় মিনাবাঈ।

মিনাবাঈ ওর দিকে ঘৃণাভরা চোখে চাইল।

সুলতান বিনীত কণ্ঠে বলে।

—কি তোমার দৌলত আছে মিনাবাঈ যার জন্যে সুলতানকেও ভয় করো না?

—বলেছিতো মৃত্যুকেও ভয় করিনা সুলতান। মৃত্যুকেই যে ভয় করে না সামান্য সুলতানকে তার কি ভয়!

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে সুলতান মিনাবাঈএর কথার জবাব দিতে গিয়ে থামলো। মসজদ আলিখাঁ এসেছে। তার মুখচোখ থমথমে।

—আলবেরুণী পলাতক। মনে হয় রাজা ভোজের সৈন্যদলের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

—রাজা ভোজদেব!

সুলতান গর্জন করে ওঠে—তার সৈন্যদল কতদূরে?

—এখুনিই সংবাদ পেলাম তারা গিরিনগর পার হয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে। দিনরাত ধরে তারা এগিয়ে আসছে এই দিকে, কালই পৌঁছে যাবে।

সুলতানের গৌরবর্ণ মুখ রাগে রাঙ্গা হয়ে ওঠে।

—দেবশর্মার সৈন্যসংখ্যা ?

- অনুমান পঞ্চশহাজার।

সুলতান কি ভাবছে। তার সৈন্যদলের ক্ষমতা নেই নোতুন এই আক্রমণকে বাধা দেয়। তাছাড়া সৌরাষ্ট্র খণ্ডের এই অন্তরীপের মধ্যে ওদের যদি আটকে ফেলে, সমূলে নাশ করতে ও দ্বিধা করবেন না ভোজদেব।

তিনদিকে সমুদ্র বেষ্টিত স্থলটুকু থেকে এক্ষুনিই বের হয়ে যেতে চায় সুলতান। পথ একদিকে মাত্র খোলা, গুজরাটের নিম্নভূমি গহন অরণ্যের মধ্য দিয়ে কচ্ছের মরুভূমি রণ অঞ্চল পার হয়ে সিন্ধুদেশ দিয়ে ফেরাই নিরাপদ।

তবু হিন্দুরাজাদের প্রতাপ সেখানে অনেক কম। জনহীন পথ, অরণ্য আর মরুভূমি। তবু পালাতে হবে তাদের।

প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ওঠে সুলতান।

কঠিন কণ্ঠে হুকুম দেয়।

—ছাউনি তোলো, এই মুহূর্তেই যাত্রা করতে হবে মসজদ খাঁ।

আলবেরুণীই সংবাদটা দেয় দেবশর্মাকে।

—কচ্ছের রণভূমির দিকে সে পালাবার ব্যবস্থা করেছে। এতক্ষণ বোধ হয় ছাউনি উঠিয়ে যাত্রা করেছে। সেই সংবাদ আমি নিয়ে আসছিলাম তাই পথের মধ্যে ওর সৈন্যরা আমাকে বাধা দিতে চেয়েছিল।

সংবাদ শুনে দেবশর্মা কি ভাবছে।

সোমনাথ পত্তনে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দেয় অধীনস্থ সেনানায়ককে দিয়ে আর নিজেই সে মূলবাহিনী নিয়ে তখুনিই যাত্রা করে কচ্ছের দিকে। দেবশর্মা বলে সেনানায়ক।

—যে ভাবেই হোক সুলতানকে শিক্ষা দিতেই হবে। তুমি

সোমনাথপত্তনে যাও, আমি সুলতানের পথেই বাধা সৃষ্টি করবো, আবার দেখা হবে সোমনাথপত্তনে।

তূরীধ্বনি শোনা যায়।

রাতের অন্ধকারেই নোতুন করে সৈন্য সমাবেশ করে দেবশর্মা এগিয়ে চলে গুজরাট সীমান্তের দিকে। সেনানায়কের সঙ্গে অন্য সৈন্যদল সোমনাথপত্তনের দিকে যাত্রা করল।

বোধ হয় সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই ভয়ই করেছিল দেবশর্মা। একটু আগে আসতে পারলে সুলতান এত সহজে এই কাজ শেষ করতে পারতো না।

কে জানে শুভা আজও বেঁচে আছে কি নেই।

সোমনাথপত্তন সে রক্ষা করতে পারেনি। তবু সুলতানকে ধরতেই হবে।

কচ্ছের রণ এলাকায় ঢোকার আগেই ওরা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুলতান মামুদ এগিয়ে চলেছে। গিরিনগর থেকে অরণ্যভূমির পাশ দিয়ে চলেছে তারা। উষর বন্ধুর এলাকা, মাটি এখানে কৃপণ। তবু তার বুক থেকে রোদপোড়া বাবলা পিপুল গাছগুলো মাথা তুলেছে। পিঙ্গল তৃণজাতীয় সরগাছ ঘাসের বন বেড়ে উঠেছে।

রোদে আর বালিতে সেগুলো বিবর্ণ।

কতদিন বৃষ্টিপাত হয়নি কে জানে, ওই পাতায় সর বনে বালুকাকণা জমাট বেঁধে বসেছে বিবর্ণতার আভাষ নিয়ে।

রাতের অন্ধকারে বনভূমর দিক থেকে হিংস্র জন্তুর গর্জন শোনা যায়—সারা বনভূমি কাঁপছে ওই প্রবল গর্জনে। থর থর প্রকম্পিত বনভূমির বুক চিরে ভীত ত্রস্ত সুলতানের বাহিনী পালাচ্ছে।

পদে পদে তারা বাধা পেয়েছে। হিংস্র প্রকৃতি তাদের বাধার সৃষ্টি করেছে এখানে। সুলতানের চোখের সামনে ফুটে ওঠে

বিকট একটা হিংস্র সিংহের মুখ, বাতাসে জাগে বিশ্রী গন্ধ। সারা আকাশ বাতাসে ওই পশুরাজের প্রকট আবির্ভাবের স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে, দুটো চোখ আগুনের আভায় জ্বলছে।

মিনাবাঈ আর্তনাদ করে ওঠে।

লাফ দেবার আগেই মামুদের হাতের বল্লম ওই পশুরাজের বুকে বিঁধে যায়। সেই বল্লম নিয়েই পশুরাজ লাফ দিয়েছে, অব্যর্থ লক্ষ্য। কোনরকমে সুলতান মিনাবাঈকে টেনে নিয়ে সরে গেল, মাটিতে পড়ে ছটফট করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সেই সিংহটা।

সৈন্যদলের পিছনে হঠাৎ গর্জনধ্বনি শোনা যায়।

—হর হর ব্যোম

চমকে ওঠে সুলতান। দেবশর্মার বাহিনী তাকে নিষ্কৃতি দেয়নি। দারুণ প্রতিহিংসা নিয়ে ভারতের মানুষ তাকে হানা দিয়েছে। এবাব জয়ের নেশা তার মিটে গেছে।

শুধু প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে, দেশে ফিরতে হবে।

ফিরে যাবে সুলতান ছায়াঘন সেই পার্বত্য উপত্যকায়।

ওদিকে রাতের অন্ধকারে বনতল কাদের আর্তনাদে ভরে ওঠে। মসজদ খাঁ ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে সংযত করতে পারে না। দেবশর্মার সৈন্যের হাতে তারা নিহত হয়ে চলেছে।

—সুলতান!

মিনাবাঈ এর কথার সুলতান ফিরে চাইল ওর দিকে।

মসজদ খাঁ বলে।

—বাধা দেবার কোন চেষ্টাই আর সম্ভব নয় সুলতান।

সুলতান গর্জে ওঠে—তবে মরতে হবে?

—মরার চেয়ে মুক্তির পথ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ সুলতান। আমরাই যুদ্ধে এতদিন জিতেছি এবার আবার হারার পালা, তাই পালানোই প্রয়োজন। পরে আবার ফিরে আসবো আমরা।

মিনা হেসে ওঠে, পথশ্রমে ক্লান্তিতে তার মুখচোখ বিবর্ণ, তবু দুচোখে ওই হাসির আভাস কি মায়া আনে।

সুলতান এই হাসির অর্থ জানে। ও ব্যঙ্গ করছে তাকে।

নিষ্ঠুর সেই ব্যঙ্গ। সুলতানের আজ জবাব দেবার সময় নেই। মিনা বলে চলেছে।

—যদি ওরা আমাদের বন্দী করে?

—কখনোও না! প্রাণ থাকতে বন্দী করতে পারবে না সুলতান। মসজদ খাঁ কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয়। ওই আর্তনাদ কলরব তখনও চলেছে। বনের মধ্যে ওরা হিংস্রতায় বন্য পশুকেও হার মানিয়েছে।

সুলতানকে সসৈন্যে ঘিরে ফেলে এবার নির্বিচারে হত্যা করবে দেবশর্মার সৈন্যদল।

সুলতানের কিছু দেহরক্ষী সমেত মসজদ খাঁ ওই ছাউনী থেকে বের হয়ে মিনাকে নিয়ে বনের মধ্যে হারিয়ে যায়।

এত চেষ্টা করেও তাদের বাঁচতে হবে!

কোনদিকে চাইবার অবকাশ নেই। রাতের অন্ধকারে ওই হিংস্র বনভূমির বুকে তারা কটি প্রাণী এগিয়ে চলেছে।

পিছনে তাদের মূল বাহিনী তখন মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর আর্তনাদ করছে।

দেবশর্মা রাতের অন্ধকারেই বনভূমি ঘিরে ফেলেছে। মরীয়া হয়ে আজ আক্রমণ চালিয়েছে সে। সোমনাথ ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে হবে। সোমনাথ মন্দিরের বৈভব সম্পদ সব সে ওই দস্যুর হাত থেকে আবার ছিনিয়ে নেবে।

সেই দানব সুলতান মামুদকেও আবার বন্দী করে সে নিয়ে যাবে, সোমনাথ লুণ্ঠনের শাস্তি দেবে তাকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ।

রাতের অন্ধকারে মশালের আলোয় বনভূমি রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শত্রু বেষ্টিত সুলতানী সৈন্যের দল প্রাণপণে বের হবার পথ খুঁজছে।

মাঝে মাঝে বনে হিংস্র পশুগুলোও আদিম বিভীষিকা নিয়ে গর্জন করে ওঠে।

দেবশর্মার বাহিনী সুলতানের ক্লান্ত সৈন্যদলকে আজ মরণ কাঁমড়ে টুটি টিপে ধরেছে।

রাতের অন্ধকারে ওরা উন্মাদ আক্রোশে আক্রমণ হেনেছে। মৃত্যুর রাত। গাছে গাছে আলোর আভা পড়ে। অবরুদ্ধবাহিনী আজ মৃত্যুর তাণ্ডবে মেতে ওঠে।

রাত্রি ভোর হয়ে আসে।

আকাশকোলে ফুটে ওঠে দিনের অরুণ আলোক আভা। বিধ্বস্ত বাহিনীর মাঝে দেবশর্মা খুঁজে ফিরছে সেই সুলতানকে, কোথাও তার কোন চিহ্নই নেই।

নিহত সৈন্যদলের অধিকাংশই সাধারণ খোরাসানী তুরুক সোয়ার। দু একজন পদস্থ সেনানায়কও আছে। দেবশর্মা আহত সৈন্যদলের কাছ থেকেই সংবাদ পায় সুলতান আগেই বের হয়ে গেছে এই অবরোধ বেষ্টনী থেকে।

চমকে ওঠে দেবশর্মা। সব প্রচেষ্টাই তার ব্যর্থ করে দিয়েছে সেই শয়তান। সর্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্যন্ত নিয়ে পালাতে পেরেছে সেই দানব। আর তারই জন্য প্রাণ দিল এই সৈন্যদল।

এর পরই কচ্ছের রণ এলাকা।

ধূ ধূ মরুভূমি—কোথাও ঘাস পর্যন্ত নেই। লাল মাটি, বালি আর পাথরের প্রান্তর, মাঝে মাঝে কাঁটা গাছ জন্মেছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে তাদের পরিসর।

মানুষ সে রাজ্য যেতেও আশঙ্কা করে, পথ হারিয়ে কি তৃষ্ণায়

প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে প্রাণ হারাবে, সমগ্র রণ এলাকা তাই বিভীষিকার রাজ্য।

সেই রাজ্যে এসে পড়েছে সুলতান মামুদ।

ভারতবর্ষ সত্যই বিচিত্র, এর একদিকে তুষারমণ্ডিত সবুজ শ্রীভরা পর্বতশ্রেণী। অন্যদিকে দেখেছে ঘননীলা সমুদ্র, এর বুকে শষ্যশ্যামল উর্বর-ক্ষেত্র, অন্যদিকে ভীষণা প্রকৃতি। এর বুক হাহাকারে ভরা।

সুলতান সেই কঠিন রুদ্র প্রকৃতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সারা রাত্রি দিন চলেছে তারা। ক্লান্ত বিতাড়িত একদল মানুষ।

সুলতান জীবনে এমনি অসহায় বিব্রত অবস্থায় কোনদিন পড়েনি। ঘোড়াগুলো ধুঁকছে। ওদের মুখের লাগামের কড়ার ফাঁক দিয়ে সাদা ফেনা গড়িয়ে পড়ে।

ঘোড়াগুলো থামলো কিছুক্ষণের জন্য। পিছনে চেয়ে দেখে ওরা। নিশ্চিন্ত হয়, ওই বিশাল দিক সীমাহীন প্রান্তরে কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

দিনের রোদ ওখানে লেলিহান শিখায় নিশ্চিত মৃত্যু কে স্মরণ করছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজও বাড়তে থাকে। মাটি ফুঁড়ে উত্তাপ বের হচ্ছে, অগ্নিগর্ভা ধরিত্রীর বুক থেকে উঠেছে দুঃসহ জ্বালা।

তৃষ্ণায় জিব টেনে আসছে।

জল !....সামান্য জলের সঞ্চয় রয়েছে মাত্র।

কতদিনের পথ এমনি জললেশহীন হবে তা জানে না সুলতান। মসজদ খাঁ বলে।

—ঠিক পথে চললে দু তিন দিন লাগবে এই রণ এলাকা পার হয়ে সিন্ধু প্রদেশ পৌঁছুতে।

—পথ হারাই নি তো ?

সুলতানের কণ্ঠস্বরে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সূর্য তখন মধ্য গগনে, ওরা অসহায়ের মত একটা কাঁটা গাছের নীচে বসে থাকে।

পাথরগুলো অবধি গরম হয়ে উঠেছে, এ রাজ্যে কোন প্রাণীও নেই। পাখীর ডাকও শোনা যায় না। রোদে পুড়ছে এর মৃত্তিকা, সামান্য দু একটা ঘাস ওই কাঁটাগাছ আর হঠাৎ এসেপড়া বিতাড়িত ভীত ত্রস্ত এই মানুষগুলো অবধি।

মিনাবাঈ ধুঁকছে।

তাদের মত এত প্রচণ্ড প্রাণশক্তি তার নেই। তবু কোনমতে এসেছে সে এতদূর অবধি।

চোখের পাতায় জমেছে লাল ধুলোর আস্তরণ, পরনের সুন্দর দামী সালোয়ার ওড়নাও আজ মলিন বিবর্ণ, দুচোখের দৃষ্টিতে আর সেই মাদকতা ফুটে ওঠে না।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহটা আজ লজ্জাকে ও বিস্মৃত হয়েছে, এই কাঁটা গাছের ছায়াতলে দেহ এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে মিনাবাঈ, মাত্র কয়েকখানা চাপাটি আর একটু শুকনো মাংস এছাড়া আর আহার্য কিছুই নেই। জল ও ফুরিয়ে আসছে।

খেতেও ইচ্ছে করে না মিনাবাঈ এর। মুখে দাঁতে সূক্ষ্ম রেণু রেণু বালিকণা বিশ্রী বিরক্তিকর একটা ভাব এনেছে।

সুলতান মামুদ পাথরের উপর বসে একটা ক্ষুধিত পশুর মত সেই রুটি চিবুচ্ছে! ওর খাবার ভাব দেখে মিনাবাঈএর মনে হয় একটা ক্ষুধিত তাড়াখাওয়া জানোয়ার ক'দিনপর আজ আহার্য পেয়ে গোগ্রাসে গিলছে!

এত দুঃখে হাসি আসে মিনাবাঈএর। বলে।

—মসনদ আর রাজভোগ আজ খাসা জুটেছে সুলতান?

সুলতান ওর দিকে চাইল। মিনাবাঈএর চেহারায় একটা বিশ্রীভাব ফুটে উঠেছে। এতটুকু শ্রী তাতে নেই।

সুলতানের মনে হয় মিথ্যা কি মোহের বশেই তাকে সে এতদিন সঙ্গে সঙ্গে রেখেছে, আর প্রতিনিয়তই ওই মেয়েটি তাকে নিদারুণ ব্যঙ্গই করে চলেছে।

এ জ্বালা তার কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠে।

মিনা আজ খুশী হয়েছে মনে মনে। সে আর ওই সুলতানের মাঝে আজ আর পার্থক্য বিশেষ নেই। দুজনেই তারা সমান বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

একই কঠিন আঘাতে সমান ভাবেই আহত হয়েছে তারা। শুধু তাই নয়, সে আঘাত সুলতান মামুদকেই বেজেছে বেশী। তার চোখের সামনে আজ মৃত্যুভয় নগ্ন হয়ে ফুটে উঠেছে। তার সামান্য বৈভব আছে, ভবিষ্যৎ আছে। তাই বাঁচার আকাঙ্ক্ষা তার আরও দুর্বার।

কিন্তু মিনাবাঈ এর সে সব কিছুই নেই।

তাই সে কোন আশাই করে না। মৃত্যু ভয়েও সে ভীত ত্রস্ত নয়।

সহজভাবেই হাসছে সে এত দুঃখের মুখোমুখি হয়ে।

—ভয় পেয়ে গেছেন সুলতান?

মিনার কথায় মামুদ ওর দিকে চাইল।

নিস্তব্ধতা নেমেছে রৌদ্রজ্বলা ওই প্রান্তরে, বাতাসে শুধু বালি ওড়ার ক্ষীণ শব্দ ওঠে। সূর্য এখানে প্রদীপ্ত তেজে সারা ধরিত্রীকে পুড়িয়ে তামাটে বিবর্ণ করে তোলে।

মনে হয় দূরে কোথায় সবুজ গাছের সীমাঘেরা লোকালয় জলের সন্ধান আছে। শান্তিতে অবগাহন স্নান করবে তারা, তৃষ্ণার্ত ওই ঘোড়াগুলো জলে নামবে! জল পান করবে। আবার নোতুন বলে বলীয়ান হয়ে উঠবে তারা।

—মসজদ আলি!

সুলতানের কণ্ঠস্বর শুষ্ক, কেমন যেন মৃতের কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ফুটে উঠেছে ওতে। ঠোঁটগুলো রোদের তাপে ফেটে উঠছে।

ছচোখে কাঠিন্য। সেই দৃষ্টিতে একটা শূন্যতা জাগে।

—ওখানে জল আছে আশ্রয় পাবো।

মসজদও ওই দিকেই যেতে চায়। মিনাবাঈ হাসে।

—জনাব! ও মরিচীকা। ওখানে জল নেই—আশ্রয় নেই। মরুভূমিতে ওটা শয়তানের ফাঁদ।

সুলতান গর্জন করে ওঠে। লোকটা বাঁচার জন্য আজ পাগল হয়ে উঠেছে। মিনাবাঈ বলে।

—ও শুধু মিথ্যা আশা দিয়ে পথভোলা পথিককে টেনে নিয়ে যায়, তাকে ঘুরিয়ে ক্লান্ত করে তোলে, অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

তবু মন মানে না, ওরা চলেছে ওই মরিচীকার দিকে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ক'টি মানুষ। সারা ভারতের ত্রাস সুলতান মামুদ আজ একবিন্দু জলের জন্য মরুভূমিব বুকে সর্বস্ব কবুল করেও এগিয়ে চলেছে।

কচ্ছের রণ এলাকায় যে যায় সে আর নাকি ফেরে না। ও অভিশপ্ত এলাকা। দেবশর্মা সারা অঞ্চল অন্বেষণ করছে। বোধ হয় দলছাড়া সুলতান ওই রণভূমিতেই গিয়ে ঢুকেছে। ও জানেনা কি সে বিভীষিকার রাজ্য। সুলতান আশা করেছে কোনমতে রণ এলাকা পার হয়ে সিন্ধু দেশের মধ্য দিয়ে ফিরবে।

কিন্তু সে জানে না কোথায় গিয়ে পড়েছে।

দেবশর্মা ক্ষুণ্ণ মনেই সোমনাথপত্তনের দিকে ফিরছে। সেই ধ্বংসস্তূপকে ও প্রত্যক্ষ করবে সে।

সেই মন্দির রক্ষা করতে পারেনি সে, আজ সেখানে করার কি আছে জানে না। কিন্তু তবু যেতে হবে তাকে।

কি এক দুর্বার আকর্ষণেই সে চলেছে। পথের শেষ নেই। এতদিন এগিয়ে এসেছে দুর্বার গতিতে। তখন একটা উদ্দেশ্য ছিল, মামুদকে বাধা দিতে হবে, রক্ষা করতে হবে সোমনাথ পত্তনকে।

কিন্তু সে সব আজ চুকে গেছে।

ওই দানব সোমনাথকে ধ্বংস করে নিজেই ধ্বংস হবার জন্য এগিয়ে চলেছে কচ্ছের রণ অঞ্চলে।

ফিরছে দেবশর্মা।

পরিত্যক্ত গ্রামগুলোয় আবার ঘরহারা মানুষের দল ফিরে আসছে। ঘরবাড়ীগুলো কতক আগুনে পুড়েছে কতক ওরা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। শস্যরিক্ত ক্ষেত।

সারা দেশের বুকে একটা ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে চলেছে। সবুজ আখের ক্ষেতের বুকে ওরা ঘোড়ার দল হাঁকিয়ে সব ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে গেছে। সেই ধ্বংসপ্রায় ক্ষেতে আবার কোন চাষী জল সেচ করে চলেছে।

সেই মুইয়ে পড়া গাছগুলোকে ঘিরে আবার ভেলি বাঁধছে।

দেবশর্মা থমকে দাঁড়াল।

—কি করছ তুমি প্যাটেল?

এখানের প্রবীণ গ্রামবাসীদের প্যাটেল বলে। পাগড়ী বাঁধা অসহায় লোকটা গাছগুলোকে মমতাভরা চোখে দেখছে। ওর কথায় জবাব দেয়।

—আবার নোতুন করে বাঁচতে হবে তো?

দেবশর্মা ওর কথায় সান্ত্বনার আশ্বাস পায়। এত আঘাত বিপর্যয়েও মানুষ মরেনি। ওরা তবু বেঁচে আছে।

হয়তো সোমনাথপত্তনের মানুষও বাঁচবে আবার।

মানুষের তাই ধর্ম, সে শত সংঘাতের মাঝেও বাঁচবার চেস্টা করে।

ধ্বংসপ্রায় সোমনাথপত্তন। প্রাসাদগুলো ভগ্ন, সারা সহরের পথে পথে ঘুরছে ভীত ত্রস্ত মানুষ। তারা বিশ্বাস করতে পারেনা যে সেই দানব আবার ফিরে গেছে।

মনে হয় হয়তো দুচারদিনের জন্য কোথাও সরে আছে মাত্র, তারা বের হয়ে এলে আবার সেই দৈত্যও দলবল নিয়ে ফিরে আসবে, তাদের নিঃশেষে হত্যা করে যাবে।

সহরের অবশিষ্ট যা আছে তাও ধ্বংস করে যাবে নিষ্ঠুর আঘাতে। কিন্তু সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ে।

এই ধ্বংসপুরীর অন্ধকারে একটি নারী দাঁড়িয়ে থাকে। চারিদিকে চূর্ণ বিচূর্ণ মন্দিরের থাম, কারুকার্য করা শ্বেত পাথরের টুকরোগুলো ছড়িয়ে আছে ছত্রাকারে।

শুভা এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এসে দাঁড়ায় মাঝে মাঝে। এই ধ্বংসস্তূপ যেন সারা জাতির কলঙ্কের ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা প্রচণ্ড ঝড়ে সবকিছু ভেঙে পড়েছে, হারিয়ে গেছে সব শ্রী বৈভব। ঐ সোমনাথমন্দির রক্ষা করতে দেবশর্মাও আসতে পারেনি। সুলতান প্রচণ্ড আঘাত হেনে গেছে। দেবতাও অপমানে লজ্জায় মুখ লুকিয়েছিল।

চামুণ্ডারায় বালুকারাম মৃত, রাজা ভীমদেব কোনরকমে বেঁচে ছিলেন আহত অবস্থায় তিনিও সুস্থ হয়ে উঠছেন।

কিন্তু তাঁর সবশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর সেই পরাক্রম নেই। রাজ্যে অরাজকতা, সৈন্যদলও ধ্বংস হয়ে গেছে।

আর একজনকে আজ চেনা যায় না, সে গোপাবতী।

কবিরাজ ব্যাধির চিকিৎসায় তার মুমূর্ষদেহে প্রাণ এসেছে, সুস্থ হয়ে উঠছে সত্যি। কিন্তু গোপাবতীর এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ছিল ভালো।

হঠাৎ কার হাসির শব্দ ফিরে চাইল শুভা। তারাজ্বলা অন্ধকারে একটা ম্লান আভা উঠেছে মন্দির চত্বরে। গোপা হাসছে। বিভ্রান্তের মত সেই হাসি কঠিন নির্মম ব্যঙ্গের মত শোনায়।

—এখনও মন্দিরে আরতি সুরু হয় নি! গঙ্গাসর্বজ্ঞ কোনদিকে নজর দেবেনা। দেবতা উপবাসে থাকবেন? কই সেই আলোকমালা, দেবদাসীর দল ভক্তযাত্রীরাই বা কোথায়?

শুভা এগিয়ে আসে, গোপা হাসছে অর্থহীন হাসি।

শুভা বলে।

—অসুস্থ শরীর নিয়ে তুমিই বা কেন বের হয়ে এলে গোপা?

—গোপা! কে গোপা? না না। আমি কেই নই। গোপা গেছে সেনানায়ক বালুকারামের সঙ্গে ওই বেলাভূমিতে। এখুনি চাঁদ উঠবে, তুটি মন তারই প্রতীক্ষায় সমুদ্রের তীরে বসে আছে, ওরা সত্যিই সুখী হবে, কি বলো শুভা?

হঠাৎ এগিয়ে যায় গোপাবতী।

আজ সব স্মৃতি চেতনা তার আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এ জগতের সে কেউ নয়। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিচিত্রা নারীসত্বা, নীরব দর্শকের মত ধ্বংসপুরীর দিকে চেয়ে থাকে, বুকে ওর নিবিড় বেদনা। একটি সার্থক ভালবাসায় ভরা রূপ যৌবনমদির জীবন সব আশা কামনা নিয়ে অকালেই শুখিয়ে গেল।

সত্যিকারের সেই গোপাবতী আর বেঁচে নেই, যে আছে সে অন্য নারী। গোপার কঙ্কাল মাত্র।

গোপার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—আলো জ্বালাও, ঘণ্টাধ্বনি করো। দেবতার আরতি হবেনা?

নির্জন মন্দিরে ওর আর্তনাদ শোনেন আর একজন।

তিনি রাজা ভীমদেব। আহত দেহ নিয়ে কোন রকমে অলিন্দে এসে দাঁড়িয়ে চেয়েছিলেন অন্ধকার ওই মন্দিরের দিকে।

একটি অসহায় নারীর সেই আর্তনাদভরা ব্যাকুল কামনার সুর শূন্য দেবালয়ের ভগ্নস্তূপে ঘুরে বেড়ায়।

তার মনে হয় মানুষ আজ এমনি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভীরু কোন জানোয়বের দলের মত গর্তে মাথা লুকিয়ে বাস করছে।

জাতিব এই চরম দুর্দিনে আজ তার সব হারিয়ে গেছে।

শুভার দিকে চোখ পড়তে রাজা ভীমদেব বলেন।

—তুমি এখানে?

শুভার দুচোখে জল। জবাব দিল না সে।

রাজা ভীমদেব বলেন।

—আবাব যদি দেশ জেগে ওঠে, দেশেব নোতুন মানুষ সেদিন এই ধ্বংসস্তূপেব উপব আবাব নোতুন মন্দিব গড়বে, অন্তরের ভক্তি আব প্রণতি দিয়ে তাবা দেবতাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

—সত্যি! শুভার কণ্ঠে আশার সুব।

—হ্যাঁ, এই বিশ্বাস নিয়েই এই ধ্বংসপ্রায় মন্দির আঁকড়ে থাকবো আমরা

রাতের অন্ধকারে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী এসে পোঁচেছে সোমনাথ পত্তনের ভগ্ন প্রাকারের বাইরে। পরিখা আজ জনশূন্য, নগরী অরক্ষিত! প্রাকারে প্রাকারে প্রহবী আজ নেই, আকাশ বাতাসে ওঠে না সোমনাথদেবের সেই মন্দির চূড়া থেকে ঘণ্টার ধ্বনি। টিকারা শানাই এ পুরিয়ার সুরও আজ স্তব্ধ।

দেবশর্মা এই ভগ্নপ্রায় নগরীব পথে আজ পা দিয়ে শিউরে

ওঠে। কোথাও যেন প্রাণের সাড়া নেই। কয়েকজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে দেবশর্মা ভগ্নপ্রায় দ্বারিকাদ্বার দিয়ে বিনা বাধায় আজ ঢুকেছে নগরীতে।

দু চারজন লোক হয়তো পথে ছিল, কোন আলো নেই। বিপণীর দ্বারও বন্ধ। লোকজন অশ্বখুরের শব্দে অস্ত্রের ঝনঝনায় ভীত হয়ে কোথায় সরে গেছে।

পরিত্যক্ত অন্ধকার পথ, একটু চাঁদের আলোয় সারা নগরীকে দেখে মনে হয় মৃত স্তব্ধ এক ধ্বংসপুরীতে তারা ঢুকেছে।

মন্দির চত্বরের বাগানে প্রাঙ্গণে পড়ে আছে পাথরের ধ্বংসস্তূপ। সুন্দর বাগানে আজ সবুজের একটুও ছোঁয়া কোথাও নেই। দস্যুর দল লুণ্ঠন শেষে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে গেছে। এই নিদারুণ অপমানের প্রতিশোধ সে নিতে পারেনি।

কে জানে কেউ বেঁচে আছে কি না এ মন্দিরে। এত লোকজন, পূজারীর অনেকেই আজ মৃত। হয়তো নিহত না হয় প্রাণ ভয়ে পলাতক।

হঠাৎ দেবশর্মা অন্ধকারে কাদের কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়।

শুভাও এখানে আবার সৈনিকের বেশে কাদের দেখে অবাক হয়। আবছা চাঁদের আলোয় দেখা যায় ওরা ভগ্নমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রণতি জানাচ্ছে দেবতাহীন মন্দিরের উদ্দেশ্যে। শুভা প্রথমে ভীতই হয়েছিল, রাজা ভীমদেবকে বলে চাপা স্বরে।

—আপনি ভিতরে যান মহারাজ!

ভীমদেবও বেদনাভরা কণ্ঠে বলেন।

—এর চেয়ে দস্যুর হাতে প্রাণ দিতেই চাই শুভা, এই ধ্বংসপুরীর মধ্যে অসহায়ের মত বাঁচতে চাই না।

—কে!

শুভার কণ্ঠস্বর! অন্ধকার ধ্বংসপুরীর মাঝে এখনও তাহলে প্রাণের সাড়া জেগে আছে। ওই কণ্ঠস্বর চিনতে দেরী হয় না দেবশর্মার। সারা শরীরে মনে নীরব রোমাঞ্চ জাগে।

—শুভাবতী!

শুভার সারা দেহে ওই আরব সমুদ্রের জোয়ারের সাড়া জাগে। এতদিন ওই একটি আহ্বানের জন্যই সে প্রতীক্ষা করেছিল বুকভরা ব্যাকুলতা নিয়ে।

আজ সে এসেছে, কিন্তু!

দেবশর্মা এগিয়ে আসে।

—আমি এসেছি শুভা।

—বড্ড দেরী হয়ে গেল দেবশর্মা। আজ দেখছ না সব শেষ করে গেছে সেই শয়তান। নিদারুণ আঘাতে আমাদের আশা সংস্কার ধর্ম মান সম্মান সব কিছুকে সে মাত্র ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে গেছে।

দেবশর্মা বলে।

—তাকেও কঠিন মৃত্যুর সামনে আজ পৌঁছে দিয়ে এসেছি। জল নেই, খাদ্য নেই সঙ্গে, শুধু প্রাণটুকু নিয়ে তাকে কচ্ছের রণ এলাকায় পালাতে বাধ্য করেছি। কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল তাকে শিক্ষা দিতে পারলাম না, শুধু চোরের মত এসে লুট করে শৃগালের মত পালিয়ে গেল।

শুভা আজ চেয়ে দেখছে ওকে। বলিষ্ঠ সুন্দর সুঠাম দেহ। মাথার উষ্ণিষের মণিখণ্ডে চাঁদের আলো পড়েছে, একটি প্রদীপ্ত রেখার আভাস জাগে।

শুভা বলে

—এই ধ্বংস আর পরাজয়ই হয়তো আমাদের ভাগ্যে ছিল।

দেবশর্মা জবাব দেয়।

—সেইটাই সত্য নয় শুভা, আবার এই ধ্বংসস্তূপের মাঝেই আমরা মন্দির গড়বো, আগেকার সেই মন্দিরের চেয়েও বৃহৎ, আবার দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করবো সেই মন্দিরে। পরাজয় মেনে আমরা বসে থাকবো না।

রাজা ভীমদেব এগিয়ে আসেন, ব্যাকুলতা ভরা কণ্ঠে বলেন।

—পারবে? পারবে যুবক? আমি ভীমদেব গুর্জর অধিপতি, আমি তোমায় সব রকমে সাহায্য করবো।

—রাজা ভীমদেব!

সশ্রদ্ধ অভিমান করে দেবশর্মা নিজের পরিচয় দেয়।

—আমি অবন্তীরাজ ভোজদেবের সেনাপতি। রাজা ভোজের কাছ থেকেও সব রকম সহযোগিতা আসবে। একটা দস্যু ভারতের চরম সর্বনাশ করতে পারে না, ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্তি আনে মাত্র, এই কথাটাই আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায়রেখে যাবো।

রাজাভীমদেব আজ অন্তরের নিঃশেষ ভক্তি দিয়ে বলেন।

—ভগবান সোমনাথের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক দেবশর্মা।

ভগ্নপ্রায় সোমনাথপত্তনের মানুষ আবার জেগে ওঠে। রাত্রি ভোরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে আবার প্রাণের সাড়া জাগে। আবার এসেছে অর্থপ্রবাহ।

সারা দেশের মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আসছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত সোমনাথ দেবের মন্দির আবার তৈরী হবে। আবার প্রতিষ্ঠিত হবেন সেখানে দেবতা।

ধ্বংসস্তূপ-প্রস্তর খণ্ড সরানো হচ্ছে।

মন্দির প্রাকার পরিখার সংস্কার সুরু হবে। মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান থেকে আসছে শ্বেতমর্মর শিল্পী, ভাস্করের দল ও আসছে আবার!

কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে সেই মৃতপ্রায় নগরী আবার নোতুন উদ্যমে। দেবশর্মাই সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।

আবার বাঁচার আশা জাগে মানুষের মনে। সরস্বতী নদী তীরের শ্যামসবুজে দিনের প্রথম আলো আবার আশ্বাস আনে। বট ঝাউবনের বাতাসে জাগে পাখীর সুর। পাখীগুলো ফিরে এসেছে। তারা আবার নীড় বেঁধেছে সোমনাথপত্তনের বনে উপবনে।

আর এখানে মৃত্যুর জগৎ। আকাশ বাতাসে শত সূর্যের প্রখর প্রদীপ্ত তেজ, অগ্নিগর্ভ সেই বালুকাভূমি।

কোথাও প্রাণের আশ্বাস নেই।

সুলতান মামুদ আজ কচ্ছের রণ এলাকায় পথ হারিয়ে ঘুরছে উন্মাদের মত। সঙ্গীরা অনেকেই ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কবলে, নিষ্ঠুর পৈশাচিক সেই মৃত্যু।

উন্মাদ হয়ে চীৎকার করছে কে, বালুকাভূমিতে তবু মুখ ঘসে চলেছে। হয়তো ওই মাটির অতলে বন্দী জলধারা চকিতের জন্যও ধরিত্রীর অশেষ করুণায় তার দগ্ধ ওষ্ঠাগ্রে একটু শান্তি স্পর্শ আনবে।

দুচোখ ঠেলে বের হয়ে আসে।

হাতপা দিয়ে সে বাঁচার শেষ আক্ষেপ জানাচ্ছে, তারপরই সারা শরীর স্তব্ধ হয়ে আসে, দুটো চোখ মেলে আতঙ্কবিস্ফারিত প্রাণহীন চাহনিতে চেয়ে থাকে দূর তাম্রাভ রৌদ্রদগ্ধ আকাশের দিকে।

—মসজদ আলি খাঁ!

সুলতান মামুদ চোখের সামনে তার পরাক্রান্ত সেনানায়কের এমনি অসহায় মৃত্যু দেখে শিউরে ওঠে।

বাতাস সর্বাঙ্গে আগুনের জ্বালা আনে।

ঠোঁটটা ফেটে গেছে, দুচোখের পাতা বুজতে পারেনা, জ্বালা করে। সুলতান হাঁফাচ্ছে।

গলার কাছে একটা দমবন্ধকরা ভাব।

সারা শরীরে মনে নীবব আতঙ্ক জাগে।

মসজদ খাঁয়ের প্রাণহীন দেহটা সামনে পড়ে আছে।

কতদিন তারা এই দিকহীন শয়তানের রাজ্যে ঘুরছে জানেনা সুলতান। দিনরাত্রির হিসাবও কখন একাকার হয়ে যায়।

শুধু চলেছে আর চলেছে।

রাত্রির আকাশে তারাগুলো জ্বলে আবার দিনের আলোয় সারা মরুভূমির বুক জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

—মসজদ আলি।

তার ডাক আর কোনদিনই শুনবে না সুলতান মামুদ।

—সুলতান!

বিকৃত সেই কণ্ঠস্বর! এত মৃত্যুর মাঝেও মরেনি সেই একজন। মিনাবাঈ। নীরব ব্যঙ্গ আর কঠিন পবিহাসের রূপ নিয়ে আজও সে তার সঙ্গেই রয়েছে।

সুলতানেব চোখের জলও বের হয় না। শয়তান আজ কাঁদার চেষ্টা করে কিন্তু তার বুক শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে।

ভগবান! ভগবানকেও সে মানে না। জানে তার সর্বশক্তি দিয়ে সে ভগবানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেছে। নিজেই সে শক্তিমান।

আজ তার সব বিশ্বাস ধারণা কঠিন আঘাত আর নিষ্ঠুব মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

মিনাবাঈ হাসছে। বিকৃত সেই হাসি। বলে চলেছে মিনাবাঈ —এবার সুলতানের পালা।

—শয়তানী।

অস্ফুটস্বরে গর্জন করে ওঠে সুলতান।

হাসছে সেই মেয়েটি, আজ তাকে দেখে মনে হয় মূর্তিমতী কোন প্রেতাত্মা। কুৎসিত চেহারা। চোখের দৃষ্টির সেই মাদকতা আজ

নিঃশেষে হারিয়ে গেছে, সুন্দর গালদুটো বিবর্ণ, ওখানে মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া নেমেছে।

চুলগুলো ধুলো বালিতে জটাজালে পরিণত হয়েছে, নরম লালচে ঠোটে কালো আভাষ।

ও জীবনের নয় মৃত্যুর স্বরূপ।

সুলতানের কথায় মিনাবাঈ বলে।

—সৈন্যদল গেছে সিপাহসালারও গেল, এবার সুলতানের পালা। তারপর মৃত্যুর দেবতা বসবে গজনীর সিংহাসনে। সেই তাউস বিস্তৃত এই তামাম রণ এলাকার মরুভূমিতে। সোনা হীরা জহরৎ সব কোথায় গেল সুলতান?

—খামোস! বেসরমী—

সুলতানের চীৎকার ওই মরুভূমির বুকে একটা আতঙ্কময় প্রতিধ্বনি আনে। সেই রৌদ্রকিরণদগ্ধ বালুকাভূমিতে আজ কঠিনতর কণ্ঠে সুলতান মামুদকেই শাসন করছে আকাশজোড়া রক্তচক্ষু মেলে কোন দোজখের শয়তান।

শিউরে ওঠে সুলতান।

বিরাট এক মহাদেবতা আজ তাকে মৃত্যুর সামনে দাঁড় করিয়ে সুলতানকে চোখ রাঙ্গাচ্ছে। তার সব পাপের বিচার হবে, রোজ কেয়ামতের দিন সমাগত।

আকাশ বাতাসে শোনা যায় জেব্রাইলের তুর্য নিনাদ। কাঁপছে ওই দূর দিগন্তসীমা।

নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

তবু সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সে, আজও সে সুলতান-মামুদ। সবুজ পাইন বনসমাকীর্ণ উপত্যকায় কোথায় নার্গিস ফুল ফুটেছে, বাসা বেঁধেছে কোয়েল পাখীর দল। বোধ হয় গজনীতে এখন বসন্ত সমাগত।

মিনাবাঈএর হাসির বিকৃত শব্দে সুলতানের সব স্বপ্ন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

—তুমি মোহব্বৎ করেছো সুলতান? কোনদিন ভুলেও কাউকে ভালোবেসেছিলে? হাঃ হা, হাঃ। তোমার মত জানোয়ারের মোহব্বৎ! মিছেই জিন্দগী বরবাদ করে দিলে সুলতান। সিংহাসন! ও তোমার ভোগে আসবে না, তুমি হবে এই মরুভূমির সুলতান। তোমার কবর দেবারও লোক জুটবে না, এই বালুর উপর তোমার দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কোন প্রাণী ভুলেও তোমার অঙ্গ স্পর্শ করবে না।

—শয়তানী।

এতদিন নীরবে ওর সব কিছু কথা—অপমান সহ্য করেছে সুলতান। ভালবাসা! ওর এই কঠিন ব্যঙ্গে আজ উন্মাদ হয়ে ওঠে সুলতান মামুদ।

হাতের কাছে ওকে পেয়ে ওর কণ্ঠনালীই টিপে ধরতে যায় নিষ্ঠুর হিংসায়। এই মৃত্যুভরা মরুভূমিতে উন্মাদ সুলতান ওই নারীকেই হত্যা করে ভারতের শেষ পরিহাসের জবাব দেবে।

চকিতের জন্য সরে আসে মিনাবাঈ।

বিস্তীর্ণ মরুভূমি, চারিপাশে ছড়ানো মৃতদেহগুলো। রোদের তাপে ওরা তামাটে হয়ে গেছে। বাতাসে তাদের শবদেহের পূতিগন্ধ।

মিনাবাঈ আজ চকিতের মধ্যে তার কোমর থেকে আসগরী বাঁকানো ছোরাটা বের করে।

সুলতান চমকে ওঠে। চারিদিকে তার মৃত্যু, তবু সে বাঁচতে চায় এখনও। সর্বশক্তি একত্রিত করে লাফ দিয়ে ওই উন্মাদিনী নারীর কণ্ঠদেশ টিপে ধরতে চায় সে।

পাশ দিয়ে বিষধর সাপের মত একটা ছোবলের তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে

ছোরাটা বের হয়ে গিয়ে বালুতে আমূল বিঁধে গেল অতৃপ্ত কামনায়, চকিতের মধ্যে সুলতান মামুদ লাফ দিয়ে পড়েছে মিনাবাঈ এর উপর।

বালিতে টিপে ধরে ওর কণ্ঠনালী পিষে চলেছে, একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে স্তব্ধ হয়ে যায় সুন্দরী নারী, তখনও টিপে চলেছে সুলতান। তার দুচোখ জ্বলছে কি দুর্বার আক্রোশে।

হঠাৎ দেখে ওর মুখ থেকে কালো একটু রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ে—তার উষ্ণ হাতে ওই স্পর্শ লাগে।

জ্বালাময় সেই স্পর্শ। ছেড়ে দিল সুলতান।

—মিনাবাঈ! মিনাবাঈ!

নিজেই কি করেছে জানেনা সুলতান। হঠাৎ চমকে ওঠে। মিনাবাঈকে সে এতদিন পর আজ হত্যা করেছে।

চীৎকার ওঠে সুলতান!

চারিদিকে বিকীর্ণ শুধু মৃতদেহ, শেষ করেছে সে এতদিনের সঙ্গা—তার মনের একটি নিভৃত মাধুর্য ওই মিনাবাঈকেও।

এতবড় মরুভূমিতে এখন এই স্তব্ধতার রাজ্যে সেইই একমাত্র জীবিত প্রাণী! সব কায়াহীন আত্মার দল ভিড় করে তার দিকে এগিয়ে আসছে, দুচোখে তাদের হিংসার আগুন।

ওই আগুনের জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে শত সূর্যের কিরণ জ্বালায় সারা আকাশ বাতাসে। মসজদ আলি—খিয়াস আলি—ওই নাম না জানা সৈন্যদের সেইই মেরেছে, এবার—হত্যা করেছে মিনাবাঈকে। তার হাতে তখনও রক্তের দাগ। এক একটি প্রাণী গেছে, আজ তার পালা।

বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ ভরে তোলে সুলতান।

দৌড়চ্ছে সে—প্রাণভয়ে ওই ছায়ামূর্তির হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য দৌড়চ্ছে সুলতান মামুদ।

জল ! একটু ছায়া—সবুজ !···আজ রাজ্য—সিংহাসন—সম্পদ সব তুচ্ছ, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য চাই একমুঠো দানা আর পানি—তৃষ্ণার পানি, তার জন্য আজ তামাম গজনীর সাম্রাজ্য সে কবুল করতে পারে।

·· দূর দিগন্তে দেখা যায় অশ্বখুরোত্থিত ধূলিজাল।

বিশ্বাস করতে পারেনা সুলতান। হ্যাঁ—ভুল দেখছে না সে।

ওরা এইদিকেই এগিয়ে আসছে। কণ্ঠনালী তার শুষ্ক, দুচোখ কি নিবিড় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে সুলতানের, সারামনে একটা স্তব্ধতা নামে।

খোদা ! আজ ভগবানকে স্মরণ করে সুলতান।

খোদা মেহেরবান্।···এতদিন সে সেই বিরাট শক্তিকে মানেনি, আজ মৃত্যুর সামনে দাড়িয়ে জীবনের সব গ্লানি আর হিংসা ভুলে সব কিছু অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে সে মুক্ত হতে চায়।

খোদা !

হাসাম খাঁয়ের দল এই পথে চলেছে—মরুভূমির শেষপ্রান্তে এসে ওরা সুলতানকে দেখে চমকে ওঠে।

সুলতান মামুদ আজ সব হারিয়ে এই জীবনকে নোতুন করে চেনে। বলে।

—দেশে ফিরে যাবো হাসামখাঁ। আর যুদ্ধ নয় রক্তপাত নয়, মোহব্বত।···ভালবাসতে চাই হাসামখাঁ—তামাম জিন্দগী শুধু ভুলই করেছি।

মরুভূমির বুকে সন্ধ্যা নামছে—বাতাসে তখনও হাহাকার জাগে। নিঃস্বতার হাহাকার। সব হারিয়ে গেছে আজ সুলতান মামুদের এত কিছু জয় করার পর।

সোমনাথপত্তনে আবার নোতুন উৎসাহ জেগেছে।

ভগ্ন ধ্বংসপ্রায় মন্দির, প্রাকার নগরীকে নোতুন করে গড়ে তোলার জন্য আবেদন গেছে ভারতবর্ষের সব রাজন্যবর্গের কাছে।

অর্থ সম্পদ-মণিমুক্তা আসছে বিভিন্ন দেশ থেকে, শ্বেত প্রস্তর আসছে রাজপুতানা- মধ্যপ্রদেশের খনি থেকে।

কর্মীর দল সেই ধ্বংসস্তূপ সরাতে ব্যস্ত।

তখনও বাতাসে জেগে রয়েছে কোন হতভাগ্যদের গলিত দেহের পূতিগন্ধ, তাদের শেষ নিশ্বাস জেগে আছে কি নীরব ব্যাকুলতা নিয়ে ওই প্রাকারনগরীর আকাশে আকাশে।

দেবশর্মা আজও জানে যদি সময়মত সে উপস্থিত হতে পারতো এখানে, সুলতানের সাধ্য হতোনা এই মন্দির ধ্বংস করে, লুণ্ঠন করে। কিন্তু তা হয়নি।

তাই চোখের সামনে দেখেছে নিষ্ঠুর সর্বনাশা ধ্বংস আর পরাজয়। ভারতের ইতিহাসে চিরতরে একটি কালিমালিপ্ত অধ্যায় রচনা করে গেল নিষ্ঠুর সেই দস্যু সুলতান মামুদ।

সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে সে।

তাই দেবশর্মাই এই ব্রত সমাপনে উদ্যোগী হয়েছে।

রাজা ভীমদেবও সবরকম সাহায্য করে চলেছেন।

আবার এই ধ্বংসস্তূপের উপর রচিত হবে নোতুন মন্দির, প্রতিষ্ঠিত হবেন দেবাদিদেব সোমনাথ।

...সন্ধ্যা নামে।

নির্জন ধ্বংসপুরীর বুকে ম্লান চাঁদের আলো একটা করুণ বেদনার আভাস এনেছে। শূন্য মন্দির, তার স্বর্ণচূড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত আর চূর্ণবিচূর্ণ, ভগ্ন মন্দিরের ভিতর একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে। ওই আলোটুকু তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আভাস আনে, এই শূন্যতাকে নিষ্ঠুর পরিহাসে অর্থময় করেছে।

শুভাবতী এই শূন্য প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল।

আজও সে মন্দিরেই রয়ে গেছে।

প্রথম যে বৈভব যে গাম্ভীর্য—দেবময় পবিত্র একটি পুণ্য পরিবেশ সে এখানে দেখেছিল তার বিন্দুমাত্রও অবশেষ নেই।

বাতাসে আর এখানে বীণা বেণু মৃদঙ্গের সুর, দেবদাসীদের নূপুর নিক্কণ ওঠে না।

সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসে বাধা বন্ধহারা জলসিক্ত বাতাস। কি রুদ্ধ আক্রোশ জাগে এই মন্দির চত্তরে।

এর অসীম শূন্যতার মাঝে শুধু বেদনাময় হাহাকারই তোলে ওই ঝড়ো হাওয়া।

শুভার সারামনে ওমনি অন্তহীন শূন্যতা।

তার জীবনেও একদিন পূর্ণতা ছিল, বিলাস ব্যসন অর্থ আর প্রতিপত্তিময় ছিল সে জীবন।

সবকিছু ছেড়ে সেও চলে এসেছিল এইখানে ভগবান সোমনাথের পদপ্রান্তে। কিন্তু সে আশ্রয়ও আজ হারিয়ে গেছে।

বুকজোড়া বেদনা আর হতাশাই এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে।

কোথায় জীবনে তবু বসন্ত ছিল।

একদিন কোন রাজনটী একটি মানুষকে ভালোবেসেছিল একান্তে পেতে চেয়েছিল তাকে। চেয়েছিল নীড়ের সন্ধান।

কিন্তু সে আশা তার সার্থক হয়নি। সেই বেদনাতেই শুভা বোধ হয় সব কিছু ছেড়ে শান্তিময় এই আশ্রয়ে আসতে চেয়েছিল।

কিন্তু তার জীবনে শান্তি আর পূর্ণতা কোথাও নেই। শুধু নিঃস্বতারই হাহাকার জাগে।

দেবশর্মাকে এখানে আসতে দেখে তাই সেদিন চমকে উঠেছিল শুভা, ক্ষণিকের সেই দুর্বলতাকে সে কাঠিন্য দিয়ে মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলেছে।

সে তার পথ ঠিক করে নিয়েছে। দেবতারই চরণে সে আশ্রিতা।

যে দেবতার মন্দির সারা আকাশ বাতাসে—অসীম এই নক্ষত্রালোকিত সীমাহীন পৃথিবীর দিক দিগন্তরে, সেই দেবতার পদপ্রান্তে সে প্রণতা, নিবেদিতা।

মানুষের ছোট্ট ঘর—তাদের কামনার আর কোন বন্ধন তার নেই।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুভা সমুদ্রের ধারে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইল।

দেবশর্মা এগিয়ে আসছে, শুভা ওকে আজ অন্যরূপে দেখেছে। একটি নীরব কর্মী।

ওর কঠিন পরিশ্রম নীরব কর্তব্যজ্ঞানের জন্য আবার এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হবে। নোতুন করে গড়ে উঠবে সোমনাথের মন্দির—ধ্বংসপ্রায় এই সুন্দর নগরী এই দেবপত্তন।

···সমুদ্রের দিকে মন্দির প্রাকারের নীচের বালুচরে ঢেউগুলো কি রুদ্ধ আক্রোশে এসে আছড়ে পড়ে খানখান হয়ে যায় ব্যাকুল বেদনায়।

ওই অন্তহীন উদ্বেল সমুদ্রের সব কামনা এসে লুটিয়ে পড়ে সোমনাথের ধ্যানগম্ভীর রূপের চরণপ্রান্তে। বাতাসে জাগে ওই সমুদ্রের হাহাকার আর ক্রন্দসীর দীর্ঘশ্বাস।

ও শুধু নীরব কামনার বুকজোড়া কান্নায় থমথমে।

দেবশর্মা এগিয়ে আসে। ডাকছে সে।

—শুভা!

শুভা চমকে ওঠে। ওই আহ্বানটুকুর জন্য একদিন সে অবন্তী নগরের বনে উপবনে কত চাঁদনীরাতে কান পেতে ছিল অন্তর মনের দুয়ার খুলে। কিন্তু সে ডাক তখন কোনদিনই আসেনি।

এসেছে আজ, বহু বেদনা আর মৃত্যু পার হয়ে একটি অন্য মনকে সে চিরন্তন ব্যাকুলতা নিয়ে খোঁজে। ডাক দেয়।

শুভার দুচোখে জল নামে।

আজ সেই জীবন সে পিছনে ফেলে এসেছে।

দেবশর্মার এ ডাকে সাড়া দেবার কোন সামর্থ তার নেই। ও জানে না তার কান্না ওই অন্তহীন সমুদ্রের অর্থহীন কান্নার মতই অপরিচিত বাতাসে হারিয়ে যাবে।

দেবশর্মা ওকে ডাকছে।

—আবার নোতুন করে বাঁচবো শুভা, সেদিন শূন্য হাতে তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলাম- আজ বহু বেদনায় বুঝেছি তোমাকে ফেরানো যায়না।

—দেবশর্মা!

শুভার অশ্রু-ভেজা কণ্ঠস্বর ওই রাতের বাতাসে গুমরে ওঠে।

—কেন ?

শুভার দিকে চাইল দেবশর্মা। ম্লান চাঁদের আলোয় মনে হয় ও যেন মূর্তিময় কান্না, জীবনের সব বেদনার প্রকাশ ওর চোখের চাহনিতে, ধরিত্রীর নীরব আকুতি ঝরে ওই কণ্ঠস্বরে।

—তা হয়না দেবশর্মা! আমি দেবতার দাসী, সোমনাথদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃতা। মানুষের সব কামনার উর্দ্ধে আমি।

দেবশর্মা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মন্দিরে নামে অন্ধকার আর চাঁদের আলোর মায়াজাল!

স্তব্ধ মন্দিরে হঠাৎ কার বিভ্রান্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

কে হাসছে! হাসছে উন্মাদিনী গোপা।

চিকিৎসক-ব্যাধির বিদ্যা পরাস্ত হয়েছে কঠিন নিয়তির কাছে। গোপা সেই আঘাতের পর উন্মাদই হয়ে গেছে। তার চেতনা আর ফেরেনি।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে চীৎকার করে চলে।

—মন্দিরে আলো জ্বালো—ডাকো দেবদাসীদের—বীণা বেণু মৃদঙ্গ বেজে উঠুক, ভগবান সোমনাথের আরতির আয়োজন করো।

শূন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরে সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

দেবশর্মা স্বপ্ন দেখছে।

নবনির্মিত মন্দিরে আবার আলো জ্বলছে—বাতাসে ওঠে বীণা বেণু মৃদঙ্গের সুর। ভগবানের আরত্রিকের লগ্নে একটি উজ্জ্বল আলোক রেখার মত নেচে চলেছে দেবদাসী।

দেবদাসী শুভা!

দেবশর্মা সেদিন নীরব দর্শক মাত্র, অনেক দূরের মানুষ সে।

—০—